# বন্দরে বন্দরে

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

# BANDARE BANDARE

( From Port to Port )

Sachindranath Bandyopadhyay

( Banerjee )

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

সাহিত্য বিহার-এর পক্ষে শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্য, এম.এ. কর্তৃক
১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
প্রকাশিত এবং শ্রীভূমি মুদ্রণিকা-র পক্ষে
শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য কর্তৃক ৭৭ লেনিন সরণী,
কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ ঃ

স্বনামধন্য সাংবাদিক ও "স্বদেশ"-পত্রিকার একনিষ্ঠ সম্পাদক-
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্নারায়ণ ভৌমিক
অগ্রজপ্রতিমেষ্

॥ ১ ॥

কলকাতার কর্মচঞ্চল প্রাণকেন্দ্রে এই যে অতিকায় অট্টালিকাটি দাঁড়িয়ে আছে, একে বাইরে থেকে যতই চাকচিক্যময় দেখাক না কেন, এর ভিতরে প্রথম যখন প্রবেশ করেছিলাম, তখন যা অনুভব করেছিলাম, তা ভালো লাগা নয়, অদ্ভুত এক আতঙ্ক।

আমার বয়স তখন পনেরোর বেশি নয়, স্কুলের ছাত্র। যাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, তিনি আমার দাদা। সহোদর না হলেও সহোদরপ্রতিম। পেশায় অধ্যাপক, নেশায় গ্রন্থকীট। কী ব্যাপারে যে তাঁর এই অট্টালিকার মধ্যে অনুপ্রবেশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, তা আমার মনে নেই। তবে কাজ যা-ই থাক, সেই সঙ্গে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো দেখানোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কম ছিল না।

অট্টালিকার সামনের দিকে, সংলগ্ন ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে প্রথমেই চোখ তুলে ছাদের দিকে তাকাতে বললেন।

—কী দেখছিস্ ?

ছাদের কিনারে কয়েকটি মূর্তি। আমাদের দেব-দেবীর মূর্তির মতো বসানো নয়, দাঁড় করানো—পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছাড়া-ছাড়া ভাবে। তাদের নিচে ইংরেজিতে কতগুলি অক্ষর খোদাই করা—যার অর্থ, সমৃদ্ধি, শান্তি, ন্যায়বিচার ইত্যাদি।

তখন ছিল ব্রিটিশ আমল, অঞ্চলটির চেহারা ঠিক আজকের মতো ছিল না। সামনে দিয়ে যানবাহনের যাতায়াতও ছিল কম, বাসগুলো তখন আজকের মতো এ-বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে না ঘুরে আরও উত্তরে গিয়ে ডাইনে বা বাঁয়ে মোড় নিতো।

আমার দাদাটি ঘুরতে ঘুরতে অট্টালিকার সামনেকার ফুটপাথের ওপর স্থাপিত একটি ছোট গম্বুজের কাছে এসে দাঁড়ালেন। চতুষ্কোণ নিরেট একটি গাঁথনি,

তার ওপরে একটা সরু গম্বুজ উঠে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কার যেন সমাধিসৌধ! এ রকম সৌধ অন্যত্র দেখেছি বলেই কথাটা আমার মনে হয়েছিল।

দাদা বললেন,—কার স্মৃতিস্তম্ভ জানিস ?

—না।

—আশ্চর্য! আমিও এদিকে এতো এসেছি কখনো নজর করে নাম-লেখা ফলকটা দেখিনি। কর্মমুখর এই বাড়িটার সামনে কেন যে এটা এমনভাবে রাখা আছে—

বললাম,—কে ইনি ?

তিনি বললেন,—কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট।

—সে আবার কে ? নাম শুনিনি তো কখনো ?

তির্যক দৃষ্টিতে দাদা আমার দিকে তাকালেন, তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, তা শুনবি কেন ? শুধু ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, এদের নাম মুখস্থ করেই জীবন কাটিয়ে দে! তুই তো তুই, আমার কলেজের কোনো ছাত্রও এঁর নাম করতে পারবে না।

বলতে বলতে একটু থেমে পকেট থেকে রুমাল বার করে ধূলিধূসর ঐ নাম-লেখা ফলকটা একটু মুছে দিলেন, তারপরে বলতে লাগলেন,—এদেশে গরু-মোষদের ওপর মানুষ কতো অত্যাচার করে দেখেছিস ত ? বিরাট বোঝা নিয়ে গাড়ি টানতে টানতে ওদের মুখে ফেনা উঠে যায়, কাঁধ কেটে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। মূক প্রাণী, কথা বলতে পারে না, ব্যথাও জানাতে পারে না, তার ওপর গাড়োয়ান লাগাচ্ছে সপাসপ চাবুক। এদৃশ্য দেখিস নি ? খুব দেখেছিস, কিন্তু মনে কোনো দাগ কাটেনি। অথচ সাত সাগরের পার থেকে এসে ঐ মহাপ্রাণ সাহেবটি মানুষের এই নিষ্ঠুরতা দেখে আর স্থির থাকতে পারেন নি, নিজের একক চেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন "পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি" বা 'ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল্‌স,'—এক কথায় 'সি-এস-পি-সি-এ।'

সেই বয়সে কতটুকু বুঝেছিলাম জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ঐ নাম-ফলকটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অদূরে রাস্তার পশ্চিম মোড়ে তখন 'হলওয়েল মনুমেন্ট'টি ছিল, ওখানে গাড়িগুলি যাচ্ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে, আজকের মতো এতো ঘনঘন নয়, মাঝে মাঝে ওয়েলার-ঘোড়ায়-টানা ছিমছাম চকচকে গাড়িও চলছিল দুটি-একটি। কিন্তু দাদার চোখ সেদিকে ছিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—চল—বাইরেটা তো দেখলি, এবার ভিতরটা দেখবি চল্‌।

বলে আর দাঁড়ালেন না, আমাকে প্রায় টানতে টানতেই ভিতরে নিয়ে চললেন। দোতলায় উঠেছিলাম, না তেতলায়, তা মনে নেই। খুব বড়ো একটা হলঘরে ছোট ছোট টেবিল সাজিয়ে কাজ করছে অনেক লোক, টেবিলের ওপর ফাইলপত্র স্তূপাকার করা। একটি লোক খুব জোরে ঢেঁকুর তুলে টেবিলে রাখা কাচের

গেলাস থেকে ঢকঢক করে জল খেলো। অন্যদিকে একটি লোক, তার মুখ দেখেই মনে হয়, সে সারা পৃথিবীর ওপর যেন ক্ষেপে আছে, পাশে দাঁড়ানো আর একটি লোককে খুব বকছিল। বারান্দার কাছে উর্দি-পরা বেয়ারা কার ওপর যেন রাগ করে হিসহিস-করা চাপা গলায় বলছিল, শালার বেটা শালা! বাগে পাই তো বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেই!

দাদা চলতে চলতে এক জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সুইং-দরজা ঠেলে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমি একা একা দাঁড়িয়ে আছি হতভম্বের মতো। কাগজপত্রের স্তূপের মধ্য থেকে একটি লোক মুখ তুলে অযথা বিষ দৃষ্টিতে আমার দিকে সাপের মতো তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি বোধ ক'রে অন্যদিকে মুখ ফেরালাম। এক টেবিলের একটি মোটা মিশকালো লোক অন্য এক টাক-মাথা কৃশ লোককে ফিসফিস করে কী বলছে আর গা কাঁপিয়ে হি-হি করা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। ওদের থেকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম—একটি বুড়ো লোক, মাথার চুল প্রায় সব সাদা, তার পাশের অল্পবয়সী লোকটিকে বলছে,—মাল একখানি। শালা রোজ রাতে কোন কোন শালীদের বাড়ির মধ্যে সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে যায়, তা আমি দেখতে পাই না বলতে চাও?

বাক্যটির সঠিক তাৎপর্য সেই বয়সে আমি বুঝি নি, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। তাছাড়া অতবড়ো মানুষ যে, সে ঐরকম অল্পবয়সীর সঙ্গে ওরকম অন্তরঙ্গ আলাপ করছে, এ-ও আমার চোখে সেদিন বিসদৃশ ঠেকেছিল। বুড়ো লোকটি আমার বাবার বয়সী হবে, আর অল্প বয়সী মানুষটি বড়ো জোর আমার ঐ দাদার বয়সী। সে-ও ফিক ফিক করে হাসছিল। বলছিল,—তোমার নজরও বলিহারি মাইরি, ঠিক ফোকাস করেছো?

বুড়ো লোকটি আর কোন কথা না বলে একটা ডিবের ঢাকনা ঠকাস করে খুলে একটা পানের খিলি মুখে পুরলো। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। বারান্দার কোণে একটি লোক পানের পিচ ফেললো পচাৎ করে।

সত্যি কথা বলতে কী, সব দেখেশুনে আমি যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়-ভয় করা অনুভূতি। দাদা যদি কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্ট আর মুখে-ফ্যানাওঠা ভারবাহী মূক পশুদের কথা না বলতো, তাহলে বোধ হয় ততটা প্রতিক্রিয়া হতো না। দাদার সেই ঘর থেকে বেরুতে লাগলো প্রায় আধ ঘণ্টা। এই সময়টা আমার এমন খারাপ লাগছিল যে বলার নয়। তিনি সুইং দরজা ঠেলে বেরুতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছে এসে বললেন,—চল্, আমার কাজ হয়ে গেছে। এবার আর দেরি নয়, সোজা বাড়ি।

ঐ অতিকায় বাড়িটার ভিতরকার বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাদা বলছিলেন, সারি সারি কতো অফিস দেখেছিস? বড়ো হ, পাসটাস করে বেরো,

তখন হয়ত তোকে এ-বাড়িতেই এসে ঢুকতে হবে। কার ভাগ্যে কী আছে বলা যায় ?

উত্তর দেইনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠেছিলাম। যতক্ষণ না এই বাড়ি ছেড়ে আমরা ট্রামে উঠলাম, ততক্ষণ আমি কোনো কথা বলতে পারি নি।

—কী রে অমন চুপ করে গেলি কেন ?

—উঁ ?

—কেমন লাগলো ? অফিস ত কখনো দেখিস নি, তাই তোকে দেখাতে এনেছিলাম। কেমন সব টেবিল পেতে সারি সারি বসে আছে কাগজ পত্রের স্তূপ নিয়ে। তাই না ?

—হুঁ।

দাদা আমার সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' 'হাঁ' ধরণের উত্তর ততটা লক্ষ্য করেননি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর নিজের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার তরুণ মনে সেদিন যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার জের সহজে মেটেনি। দাদার ভাষায় 'পাসটাস' করে বেরুনোর পর যখন কাজকর্মে ঢুকে পড়ার প্রশ্ন এলো, তখন মনে মনে ভয় ছিল, এই অট্টালিকার জীবন যেন আমাকে কখনো গ্রাস না করে !

'যাদৃশী ভাবনা যস্য'—কথাটির বোধহয় কিছু তাৎপর্য আছে। আমি ঐ অট্টালিকা-জীবনের বিপরীত বিন্দুতে ছোট্‌বার চেষ্টা করায় ভিন্নতর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, আর তা কলকাতায় নয়, বাইরে। প্রথম কর্মজীবনে কিছুকাল কারখানায়, তারপরে জাহাজে, কিন্তু পরে প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো ঐ অট্টালিকার জীবনই শেষ পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করে নিয়েছিল। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস। যেতে আসতে ট্রাম-বাসের জানালা দিয়ে যেটুকু বাইরের জগৎ দেখা যায়, সেটুকু ছাড়া বহির্জগতের আর সবই আমার কাছে অবরুদ্ধ ছিল। সারাদিন অফিসে খেটে বাসায় আসবার পর ক্লান্তিতে দেহটা এমন ভেঙে পড়তো যে, আর কোথাও যাবার বা কিছু করবার তেমন উৎসাহ থাকতো না। ছুটি-ছাটার দিনও শরীর-মন কেমন যেন আলস্যে ভরে থাকতো, ঘর থেকে দু-পা বেরিয়ে সিনেমা থিয়েটার পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা হতো না। কেমন করে যে ধীরে ধীরে পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত, সমস্যা-কণ্টকিত, গৃহগত এক সাধারণ সংসারী জীবে একদিন পরিণত হয়ে গেলাম, তা নিজেও জানি না। অফিসের কোটরে কাগজপত্রের স্তূপের সামনে বসে আমিও সবার মতো কাঁচের গেলাসে ঢকঢক করে জল খেয়েছি, অপরের নিন্দা প্রসঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা করিনি। অফিসের পর ট্রাম-বাসে ওঠবার জন্য যেটুকু পথ হাঁটতে হয়, সেটুকু পার হতে গিয়ে দেখতাম, যেখানে সেই তরুণ-বয়সে -দেখা 'হলওয়েল মনুমেণ্ট'টি ছিল, সেখান থেকে মোড় ঘুরে পূবের দিকে

দৈত্যের মতো অনবরত ছুটে আসছে অতিকায় বাসগুলো, একেবারে ঠেসে লোক বোঝাই করা।

কোলস্ওয়ার্দি গ্র্যাণ্টের স্মরণ-স্তম্ভটি এখনো আছে তেমনিভাবে পথের পাশে দাঁড়িয়ে, মলিন, বিবর্ণ, আষ্টেপৃষ্ঠে নানাবিধ পোস্টার-ইস্তাহার আঁটা। এমন কি তাঁর নামফলকটির ওপরেও "দলে দলে যোগ দিন"-এর পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নামটুকু পর্যন্ত পড়বার উপায় নেই।

কিন্তু এই যে আমার মাপা, জড়ভাবগ্রস্ত জীবন, এখানেও মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, আর তা না উঠলে আমার এ-কাহিনী রচনা করবার কোনো প্রয়োজন হতো না।

বলা বাহুল্য, এ-ঝড়ের প্রকৃতি আলাদা। এ এক দুঃস্বপ্নের মতো, তার আতঙ্কটুকু, যে স্বপ্ন দেখে, একা তাকেই বহন করতে হয়।

দৈনন্দিন জীবনে সবার প্রতি সব কর্তব্য সমাধা করার পর যখন বিছানায় এসে এলিয়ে পড়ি, তখন এক-একদিন আমার সেই ফেলে আসা মুক্ত দিনগুলি হঠাৎ উঁকি দিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্তহীন সমুদ্রের ঢেউ, সাগর-পাখীর ডানা,—আর নারিকেল মেখলা-বেষ্টিত সবুজ-সবুজ অজানা দ্বীপের ইসারা।

কিন্তু প্রখর দিনের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সবকিছু মিলিয়ে যায় ছায়ার মতো। ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যখন দারুণ গ্রীষ্মের পিচগলা পথের ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাই, তখন কি নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, এই আমিই একদিন সেই উদার সামুদ্রিক জীবনের শরিক ছিলাম? না, সে-"আমি" এ-"আমি" নয়। এই বিধ্বস্ত দেহ, ক্ষতবিক্ষত অন্তর নিয়ে যে মানুষটি প্রতিদিন সময়ের দাম দিয়ে চলেছে,—তার সঙ্গে সেই বহুদিন আগেকার যাযাবর তরুণটির কোন সম্পর্কই নেই।

অথচ, এই মানিয়ে চলা, প্রতিবাদ করতে না পারা, গতিহীন, পরাজিত মানুষটির জীবনেই হঠাৎ সে এসে একদিন দেখা দিলো। দেখা দিল শুধু নয়, দরজায় যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো। আমার সমগ্র সত্তাটিকে ধ'রে প্রবল নাড়া দিলো।

সে রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণ আগে 'বলো হরি—হরি-বোল' আওয়াজ তুলে একদল শবযাত্রী চলে যাবার পর আবার যখন সবকিছু শান্ত হয়ে গেছে, আমিও আমার একক শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছি,—এমন সময় হঠাৎ মনে হলো, প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। হু-হু করা বাতাস, জানালার পাল্লা-গুলো ধপাস ধপাস ক'রে আছড়ে পড়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজায় প্রবল করাঘাত। উঠে জানালার পাল্লা সামলে দরজা খুলতে খুলতে ভাবছিলাম, এমন ঝড় মাথায় নিয়ে এতো রাত্রে কে আবার এলো দেখা করতে? কিন্তু দরজা খুলে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে,—সে।

## ॥ ২ ॥

সাদা সার্ট আর কালো প্যান্ট-পরা তরুণবয়সী একটি ছেলে, মাথায় ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, উজ্জ্বল দুটি চোখে অপরিসীম প্রীতি যেন ঝরে পড়ছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

আশ্চর্য, ঝড়ের কথা আমি ভুলে গেলাম। একটু আগে আচমকা যে একটা প্রবল বাতাসের ঢেউ বয়ে গেল, মুহূর্তে তা বিস্মৃত হলাম। ওর হাতদুটি ধরে তাড়াতাড়ি ঘরে এনে বসিয়ে দিলাম আমার বিছানার সামনের দিককার সোফাটায়। জানালা দিলাম খুলে, দরজায় দিলাম খিল।

—একা ?

বললাম,—আর সবাই অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছে।

তার আর প্রশ্ন নেই। মুখে শুধু হাসির রেখা। বললে,—চিনতে পারছেন ?

—পারছি। চেহারা ত একটুও বদলায় নি ?

সে আবার হাসলো, পায়ের জুতো খুলে ভালো করে সোফায় এলিয়ে বসলো। বাইরে ঝড়ের সেই আচমকা প্রকোপটা তখন অনেক কমে গেছে, জোরে জোরে বাতাস বইছে, তার বেশি কিছু নয়। সে কোনো উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

—এতো রাত্রে ?

সে একটু হেসে বললো,—বিরক্ত হননি তো ?

উত্তর দিতে গিয়ে আমার গলা বোধহয় কেঁপে গিয়েছিল,—বিরক্ত ? যেন এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া তুমি সর্বাঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছো !

এবার তার ঠোঁটের হাসি আরও বিস্তৃত হলো, বললে,—দিনক্ষণ না মেনে হঠাৎ এসে পড়েছি। কেন যে এসে পড়লাম জানি না।

—বাড়ির সবাইকে ডাকি ?

খপ করে সে আমার হাত চেপে ধরলো, বললো,—না।

তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকালো, বললো,—মনে পড়ছে সব কথা ?

আমি সম্মোহিতের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিছু বলতে পারলাম না।

সে উঠে জোরালো আলোটার সুইচ নিভিয়ে দিয়ে স্তিমিত, স্নিগ্ধ নীলাভ আলোর বাল্বটা জ্বালিয়ে দিলো। তারপরে আরও কাছে এসে বসে পড়লো। বললো,—এরকম গল্প করে কতো রাত কাটিয়ে দিয়েছি, আপনার মনে পড়ছে না ?

—তা পড়ছে।

—তবে ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার সে একটু হাসলো, আমার হাতটা ধরে নিজের হাতে নিয়ে বলে উঠলো,—না, আর 'আপনি' নয়, 'তুমি'। 'তুমি'র সম্পর্কই ত ছিল আমাদের। তাই না?

আমি সবিস্ময়ে ওর তারুণ্যভরা মুখখানির দিকে তাকিয়েছিলাম! বাইরে চলেছে বাতাসের এলোমেলো খেলা। জানালার বাইরে যেটুকু আকাশ দেখা যায়, তাতে মেঘের আস্তরণের মধ্য দিয়ে পান্ডুর একটা আবছা জ্যোৎস্নার আভাও যেন অনুভব করা যাচ্ছে।

সে আমার পাশে বালিশে হেলান দিয়ে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো,—সেই আমাদের প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, মনে নেই? কলকাতার লোক, অথচ যাত্রা শুরু করেছিলাম বিশাখাপত্তন বন্দর থেকে।

হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। কার কথা ও বলছে? কে করেছিল সমুদ্র-যাত্রা?

সে বোধহয় ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ডুব দিচ্ছিল। এক আশ্চর্য সম্মোহন-করা গলায় সে বলতে লাগলো,—জাহাজ গিয়েছিল সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। মনে পড়ছে না মেলবোর্ণ বন্দরের কথা? জাহাজ ছিল মাত্র দুদিন। আর মেলবোর্ণে তখন চলছিল দারুণ ক্রিকেট খেলা। তাই সিডনি বন্দরে না গিয়ে জাহাজকে যখন যেতে হলো মেলবোর্ণে, তখন ক্যাপ্টেন থেকে চীফ অফিসার পর্যন্ত সবাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা! ট্যাসম্যান-সাগর দিয়ে ঢুকে ট্যাসম্যানিয়া দ্বীপকে বাঁয়ে রেখে আমরা যখন মেলবোর্ণ বন্দরে গিয়ে ঢুকলাম, তখন সেলার্স-হোমের মারফৎ টিকিট যোগাড় করে কে আগে ভুবনবিখ্যাত মেলবোর্ণ-স্টেডিয়ামে প্রবেশ করবে, তাই নিয়ে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। মনে নেই তোমার? আমি চোখ বুজলেই সে দৃশ্য দেখতে পাই। আমরা ক'জন টিকিট পাওয়া ত দূরের কথা, জাহাজের ডিউটি থেকেই ছাড়া পাইনি। তবু আমরা দুজনে জেটিতে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় গেট থেকে বাইরে বেরিয়ে রেস্তোরাঁর খোঁজে একটা ক্ষুদে অন্ধ গলিতে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম মনে আছে? তালি মারা প্যান্ট আর ছেঁড়া জামা-পরা ছোট একটি ছেলে ভাঙা ব্যাট নিয়ে বল খেলছিল, আর তার মা তাকে বল গড়িয়ে গড়িয়ে দিচ্ছিল। ছেলেটি ভালো হাঁটতে পারে না, পায়ে কোনো দোষ ছিল, তাই দিয়ে সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বলটাকে তাড়া করে সজোরে মারবার চেষ্টা করছিল। আর তার তরুণী মা ছুটে ছুটে বল কুড়িয়ে এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। মনে পড়ে এরপর কী হয়েছিল? তুমি মেয়েটিকে কী যেন বলতে গিয়েছিলে, সে-কথা শোনবার আগেই ঝংকার দিয়ে সে বলেছিল,—এখন আমাকে ডিস্‌টার্ব করো না, অন্য মেয়ের কাছে যাও। দেখছো না ছেলেকে বল খেলাচ্ছি? আমরা গরিব। খুবই গরিব! কিন্তু কে বলতে পারে আমার ছেলে একদিন বড়ো হয়ে মেলবোর্ণ স্টেডিয়ামে বড়ো ম্যাচ খেলবে না ব্র্যাডম্যানের মতো?

এ পর্যন্ত বলেই সে থেমে গেল। এরপর কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি বলে উঠলাম,—হ্যাঁ, মনে পড়ে বই কী সেই খোঁড়া ছেলেটিকে। একখানা ভাঙা ব্যাট নিয়ে সজোরে বল পেটানোয় তার কী উৎসাহ!

উত্তরে সে বললে,—সেই সঙ্গে এ কথাও নিশ্চয় মনে পড়ে, এই মেলবোর্ণ বন্দর থেকেই আরও দূরে এক অজানা দেশের দিকে আমাদের জাহাজ রওনা হয়েছিল। সব ছাড়িয়ে আমার মনে পড়ছে সেই আশ্চর্য যাত্রা, আশ্চর্য দেশ, আর আশ্চর্য মানুষগুলির কথা!

আমি হুইল-হাউসে থার্ড অফিসারের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, প্রায় কাছাকাছি বয়সের মানুষ ছিলাম আমরা। আমি সেই মানুষটির বাহু আঁকড়ে ধরেছিলাম, রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম—কোথায় যাচ্ছি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে একটু হেসেছিল সে,—বলো তো কোথায়?

—সেটা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না! সেইজন্যই তো ছুটে এসেছি তোমার কাছে!

তার মুখখানা একটু গম্ভীর হলো, বললে—মুরিয়া দ্বীপ।

—সে আবার কোথায়?

তেমনি গম্ভীরভাবেই বললে—কোথায় সে তো দু-তিন দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে।

—আমি কখনো নাম শুনি নি। তুমি এর আগে গেছো?

—না।

বললাম,—ঐ অজানা দ্বীপে কেন যাচ্ছি?

থার্ড অফিসার তেমনি গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলে,—মালবাহী জাহাজে কাজ করতে এসে এসব তোমার মনে কী করে জাগছে? কখন কী অর্ডার আসে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? মুরিয়াতে যেতে হবে, ওখান থেকে 'কোপরা' তুলতে হবে, ব্যস।

—কোপরা? সে আবার কী?

তার থমথমে মুখের ভাব একটুও বদলায় নি, বললে—সবুর করো, দ্বীপে পৌঁছবার পর নিজেই দেখতে পাবে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে প্রশ্ন করেছিলাম—ঐ দ্বীপে যাচ্ছি বলে তুমি তেমন খুশি নও বলে মনে হচ্ছে?

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—কেমন করে খুশি হবো বলো দেখি? ঐ দ্বীপে যাচ্ছি, অথচ তার কয়েক মাইলের মধ্যেই পৃথিবীবিখ্যাত একটি দ্বীপ রয়েছে, যে দ্বীপ আমিও কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি সে নাকি নাবিকদের স্বর্গ।

—সেখানে আমরা যাবো না?

—না। অর্ডার নেই।

ওর বিমর্ষ মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বললাম—কী নাম বলো তো সে দ্বীপের? পৃথিবী বিখ্যাত যখন বলছো, তখন নাম বললে চিনতেও হয়ত পারি।

সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললো,—শুনতে চাও তার নাম? তাহিতি।

আমার সারা শরীর শিউরে উঠলো, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করে বলে উঠলাম—তাহিতি!

সে বললো,—হ্যাঁ, পল গগ্যাঁর সঙ্গে যে নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে! স্মরণীয় হয়ে আছে বহু লেখকের লেখায়। চার্লস ডারউইন গিয়েছিলেন ওখানে তরুণ বয়সে। গিয়েছিলেন পিয়ের লোতি আর স্টিভেনসন।

আমি অবাক হয়ে থার্ড অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। থার্ড অফিসার ঘর ছেড়ে জাহাজের বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলতে লাগলো, যে জাহাজে উঠেছে জাহাজী হয়ে, সে-ই স্বপ্ন দেখবে জীবনে অন্তত একবারও তাহিতি দ্বীপে যাবার। তাহিতি-তাহিতি! তিন অক্ষরের কী যে মধুর নাম! নামের মধ্যেই যেন জড়িয়ে রয়েছে অগাধ স্বপ্ন!

প্রশ্ন করলাম,—যাবো না আমরা তাহিতি?

আবার দীর্ঘশ্বাস। থার্ড অফিসার বললো—তাহিতির পাশের দ্বীপে যাচ্ছি। সামান্য কয়েক মাইলের তফাৎ। হয়ত তটভূমিতে দেখাও যাবে, স্বর্ণঝরা বালুবেলায় নারকেল বীথির ছায়ার নিচে, তাহিতি সুন্দরীরা চাঁপা ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে আর মাথার কেশকলাপে জড়িয়ে গীটারের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃদুমৃদু পদক্ষেপে নাচছে!

বলতে বলতে তার চোখ দুটি বুজে এলো। বললে,—আমি যাবোই, কেউ রুখতে পারবে না আমাকে! লুকিয়ে-চুরিয়ে একটা নৌকা ভাড়া করে—কতদূরই বা? কী বলছো! এতদূর এসে শেষ পর্যন্ত তাহিতি দেখতে পাবো না? নিশ্চয়ই দেখবো!

মৃদুকণ্ঠে বললাম—অতো দুঃসাহসী হওয়া কি ঠিক? যদি তোমাকে ফেলে জাহাজ চলে যায়?

সে প্রায় চিৎকার করে উঠলো, যায় ত যাক। আমি থেকে যাবো ঐ দ্বীপে পল গঁগ্যার মতো।

বলতে বলতে আবার সে উধাও সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালো 'রেলিং'-এর ওপর দুটি হাত রেখে। তারপরে নিজের মনেই বার কয়েক উচ্চারণ করলো—তাহিতি-তাহিতি!

গীটারের তারের শেষ ঝংকারটির মতো তার উচ্চারিত শব্দ যেন নিঃসীম সমুদ্রের বুকে ধীরে মিলিয়ে গেল। সমুদ্র এখানে আগাগোড়া নীল নয়, কিছুটা

অগ্রসর হবার পর মনে হলো, নীল-নীল জলের মধ্যে কে যেন হঠাৎ এক বোতল ঘোর কালো রঙ ঢেলে দিয়েছে। সেই ভয়-ভয় করা কালো রঙের বিস্তৃতিকে বেষ্টন করে আমরা আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম নিঃশব্দে। নিঃশব্দে বলছি এইজন্য যে, সেই সময় আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। ডেকে কয়েকজন খালাসী মিলে জটলা করছিল, তারাও হঠাৎ চুপ করে গেছে। বুকের হৃৎপিণ্ডের মতো জাহাজের ইঞ্জিনে একটা ধ্বক্‌ধ্বক্‌ অনুরণন চলছিল শুধু, আর সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল মানুষের সজোরে নিঃশ্বাস টানা আর নিঃশ্বাস ফেলার চাপা শব্দের মতো।

*  *  *  *

—মনে আছে তোমার সব কথা? ফিস্‌ফিস্‌ করে খুব অন্তরঙ্গ সুরে মুখের কাছে মুখ এনে সে বললে,—সারা জাহাজ জুড়ে এক উত্তেজনার ঢেউ, সবারই মন ছুটে চলেছে 'তাহিতি'র অভিমুখে।

আমি ওর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম, তাকাতে তাকাতে এই প্রবীণ দেহটির অন্তরালে যে প্রাণ-প্রদীপটি জ্বলছে, তাকে ঘিরে যেন মুগ্ধ পতঙ্গের গুঞ্জন শুরু হলো, তাহিতি-তাহিতি! আমি আর সাঁতরাতে পারছি না, স্মৃতির সমুদ্রে ক্লান্ত সত্তাটিকে বহন করে কতদূর আর সাঁতার দিতে পারি! এই দিশাহারা 'আমি'কে যেন অতি সন্তর্পণে কোনো তীরভূমিতে উত্তরিত করতে চাইছিল সে। তরুণীর কানে কানে তরুণ প্রেমিকের গুঞ্জরণের মত সে বলতে লাগলো, বুড়ো ইঞ্জিনিয়ারের কথা মনে আছে তোমার ঐ জাহাজের? সে সারা পৃথিবী টহল দিয়ে বেরিয়েছে বহুবার। সে আমাদের কথাবার্তা শুনে বলেছিল, মেলবোর্ণ থেকে উত্তর-পূর্বে কোণাকুণি যদি সরলরেখা টেনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া যায়, তা হলে পেঁছিবো একেবারে ভ্যাংকুভারে। 'ভ্যাংকুভার' হচ্ছে কানাডায়। আর যদি হাওয়াই দ্বীপে পেঁছে কোণাকুণি না চলে আমরা কুড়ি ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা ধরে বরাবর চলে যেতে থাকি, তা হলে মেক্সিকোয় গিয়ে পেঁছিবো।

ইঞ্জিনিয়ারের এ বর্ণনায় অবাক হবার কিছু ছিলো না। তখনকার অভিজ্ঞ নাবিকেরা তাদের জানা কোনো জায়গার অবস্থিতির কথা বোঝাতে গিয়ে কথায়-কথায় অক্ষরেখা-দ্রাঘিমারেখা নির্ভুল বলে দিতে পারতো। কিন্তু থাক্‌ ও প্রসঙ্গ! ইঞ্জিনিয়ারের বর্ণনায় অসহিষ্ণু হয়ে সেদিন তাকে আমি বলেছিলাম, চুলোয় যাক হাওয়াই আর মেক্সিকো! আপনি তাহিতির কথা বলুন?

বুড়োর মুখে হাসি দেখা দিলো। তার সামনের একটি দাঁত ছিল সোনা দিয়ে বাঁধানো, তার ওপর আলো পড়ে সোনাটা চিক্‌চিক্‌ করতে লাগলো,—তাহিতি! তাহিতি একটা স্বপ্নরাজ্য! ওখানকার 'ভাহিন'দের কথা বলে শেষ করা যায় না। আমি বার তিনেক গেছি, আর প্রত্যেক বারেই 'তাহিতি'কে নতুন বলে ঠেকেছে। 'তাহিতি' কখনো পুরোনো হয় না।

ব্যস, বুড়ো চুপ। সে যেন হঠাৎ তার স্মৃতির অতলে ডুব দিলো।

—তাহিন কারা?

বুড়ো যেন মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, বললে,—তাহিতি-সুন্দরীদের কথা শোনো নি? শোনো নি তাদের নাচের কথা? পিঠ ভর্তি রেশমী নরম চুল এলিয়ে মাথায় মুকুটের মতো কাঠ-চাঁপাফুলের মালা জড়িয়ে নেয় তারা। গলাতেও কখনো কখনো দোলে ঐ চাঁপাফুলের মালা, বুকে বক্ষ-বন্ধনী ছাড়া আর কিছু নেই। কোমরে—

বলতে বলতে বুড়ো একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপরে আবার বলতে শুরু করলো, না-না—কোমর কেন, নাভিরও অনেক নিচ থেকে শুরু হয় তাদের মেখলার অংশ। মেখলাগুলিও কাপড়ের নয়, কতগুলি তন্তু বা ফাইবারের সমষ্টি। সোনালী রঙের, খড়ের মতো দেখায়, কিন্তু খড় নয়, অনেকটা পাটের মতো। ভাবো তো একবার! গীটারের স্বরে স্বরে তারা যখন চাঁদের আলোয় বালুবেলার ওপর মৃদুছন্দে দেহহিল্লোলে নাচে, তখন কী অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়!

আমাদের আসরে সেদিন থার্ড অফিসার মাসুদও ছিল। সে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—ইস্! আমরা অতো কাছে গিয়েও তাহিতি দেখতে পাবো না? তাই কি হয় নাকি?

*  *  *  *

তোমার মনে আছে, জাহাজ যত এগিয়ে চলেছে, ততই আমাদের অস্থিরতা বাড়ছিল? জাহাজে ছোট একটা লাইব্রেরি ছিল, সেখানে গিয়ে তন্নতন্ন করে মমের 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' বইখানা খুঁজলাম, পেলাম না। কী যে আফশোষ হচ্ছিল তখন, তা বলার নয়। পল গঁগ্যার তাহিতি-জীবন নিয়ে লেখা বইখানা কেন আগে পড়িনি! ওতে নিশ্চয়ই আছে তাহিতির বর্ণনা! ধিক্কারে অনু-শোচনায় যেন মরে যাচ্ছিলাম! বইখানার খবর দিয়েছিল মাসুদ। তাকে গিয়ে ধরলাম,—আছে তোমার কাছে 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স?'

সে প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো বলা যায়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—কী করে জানবো যে আমরা তাহিতির দিকে যাচ্ছি, নইলে কি বাড়িতে ওটা ফেলে আসি? এখন 'তাহিতি' যাচ্ছি একটা লাইনও মনে পড়ছে না বইখানার! স্মরণশক্তিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে।

বিফল মনোরথ হয়ে লাইব্রেরিতে এসে আবার খোঁজাখুজি। স্টিভেনসন কিম্বা অন্য কোনো লেখকের লেখাও যদি পেতাম। নেই, স্টিভেনসন নেই, পিয়ের লোতি নেই, কিচ্ছু নেই! যতো সব গোয়েন্দা আর খুনোখুনির গল্পে লাইব্রেরি ভর্তি। সারাদিন বইয়ের পর বই ঘেঁটেও আমরা 'তাহিতি' সম্পর্কিত কোনো 'তথ্য'ই আবিষ্কার করতে পারলাম না।

আমরা ততদিনে ট্যাসম্যান সাগর পেরিয়ে 'সাউথ-সী' ছাড়িয়ে গভীর সমুদ্রে

পড়েছি। সমুদ্রের রং কালো, আর সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তেও কালো মেঘের ছটা দেখা গেল। জাহাজের নেভিগেশন চার্ট অনুযায়ী আমরা তখন দক্ষিণ ট্রপিক রেখা ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কালো মেঘ দেখে জাহাজের ছোট বড়ো সবার মুখই শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে, ঝড়টা অন্য দিক দিয়ে বয়ে গেল, যদিও তারই ধাক্কায় সমুদ্র উঠেছে ক্ষেপে, জাহাজটা মোচার খোলার মতো একবার এ-কাত আর একবার ও-কাত হতে থাকলো। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কেবিনের জিনিসপত্র সব হুড়মুড় ক'রে পড়ে গিয়েছিল বলে মেঝের ওপরই সেগুলি সরিয়ে রেখে বিছানার গদি মেঝেয় টেনে এনে তারই ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। চীফ স্টুয়ার্ড এসে কী সব ওষুধ পত্তর খাওয়াতে লাগলো, তবু অসুখ পুরোপুরি সারলো না। যা মুখে তুলি, তাই বমি হয়ে যায়।

পরদিন সকালে, জাহাজও একটু স্থির হয়েছে, আমিও মোটামুটি 'স্থির' আছি, এমনি সময় মাসুদ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ঢুকে পড়েছি, আমরা পলিনেশিয়ায় ঢুকে পড়েছি!

মানে!

ও আমার গদীর ওপরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললে, প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলটাকে পলিনেশিয়া বলে। অজস্র দ্বীপ ছড়িয়ে আছে এ-দিক, ও-দিক! ও-গুলিরই ভৌগোলিক নাম,—পলিনেশিয়া।

—তাহিতি কতদূর?

সে বললে,—নেভিগেশন চার্ট দেখছিলাম। আমরা এখন দক্ষিণ ট্রপিক রেখা ছেড়ে আরও উজিয়ে কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা ধরবার চেষ্টা করছি। ওটা ধরে ক্রমাগত পূবমুখো যেতে হবে। চলো না দেখবে?

আমার হাত ধরে কোনক্রমে উঠিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। একটু যেতেই আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমাকে দু-হাতে জাপটে ধরে মাসুদ ওপরে নিয়ে গেল, তারপরে আরও একটি তলা উঠতে হবে। এসব তোমার মনে নেই?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। দুটি চোখ নিয়ে ওই মুখের দিকে একান্ত তৃষ্ণায় তাকিয়ে আছি। সে বলতে লাগলো,—হুইল হাউসে পৌঁছে আমরা চার্ট দেখলাম, খুব বড়ো একটা কাগজে ম্যাপের মতো আঁকা, তাতে জায়গায় জায়গায় পিন্ আটকানো। পিনের মাথাগুলো বোতামের মতো। কোনোটা লাল, কোনোটা নীল, কোনোটা সবুজ। এসব দিয়ে কীভাবে ওরা দিক্ নির্ণয় করে, আমার জানা নেই। একটা লাল পিন্ দিয়ে বোঝালো, আমরা এইখানে রয়েছি। ডানদিকে দ্যাখো, কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখাকে যেখানে ১৫০ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখা এসে ছুঁয়ে গেছে, তার কিছু উত্তরে ঐ দ্রাঘিমারেখা ধরে চললেই ডানদিকে এই দ্যাখো 'মুরিয়া' দ্বীপ, এখানেও একটা লাল মাথা পিন্ বসানো রয়েছে। আমরা এখানেই যাবো।

—তাহিতি?

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—মুরিয়ার পূর্বদিকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাহিতি।

—যাবে না ?

সে বললে,—ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়েছিলাম। স্টোনফেস—পাথরের মুখ। এক কথায় বললে, নো অর্ডার অ্যাজ ইয়েট।

—তাহলে ?

সে আমার হাত ধরে বললে,—চলো, রেডিও অফিসার দোসীর ঘরে যাই। কোনো খবর যদি আসে তো, রেডিওর মাধ্যমেই আসবে।

—মনে আছে তোমার ?—সে বলতে লাগলো,—সেই থেকে আমাদের কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রেডিও অফিসারের কাছে ধর্ণা দেওয়া। যদি খবর আসে,—তাহিতিতে যাও! তাহিতি—তাহিতি! তিনটি অক্ষরের এই নাম যেন আমাদের পাগল করে দিয়েছিল !

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত হতে লাগলো, চোখ দুটি স্বপ্নিল হয়ে উঠলো,—নিঃসীম সমুদ্রের দিকে তাকাই, দিগন্তরেখায় কালো বিন্দুর মতো কিছু একটি চোখে পড়ে, আর আমরা রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ি,—ল্যাণ্ড ! মাটি !

ক্রমে ক্রমে নারিকেল-বীথির সারি চোখে পড়লো। চোখে পড়লো হলুদ-হলুদ বেলা-বালুকার রঙ। ঐ কি তবে তাহিতি ? কিন্তু জাহাজ কিছুদূর এগিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো, আবার উধাও সমুদ্র,—কোথাও নীল, কোথাও কালো।

ও বলতে লাগলো,—এমনি ক'রে ক'রে একদিন, বেলা তখন বারোটা হবে, আমরা গিয়ে মুরিয়া দ্বীপে নোঙর ফেললাম। তোমার মনে আছে সব কথা ? তটরেখার বেশ কিছু দূরে গিয়ে জাহাজ দাঁড়ালো। একটা কাঠের জেটি তটরেখা থেকে সমুদ্রের মধ্যে প্রায় সিকি মাইলের মতো ঢুকে আছে, তারই পাশে গিয়ে জাহাজ ভেড়ালো পাইলট। শুনলাম, ছোট্ট দ্বীপ। মাইল দশ-পনেরোর মধ্যে লম্বা, চওড়ায় মাত্র মাইল পাঁচ-ছয়। মাঝখানটা কূর্মপৃষ্ঠের মতো। তার পাদদেশে, চারপাশ ঘিরে ওদের গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে। যেখানে ভিড়েছিলাম, তার নাম একটা অবশ্যই আছে, কিন্তু এতদিনে ভুলে গেছি, ডাইরিতেও নোট করা নেই।

—কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো কী ?—ও বলতে লাগলো,—পিঠের ওপর বড়ো বড়ো বস্তা নিয়ে গুদাম থেকে মজুরেরা মাল এনে রাখতে লাগলো জেটির কিনারে সার দিয়ে। এদৃশ্য আমাদের কাছে এত পুরোনো যে, ওতে আর মন টানে না। শুধু এটুকু শুনলাম, বস্তার ভিতরে আছে নারকেলের টুকরো, যাকে বলা হয় 'কোপরা'।

অনেকে ভোরে উঠে তীরে নেমে বালুবেলা দিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে এলো। কিছুটা ভিতরে একটা ছোট্ট শহর আছে, কেউ-বা সেখানেও এক চক্কর ঘুরে

এলো। আমাদের সে ইচ্ছা হয়নি। আমি আর মাসুদ নেভিগেশন-রুমে রয়ে গেলাম। লাল মাথা পিনটি সেই যে 'মুরিয়া'র ওপর অনড় হয়ে ব'সে আছে, তার আর কোনো গতি হয়নি। সেখান থেকে আমরা গেলাম দোসীর কাছে। দোসী কানে হেডফোন লাগিয়ে তার কাজ করে যাচ্ছিল, আমাদের দিকে এক সময় মুখ ফিরিয়ে বললে,—একটা অর্ডার আসছে হে! আমাদের 'ফা' বলে একটা জায়গায় যেতে হবে।

—সেটা কোথায়?

—তা জানি না।

মাসুদ ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে,—তাহলে 'তাহিতি' আমরা যাচ্ছি না?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

মাসুদ অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলো, তারপরে উঠে দাঁড়ালো। আমাকে নিয়ে সোজা চলে এলো হুইল হাউসে, নেভিগেশন চার্টের সামনে! 'মুরিয়া'য় সেই লালমাথা পিনটি লাগানো রয়েছে, আর তার কাছাকাছি উত্তর পূর্ব কোণের দিকে একটি বিন্দুর পাশে লেখা রয়েছে 'পাপিতে'। বানানে 'পাপিতে', কিন্তু পরে জেনেছিলাম ওর স্থানীয় উচ্চারণ 'পাপাইতে'। এর পাশে ব্রাকেটে ছিল 'তাহিতি'। মাসুদ একটি স্কেল নিয়ে কী যেন মাপজোখ করলো, তারপরে বলে উঠলো, ইস মাত্র দশ মাইল দূরে!

কথাটা শুনে আমি বাইরে এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম, দিগন্তরেখার দিকে আমার দৃষ্টি, দশ বারো মাইল হলে নিশ্চয়ই তটরেখা চোখে পড়বে।

মাসুদ পাশে এসে দাঁড়ালো, বললে,—তাহিতি দেখবার চেষ্টা করছো? কী করে দেখবে? আমরা যে 'বে'-র মধ্যে ঢুকে রয়েছি। 'বে'-থেকে বেরিয়ে উত্তর পূর্বে যেতে হবে, না হলে 'তাহিতি' দেখবে কেমন করে? দিস্ ল্যান্ড ইজ দি বেরিয়ার! দাঁড়াও, আমি একটা ওয়েআউট বার করছি।

বলে আমাকে নিয়ে হাজির হলো একেবারে ক্যাপ্টেনের ঘরে। ক্যাপ্টেন বয়সে বৃদ্ধ যদি না-ও হন, নাবিকী ভাষায় তিনি 'বৃদ্ধ' বা ওল্ডম্যান। আমাদের বাঙালী সারেঙ বা খালাসীরা তাঁর আরও চমৎকার নামকরণ করেছে, 'বাড়িওয়ালা'। অবশ্য এসব তো তুমি জানোই।

এইখানে একটু থেমে আমার দিকে সে একটু তাকালো। পরক্ষণেই দৃষ্টি সরিয়ে জানালার দিকে মুখ ফেরালো, বলতে লাগলো,—ওল্ডম্যানের মুখখানি পাথর দিয়ে গড়া। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে তিনিও কী যেন দেখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, কী চাও?

মাসুদ সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে,—স্যার, হোয়ার ইজ 'ফা'?

উত্তর এলো,—সেটা আমিও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি। মাস্ট বি নিয়ারার টু আস্।

—নো চান্স অব সেইলিং টু তাহিতি?

পাথরের মুখ উত্তর দিলেন,—ইয়ু মিন পাপাইতে? ক্যাপিট্যাল অব তাহিতি? নোপ্। নট দিস্ টাইম।

পরাজিত সৈনিকের মতো আমরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

মাসুদ সেই থেকে যে 'গুম মেরে' গেল, তার মুখে আর 'রা' নেই। আমরা সেই মুহূর্তে যে যার কাজে চলে গিয়েছিলাম। কাজ করতে করতেও ভাবছিলাম মাসুদের কথা। ওর যা মনের অবস্থা, সত্যি সত্যিই না সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেয়। অবশ্য সাঁতার জানা থাকলেও দশ মাইল সমুদ্র পার হওয়া সোজা কথা নয়। অজানা সমুদ্রে সে চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র। এক, যদি লাইফ বোট নামিয়ে নিতে পারে। কিন্তু 'ওল্ডম্যান' যেরকম লোক, তাতে সে আদৌ রাজী হবে বলে মনে হয় না।

যাইহোক, মাসুদকে যথাসম্ভব চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করলাম। এক-সময় ও চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ঘরের দিকে গেল, কিন্তু ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরেই। তাহিতির 'ভাহিন'দের গল্প বোধ হয় তেমন আর জমলো না। জমলে কি আর কি ত্থ্বনি উঠে আসতো?

সারা জাহাজে কেমন যেন একটা নৈরাশ্যের ভাব। ঘড়াং ঘড়াং করে ডোরিকের শব্দ হচ্ছে, মাস্তুলের মতো লম্বা একটি দাঁড় ডোরিক নামক যন্ত্রের শাসনে ক্রেনের মতো কোপরার বস্তা চার নম্বর ফলকার গহ্বরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ডিউটির লোকেরা যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে, কিন্তু সে কাজে যেন প্রাণ নেই।

বেলা তিনটে নাগাদ ডোরিকের শব্দ থামলো। চীফ অফিসারের নির্দেশে ফলকা,—অর্থাৎ জাহাজের গহ্বর, যাতে মাল বোঝাই করা হয়, সেগুলি বন্ধ করতে লাগলো নাবিকরা। ক্যাপ্টেনের কামরার মাথায় খাটানো দড়িতে ঝুলতে লাগলো একটি বিশেষ ধরণের ফ্ল্যাগ, যার অর্থ, পাইলট ওয়াণ্টেড। যেন বলতে চায়, জাহাজ বন্দর ছেড়ে রওনা দেবার জন্য তৈরি, এখন পাইলট এলেই হয়।

জাহাজের সিঁড়ি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটু পরে জেটির বিপরীত দিকে জাহাজের গা বেয়ে ফেলে-দেওয়া দড়ির মই বেয়ে পাইলট উঠে এলো। মইয়ের নিচে এসে ভিড়েছিল ছোট্ট একটি মোটর বোট, তার গায়ে বড়ো করে লেখা 'পাইলট'।

পাইলট উঠে আসতেই কয়েকজন নাবিক তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—আর উই নট গোইং পাপাইতে?

—নোপ্।

—হাউ ফার ইজ 'ফা'?

—জাস্ট নাইন মাইল্স্ ফ্রম দি হারবার পয়েণ্ট।

পাইলট তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে গেল। জাহাজের জেটি ছেড়ে যেতে বড়ো জোর আর আধ ঘণ্টা লেগেছিল। পিছন পিছন পাইলট

বোটটি আসছিল না, রেডিও-অফিসারের কাছে শুনলাম, সেটি পরে আসবে, কারণ এই পাইলটই আমাদের নিয়ে যাবে 'ফা' তে।

খানিকক্ষণ বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয় মাস্তুদের অবস্থাও হয়েছিল আমাদের মতো।

ঘণ্টাখানেক মাত্র কেটে গিয়েছিল। তারপরে মনে হলো, জাহাজের গতি স্থির হয়ে আসছে, নোঙর ফেলার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, নাবিকদের 'হেঁইয়ো হেঁইযো' হাঁক। আমি কেবিন ছেড়ে বাইরে এলাম।

উধাও সমুদ্র ছেড়ে কখন আমরা একটি খাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম কে জানে! কাঠের লম্বা জেটি খানিকটা জলের দিকে সরে এসেছে। জাহাজ জেটিতে ভিড়তে লাগলো, আমরা অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জেটি যেখানে তটভূমি ছুঁয়েছে, যেখানে গোটা তিনেক লাল রঙের স্টেশন ওয়াগন ধরণের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আশেপাশে বিরাট বিরাট গুদামের শেড, কংক্রীটের রাস্তা, দোকানপাট, কিছু হ্যালফ্যাশানের ঘর-বাড়ি, কিন্তু সবই বাঁদিক ঘেঁসে। আমি যা দেখে অবাক হয়েছিলাম, তা ছিল ডান দিকে। ডান দিকটা একটা প্রকাণ্ড ঝিলের মতো, মেয়েদের হাতের বালার মতো ঝিলটিকে তটভূমি গোলাকারে ঘিরে রেখেছে। তার একেবারে এক প্রান্তে একটি খড়ের চালা, কয়েকটি গাছপালা,—তাছাড়া, একদিকে নারিকেল গাছ ছিল বটে, অন্য দিকটা ধু-ধু বালুর মতো দিগন্তে মিশেছে, সেখানে আবার কিছু গাছপালার আভাস, এবং আমাদের দিকে—নিঃসীম সমুদ্র। সমুদ্রে ঢেউ উঠছে, নামছে, ভেঙে পড়ছে, কিন্তু ঝিলের জল একেবারে নিস্তরঙ্গ—একটি বিশাল আয়নার মতো পড়ে আছে, তাতে পড়েছে শুভ্র মেঘদলের ছায়া। কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। তখন বেলা মাত্র চারটে, দিগন্তরেখার ঠিক উপরে, একটি উজ্জ্বল তারা ফুটে রয়েছে। আমি সম্মোহিতের মতো রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দিনের আলোয় অমন জ্বলজ্বলে 'তারা' দেখা, এ আমার পক্ষে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পরে শুনেছিলাম, পলিনেশিয়ার মহাসমুদ্রে এ নাকি আদৌ বিস্ময়কর কিছু না।

জাহাজের কোথায় কী হচ্ছিল জানি না, আমি রেলিং ছেড়ে একবিন্দুও নড়তে পারলাম না। ধীরে ধীরে দিনের আলো স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলো, ঐ তারাটা একটু একটু করে ওপরে উঠলো, তাকে আরও বড়ো আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমি ঝিলের জলে ঐ তারারই প্রতিবিম্ব দেখছিলাম। বাঁ-দিকে ঐ নারিকেল-বীথি, ডানদিকে ঝিলের প্রান্তে একটি কুটির আর তারপরেই উধাও মাঠ—সব মিলিয়ে যেন কোনো শিল্পীর আঁকা অবিস্মরণীয় ছবি।

কিন্তু এরপরে আরও বিস্ময় যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা আমি জানতাম না। দিনের আলো তখনো মিলিয়ে যায় নি, বড়ো উজ্জ্বল তারাটি দিগন্ত ছাড়িয়ে আকাশের খানিকটা ওপরে চলে এসেছে, এমন সময় ঠিক দিগন্তরেখায় একটি আলোর বিন্দু জ্বলে উঠলো। তার আগে ওখানে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লো একটা আলোর বিভা, তারপরে দেখতে দেখতে ফুটে উঠলো

আধখানি ধনুকের মতো চাঁদ। ঠিক সূর্যোদয়ের মতো, কিন্তু উদয় লগ্নের রবির মতো আরক্তিম নয়। চাঁদকে উদয় মুহূর্তে দেখাচ্ছিল ঝলমল-করা স্বর্ণপিণ্ডের মতো এবং আমার চোখের সামনেই সে উঠে পড়লো গোলাকার সোনার একখানা থালার মতো! আগে দেখা আকাশের ঐ তারাটিকে এবারে চিনলাম, যাকে আমরা সন্ধ্যাতারা বলি—আসলে ভেনাস—শুক্রগ্রহ।

দিগন্তরেখাটি ছুঁয়ে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে, বেশ বড়ো একটি থালার মতো সমুদ্র থেকে উঠে পড়বার পরে আর তাকে স্বর্ণথালি বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যথাযথ একেবারে সুকান্তর কবিতার মতো 'যেন ঝল্সানো রুটি!'

তখনো দিনের আলো নেভেনি। লোকজন ঘুরছে ফিরছে, কাজ করছে, জেটির ওপরে বস্তা পিঠে করে মাল এনে ফেলছে। কোথাও কোনো আলো জ্বলেনি, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তের কাছে, অল্প দূরে স্নিগ্ধ আলোয় উজ্জ্বল শুক্রগ্রহ।

দিনের আকাশে চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা, এ বর্ণনা আমি পরে যখন হাতড়ে হাতড়ে পলিনেশিয়া সম্পর্কিত বইগুলি পড়েছিলাম, তখন কোথাও পাইনি। মম, স্টিভেনসন, পিয়েরলোতি থেকে শুরু করে আরও কতো লেখকের বই, কোথাও এ বর্ণনা নেই। সবাই তাহিতি দ্বীপের সুন্দরীদের বর্ণনায় মুখর, কিন্তু এই আশ্চর্য প্রাকৃতিক শোভার কথা কেউ লেখেন নি কেন? এই জায়গাটার নাম—'ফা',-এই 'ফা'তেই হয়ত এই চিত্র দেখা যায়, আর ওরা কেউ হয়ত অখ্যাত এই 'ফা'তে আসেন নি, সবাই ছুটেছিলেন 'তাহিতি'র দিকে।

* * *

—তুমিই বলো, অভিভূত না হয়ে পারা যায়?—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো,—ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হলো, জেটির আলো জ্বলে উঠলো, চাঁদের আলো এবার আমাদের দেশের মতোই স্নিগ্ধ। ফুটফুটে রুপালী জ্যোৎস্না ঝিল, মাঠ-ঘাট, সমুদ্র, সব একাকার করে দিয়েছে। ঝিলের আয়নায় আর একটি চাঁদ আর শুক্রগ্রহকে দেখা যাচ্ছে। নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলে তাদের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব—এ দৃশ্যই কি কম মনোহর?

আত্মহারা হয়ে চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ কাঁধের ওপর কার হাতের স্পর্শ। তাকিয়ে দেখি ঝকঝকে সুটপড়া মাসুদ আর তার পিছনে দোসী, বললে, রেডি হয়ে নাও, চলো আমাদের সঙ্গে।

—কোথায়?

বললে,—শহরে যাচ্ছি। শীগ্গির নাও, দেরি করো না। শহর এখান থেকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল।

ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। বললাম,—তোমরা যাও, আমি যাবো না।

—সে কী !

বললাম, আমি ঐ ঝিলের ধারে বেড়াবো। আর কোথাও যাবো না।

দোসী বললে,—তুমি কি পাগল হয়েছ? ঝিলে বেড়িয়ে কী করবে একা একা?

—তা হোক।

মাসুদ বললো,—মাত্র আজ রাত্রিটা! কাল ভোরে জাহাজ ছেড়ে দেবে। পরে আর তাহলে তোমার দেখা হবে না। যাও, কেবিনে যাও, চট করে পোশাক বদলে ফিটফাট হয়ে এসো।

আমি কিন্তু অনড়, অচল।

আশ্চর্য ঐ ঝিল! জল একটুও কাঁপছে না। ঝিলের দর্পণে চাঁদ আর তারা ঠিক আকাশের চাঁদ—তারার মতোই স্থির হয়ে ফুটে রয়েছে, স্থির ও শান্ত, দীঘির মতো! সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ওদের বললাম,—আমাকে মাপ করো। এই দৃশ্য ছেড়ে কোথাও আমি যাবো না।

—মাথা খারাপ তোমার! বলে একটু রাগ করেই নিচে নেমে গেলো ওরা। ওদের পরে একে একে জাহাজের বহুলোকই ফিটফাট পোশাকে নেমে গেলো দেখলাম। জেটির অপর প্রান্তে গাড়ির হর্ন ঘনঘন বাজতে লাগলো। যারা যাবার তারা সবাই চলে যাবার পর, আমি ধীরে ধীরে জেটিতে পা ফেললাম। তারপরে জেটি পার হয়ে তটভূমিতে। তখনও যে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তা আগে লক্ষ্য করি নি। সেখান থেকে ড্রাইভার হাঁকলো,—কাম ম'সিয়ে, তু তাউন।

—নো থ্যাঙ্কস,—বলে আমি ওদের বিপরীত দিকে রওনা হলাম। সারিসারি দোকান। তারাও আহ্বান জানাতে লাগলো। কেউ বললে, 'কাম ম'সিয়ে,' কেউ আবার যে কী ভাষায় কথা বললে, তার একবর্ণও বুঝলাম না।

—নো থ্যাঙ্কস,—বলতে বলতে সবাইকে এড়িয়ে আমি লোকালয় পার হয়ে একেবারে ঝিলের কিনারে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক সামনেই ধবধবে সাদা রঙ করা ছোট্ট একটা নৌকো একটা খোঁটায় বাঁধা রয়েছে, সঙ্গে দাঁড় পর্যন্ত লাগানো, যেন নেমে নৌকোর মাঝে বসে পড়লেই হয়। চাঁদের বুকের ওপর দিয়ে ওপারে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করলে মন্দ কী! ওপারে, জাহাজ থেকে দেখা সেই কুটির, নারকেল গাছ ও আরো কিছু গাছপালা।

কুটিরের ভিতরে একটি আলোর বিন্দু জেগে উঠেছে। সেই বিন্দুকে বুকে করে কুটিরও ঝিলের আয়নায় নিজের মুখ দেখছে!

ডানদিকে তাকালাম। জেটিতে দাঁড়ানো জাহাজটাকে একটা সরলরেখার প্রান্তে বাচ্চাদের আঁকিবুকি-কাটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। ওখানে উধাও সমুদ্র। ঝিল আর সমুদ্রের মাঝখানে কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো বালিয়াড়ি। আর আমার বাঁ-দিকে কিছুদূর পর্যন্ত বালিয়াড়ির লাগোয়া সারি সারি নারিকেল-বীথি। ওপারে কুটির আর ধু-ধু মাঠ। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি নিস্তরঙ্গ ঝিলের জল।

যে পথটা দিয়ে এগিয়ে এসেছিলাম, সেটা মনে হয় বেঁকে বাঁ-পাড় ধরেই ঐ মাঠের মধ্যে বিলীন হয়েছে। আমি হাঁটতে লাগলাম এই পথ ধরেই।

নারিকেল-বীথিকে বাঁয়ে রেখে চওড়া বেলে রাস্তাটা ধরে মাইল খানেক হাঁটবার পর ঝিল পার হলাম! রাস্তাটা এবার সোজা চলে গেছে মাঠের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে, সেখানে বিন্দু বিন্দু দেখা যায় আলোর রেখা, আর দেখা যায় গাছপালার আভাস। ওখানে গ্রাম আছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু অজানা দেশে একা অতদূর যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না, তাই সরু পায়ে-চলা-পথ ধরে সেই একক কুটিরের দিকেই অগ্রসর হতে লাগলাম। ফুটফুটে চাঁদেব আলোয় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়, পথ চলতে কোনো অসুবিধাই অনুভব করিনি।

কুটিরের কাছাকাছি হতে না হতেই কুকুর ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরুষ-কণ্ঠ কুকুরটাকে শান্ত করতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক এগিয়ে এলো। কোমরে ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি, গায়ে পাতলা কোনো হালকা রঙের হাওয়াইয়ান সার্ট। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, তরুণ বয়সী মানুষটি এগিয়ে এসে কী ভাষায় যে কথা বললো, তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। তবে বলার ভঙ্গিতে কোন রাগ-বিরাগ ছিল না, এটুকু বলতে পারি। আমি তার কথা বুঝতে পারি নি লক্ষ্য করে সে হাত দিয়ে দূরবর্তী জেটিসংলগ্ন আমাদের জাহাজটিকে দেখালো, অর্থাৎ যেন বলতে চাইলো, তুমি কি ঐ জাহাজ থেকে আসছো? মাথা নেড়ে জানালাম,—হ্যাঁ।

—ইন্দিয়ান?

—হ্যাঁ।

লোকটি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। তারপর পরম সমাদরে কুটিরের দিকে নিয়ে গেল, সঙ্গে-ছুটে-আসা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছিল দেখে সেটাকে থামাতে লাগলো। তার আপ্যায়নের ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, আমি যে কুটিরের ভিতরে ঢুকতে চাইনি, মাঠের দিকে সামান্য একটু এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম মাত্র, সেকথা আর তাকে বলতে পারলাম না।

কুটিরের সামনে ছোট্ট বাগান। তার একটি গাছ আমাদের ভয়ানক চেনা। ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, ডালে ডালে ফুলের স্তবক, কিছু নিচেও ছড়িয়ে আছে। যাকে আমরা 'কাঠচাঁপা' বলি, সেই ফুল। আমি নিচু হয়ে তুলতে যেতেই সে তাড়াতাড়ি উবু হয়ে একমুঠো তাজা ফুল কুড়িয়ে আমার হাতে দিলো। লোকটির গায়ের রঙ কালো নয়। চোখদুটো একটু ছোট ছোট হলেও নাক থ্যাবড়া নয়। মাথার চুল বড়ো নয়, কোঁকড়া-কোঁকড়া। আমার হাতে ফুল তুলে দেবার সময় তার মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কুকুরটা আমার গা শুঁকে নিয়ে আর ডাকাডাকি করল না। ছোট্ট একটা সাদা কুকুর। গায়ে কালো কিম্বা খয়েরী ছোপ, চাঁদের আলো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হলেও, কালো কিম্বা খয়েরীর তফাৎ ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

কুটিরের কাছাকাছি হবার পর দেখলাম, দাওয়ার ওপর একরাশ ফুল নিয়ে

মালা গাঁথছিল একটি তরুণী। তার কাছে কোনো বাতি ছিল না, চাঁদের ফুটফুটে আলোতেই তার মালা গাঁথা চলছিল। আমাদের আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো। ওর বুকে সংক্ষিপ্ত কাঁচুলি, কোমরে ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি, মাথার খোলা চুলের একদিকে ঐ চাঁপা ফুলেরই একটি গুচ্ছ গুঁজে রাখা। আমার সঙ্গের তরুণটি তাকে যেন কী বললে। তার উত্তরে 'আ-ওয়ে' 'আ-ওয়ে' ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে সে মাথা নাড়লো, তারপরে হাসি-হাসি মুখেই আমার দিকে এগিয়ে এসে দুটি হাতে অঞ্জলি পেতে দাঁড়ালো। আমি তার হাতে ফুলগুলি তুলে দেওয়া মাত্র সে খুশি হয়ে মাথা নিচু করে অনেকটা পশ্চিমী 'বাও' করবার মতো ভঙ্গি করে ফুলগুলি দাওয়ার ফুলের রাশির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো, তারপর ছুটে চলে গেল ঘরের ভিতরে। ঘর বোধহয় ঐ একখানিই, ভিতরে বাতি জ্বলছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে তার আভাস পাওয়া যায়।

তরুণটিরও খুশি-খুশি মুখ। মেয়েটি পরক্ষণেই মোড়া হাতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। তরুণটি সেই মোড়া নিয়ে দাওয়ার কাছ ঘেঁষে সেটা পেতে দিলো। তরুণটি ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললো, মেয়েটির মালা গাঁথা বোধ হয় তখনো শেষ হয়নি। কুকুরটি আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো, আর তরুণটি আমার হাত ধরে কী যেন অনুনয়ের স্বরে বললো। তারপরে মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে কী-কী যেন নির্দেশ দিলো, মেয়েটি আবার বারকয়েক বললো, আ-ওয়ে—আ-ওয়ে।

তারপরে দেখলাম তরুণটি চলে যাচ্ছে। আমি খাঁটি বাংলায় তাকে পিছন থেকে 'এই' বলে ডেকে উঠেছিলাম। সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি পকেট থেকে সিগারেটের একটি নতুন প্যাকেট বার করে তার হাতে দিলাম। সেটা পেয়ে সে যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলো। আবার কাছে এসে মেয়েটির সঙ্গে কথা বললো, দেশলাই আনালো, সিগারেট ধরালো, শেষ পর্যন্ত চলে গেল। কুকুরটি পিছন পিছন গিয়ে তাকে যেন খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এলো।

আমার পকেটে কিছুই থাকার কথা নয়, কেননা প্রস্তুত হয়ে বেরোইনি। কখন যে নতুন প্যাকেটের সিগারেট পুরোনোটির সঙ্গে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম মনে নেই। মানুষটি সিগারেট পেয়ে অমন শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠবে জানলে আরও কয়েক প্যাকেট সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম। জাহাজে সিগারেটের অভাব কী?

তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটির মালা গাঁথা দেখছিলাম। সে এক-একবার চোখ তুলে তাকাচ্ছিল, আর চোখে চোখ পড়তেই অল্প অল্প হাসছিল, এ-ও বড়ো অদ্ভুত। আমি বিদেশী, সম্পূর্ণ অজানা মানুষ। আমাকে দেখে সংকোচে সে একটুও অভিভূত হচ্ছিল না বা দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঘরের ভিতর ছুটে যাচ্ছিল না, পুরুষটি সম্ভবত ওর স্বামী, আমাকে নির্দ্বিধায় স্ত্রীর কাছে রেখে নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখছিলাম দাওয়ার অন্য

দিকে একটি বেতের দোলনা ঝুলছে, মধ্যে নিশ্চয়ই একটি শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে।

অল্পকালের মধ্যেই মেয়েটির মালা গাঁথা শেষ হলো। সে আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে ভিতরে চলে গেল। যাবার সময় দোলনা ধ'রে সামান্য একটু নাড়া দিয়ে গেল। তার নাড়া পেয়ে দোলনাটা আবার মৃদুমৃদু দুলতে লাগলো। কুকুরটা ততক্ষণে ফিরে এসে আমার কাছে বসেছিল। ঝিলের ওপর দিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস এসে লাগছে ফুলগাছগুলির পাতায় পাতায়।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো মেয়েটি। তার হাতে একটা কাঁচের গেলাস। আমার দিকে এগিয়ে দিলো। ডাবের জলের সঙ্গে মিষ্টি মেশানো। অথবা ডাবেরই বোধহয় ঐ স্বাদ। আমি চুমুকে চুমুকে ওটা শেষ করতেই সে গেলাস উঠিয়ে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সে এবার ফিরে এসে বসলো আমার কাছ ঘেঁষে দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে। আমার পায়ের পাশেই ওর দুখানি সুগঠিত পদপল্লব। অল্প অল্প পা নাড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে সেই রকম হাসিমুখেই কী যেন বললে, তার মধ্যে একটা শব্দ ছিল 'মুজিক'।

আমার চোখে-মুখে কী ভাব সে ফুটে উঠতে দেখেছিল জানি না, আবার উঠে চলে গেল ঘরের ভিতরে। আবার দোলনায় দিলো সামান্য একটু দোল। তারপরে নিয়ে এলো ছোট্ট একটি গীটারের মতো যন্ত্র। সেটি নিয়ে এসে আমার কাছে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে গীটারে ঝংকার তুললো, মৃদু ঝংকার আর তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে—'আ-লা-লা' ধরণের সুরেলা সুরলহরী! সেই নিস্তব্ধ ঝিলের ধারে নির্জন কুটিরে অবারিত জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় উধাও মাঠের দিকে তাকিয়ে তার ঐ মৃদু সুরেলা কণ্ঠসঙ্গীত! সে যে কী অপার্থিব আনন্দ-লীলার সৃষ্টি করলো তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই।

কতক্ষণ যে তার সুরের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙলো দূরাগত একটি ভ্রমরগুঞ্জনের মতো শব্দ কানে যেতে। তাকিয়ে দেখি মাঠের দিক থেকে দুটি তীক্ষ্ম আলোর ছটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তার সঙ্গে ভ্রমর-গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে। গীটার থামিয়ে ও-ও সেই দিকে তাকালো, তারপরে চট করে উঠে দাঁড়ালো, ঘরে গিয়ে গীটারটা রেখে এলো। ইতিমধ্যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে সামনের দিকে ছুটে গেছে। আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ওটা কী। একটি মোটর গাড়ি। সেটা অদূরে পথের মোড়ে এসে থামলো। স্টেশন-ওয়াগন ধরনের গাড়ি। গৃহকর্ত্রী ততক্ষণে দাওয়ার একটি খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ঐ দিকে তাকিয়ে রয়েছে উৎসুক দৃষ্টি মেলে।

গাড়ির আলো নিভলো। আর তারপরে দরজা খুলে কয়েকটি তরুণী এদিকে ছুটে এলো। খোলা চুলের রাশি পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত লুটিয়েছে মাথায় কাঠচাঁপা ফুলের মালা মুকুটের মতো পরা, বক্ষে স্বল্পবাসবন্ধনীর ওপর

দিয়ে ঝুলে পড়েছে চাঁপাফুলেব মালা, কোমরে নাভিদেশের নিচে ঘাঘরার মতো কী যেন ঝুলছে। খড়ের মতো কিম্বা পাটের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ সেই সুতো ঝুলছে। জনা ছয়েক তরুণী মেয়ে। কুটিরের দিকে ছুটে আসতে আসতে আমাকে দেখেই বুঝি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে এলো তারা, তাদের একজনের মুখ থেকে চাপা কণ্ঠস্বর নির্গত হলো —লুইজি।

খুঁটি ধবে দাঁড়ানো কুটিরের কর্ত্রী বললে, আ-ওয়ে!

নিস্পন্দ দেহে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হলো, তাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। দু'পক্ষের মধ্যে দুর্বোধ্য বাক্যবিনিময়। এক সময় আমার সঙ্গিনী অল্প হেসে সেই ফুলের মালা মাথায় ও গলায় পরলো, তারপরে ছুটে দাওয়া থেকে নেমে, ঐ মালা খুলে তাদেব হাতে বিলিয়ে দিলো। তারা ওর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো, যেন ওদের সঙ্গে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। তাদের মুখে বার বার 'লুইজি-লুইজি' শুনে সন্দেহ হচ্ছিল, 'লুইজি'ই হবে বোধহয় আমার সঙ্গিনীর নাম।

অবশেষে, বিফল মনোরথে তারা চলে গেল। গাড়ির দবজা বন্ধ হলো, হেড লাইট জ্বালিয়ে যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে তারা, যে পথে আমি এসেছিলাম, সেই ঝিলের ধারঘেঁষা পথ ধরে উধাও হয়ে গেল। সে এলো আমার কাছে, দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম,—লুইজি?

সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো, অল্প একটু হেসে নিজের বুকে হাত রেখে বললে,—মি লুইজি।

বুঝলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়, তারই নাম লুইজি। লুইজি খানিকক্ষণ বসে পা নাচালো, বার কয়েক আমার দিকে তাকালো, একবার ফিক করে হাসলো, তারপরে উঠে আবার নিয়ে এলো গীটার।

এবার তার কণ্ঠস্বর নয়, শুধুই গীটারের ঝংকার! শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কে যেন কিসের আকুতিতে ভেঙে প'ড়ে কোনো সাড়া বা সান্ত্বনা না পেয়ে গুমরে গুমরে উঠেছে! চাঁদ তখন মাথার ওপরে। বোধ হয় এক যুগ ধরে একভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ভেনাস,—শুক্রগ্রহ। হঠাৎ সে গীটারটা রেখে উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনলো, তারপরে ছুটে গেল দোলনার কাছে। তার শিশুটি বোধহয় জেগে উঠেছিল। দোলনার মধ্যে হাত ডুবিয়ে সে যেন একটা ডল পুতুলকে দুহাতে তুলে নিলো বুকের কাছে। তেমনি করে বসলো আমার পাশে, এবার পা মুড়ে। তারপরে আমার দিকে তাকালো, ফুটফুটে সুন্দর শিশুটিকে দেখতে দেখতে চোখ আর ফেরাতে পারছিলাম না। সে সেটা লক্ষ্য করে একটু হাসলো, তারপরে একটু গর্বের সঙ্গেই বললো,—মি বেবী।

অর্থাৎ 'আমার খোকা।'···আর আশ্চর্য, আমার সামনেই সে বিন্দুমাত্র

সংকোচ না করে কাঁচুলি খুলে ফেললো। তার স্তনযুগলের একটিতে মুখ ডুবিয়ে শিশুটি শান্ত হলো। লুইজি শিশুর মুখের দিকে আগ্রহ ভবে তাকিয়ে রইলো। অসীম স্নেহে মাঝে মাঝে তার খোকার মাথার চুল ঠিকমতো সাজিয়ে দিতে লাগলো। পরম মমতায় ভরা একখানি কোমল মাতৃ-মুখ।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ভঙ্গীতে বোঝাতে চাইলাম,—আমি আসি।

তার সেই অভ্যস্ত মৃদু হাসিটুকু মুখে ফুটে রয়েছে। কী মনে করে একখানা হাত সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। সেই নরম, আতপ্ত হাতখানিতে একটু চাপ দিয়ে আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার প্রিয় কুকুরটি রাস্তার মোড় পর্যন্ত আমাকে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলো। লুইজির দৃষ্টি আমার প্রস্থান-পথের দিকে যে বহুক্ষণ আবদ্ধ ছিল, এ যেন আমি বারবার মুখ ফিরিয়ে না তাকালেও বুঝতে পারছিলাম।

নারিকেল-বীথির ছায়াঘেরা সেই পথ দিয়েই জাহাজে ফিরেছিলাম। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন জাহাজ আবার অকূলে ভেসে পড়েছে।

একটু পরেই দোসী আর মাসুদ এলো গল্প করতে। তাদের খুশি-খুশি মুখ দেখেই বুঝলাম, রাত্রিটা তাদের খুব ভালোই কেটেছে শহরে। শহরে মেয়েরা মশাল জ্বালিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল। হোটেলে নৃত্যসঙ্গিনীও পেয়েছিল তারা। তারপরে একটু রাত হলে সমুদ্রতীরে বসে নাকি দেখেছিল তাহিতি-সুন্দরীদের ভুবন বিখ্যাত নৃত্যলীলা।

চমকে বললাম,—তাহিতি-সুন্দরী মানে? তাহিতি এখানে কোথায়?

দোসী হাসলো, বললে,—কোন দ্বীপে গিয়েছিলে? কোন দ্বীপ ছেড়ে এলাম আমরা? ঐটেই তাহিতি দ্বীপ।

মাসুদ বললে,—তাহিতিতে 'পাপাইতে' নামের প্রধান বন্দর বা শহরেই জাহাজ গিয়ে ভেড়ে, কিন্তু আমাদের ভাগ্য একটু অন্যরকম, 'বার্থ' খালি ছিল না বলে 'পাপাইতে' ছেড়ে 'ফা'তে গিয়ে আমাদের উঠতে হয়েছিল। অবশ্য 'ফা' থেকে 'পাপাইতে' আর কতদূর পথ? মাত্র পাঁচ মাইল। তোমাকে অত করে বললাম, তুমি কিছুতেই গেলে না। অত প্রকৃতি-প্রেমিক হলে কি আর মানুষ দেখা যায়? কী যে তুমি 'মিস্' করলে, তা তুমি নিজেই জানো না!

দোসী বললে,—দারুণ শহর ঐ পাপাইতে! জাহাজগুলো খাঁড়ি দিয়ে একেবারে শহরের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে যায়। জেটির পাশেই শহরের জাঁকজমক, হোটেল, ইত্যাদি! সারা রাত ধরে যেন উৎসব চলে। 'প্যারী'ও এর কাছে হার মেনে যায়।

বললাম,—মাথায় আর গলায় চাঁপাফুলের মালা-জড়ানো 'তাহিন'-সুন্দরীদের জগদ্বিখ্যাত নাচ কোথায় দেখলে?

—বালুবেলায়,—মাসুদ বললে,—তারা গাঁ থেকে আসে। সত্যিই তারা সুন্দরী। একটি মেয়ে, যাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম, সে সুন্দর গীটার বাজাচ্ছিল।

আমি চুপ করে রইলাম। মোটর-ছুটিয়ে আসা সেই ছয়জন সুন্দরীর কথা মনে পড়তে লাগলো, যারা লুইজিকে সঙ্গে নেবার জন্য হাত ধরে টানাটানি করছিল। হঠাৎ অতিথি না গিয়ে পড়লে সে-ও ঐরকম পোষাক পরে, মাথায়-বুকে চাঁপার মালা দুলিয়ে ওদের সঙ্গে আসতো। আমি যদি মাসুদদের সঙ্গে 'পাপাইতে',—অর্থাৎ যে শহরে তাহিতির জনসংখ্যার অর্ধেক বাস করে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম, তাহলে হয়ত ঐ লুইজিকেই পেতাম অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী রূপে। কিন্তু 'লুইজিকে' সত্যি সত্যিই দেখতে পেতাম কী? সেই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিস্তরঙ্গ ঝিলের ধারে, একক কুটিরে, ফুটফুটে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে-থাকা যে অপরূপ মূর্তিটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, ঠিক তাকেই দেখতে পেতাম কী?

কেবিনের গোলাকার ফোকর দিয়ে বাইরে তাকালাম। সমুদ্রের বুকে নারিকেল-বীথি নিয়ে তাহিতি দ্বীপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে একটি বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে।

দোসী আর মাসুদ তখন হো-হো করে হাসছিল, বলছিল, পুওরম্যান, তাহিতি গিয়েও তুমি তাহিতি দেখতে পেলে না। দারুণ 'মিস্' করেছো তুমি।

আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। তাহিতি সেদিনও দেখিনি, পরেও দেখিনি, কিন্তু তাহিতি আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

॥ ৩

লক্ষ্য করছিলাম, তাহিতি ছাড়ার পর জাহাজ জুড়ে খুশির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। দোসী বা মাসুদ চলাফেরা করছে, কাজকর্ম করছে, আর মুখে শিস দিয়ে সুর তুলছে। অন্যদের কথা ছেড়ে দেই, এদের দুজনের সঙ্গে আমার সব সময় ওঠা-বসা বলে ওদের দিকেই আমার চোখ পড়েছিল বেশি। প্রথমে মনে করেছিলাম এ বুঝি তাহিতির সুখস্মৃতির জের, কিন্তু পরে দেখলাম, তা ঠিক নয়। জাহাজ যে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ নিজেদের দেশ বা বাড়ির দিকে, এইতেই তাদের মনে জেগেছে উল্লাসের ঢেউ! অথচ, জাহাজ এখন কোথায়, আর দেশই বা কোথায়!

সারাদিন জাহাজ চলছে পশ্চিমে মুখ করে একটি সরলরেখা টেনে, সমুদ্র জুড়ে ছোট্ট ছোট ভেঙে পড়া ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় ফেনায়িত বুদবুদগুলির ওপর রোদ পড়ে যেন হীরের টুকরোর মতো ঝলমল করছে। ক্যাপ্টেন আমাকে অনেকগুলো কাগজপত্র টাইপ করতে দিয়েছিলেন, স্টুয়ার্ডের দেওয়া দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও এগুলো করছি, কিন্তু কাজে মন বসছে না, ইচ্ছা করছে 'রেলিং'-এর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের রূপ দেখি। আবহাওয়াও এখন মনোরম, না-গরম, না-ঠাণ্ডা, জাহাজেও আসবার সময়কার মতো মারাত্মক দোলানি

নেই,—'রেলিং'-এ এসে দেখি আমার মতো অবস্থা প্রায় সবারই। এমন কি ক্যাপ্টেনও কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়েছেন।

আমরা যত পশ্চিমের দিকে যাচ্ছি, সূর্যও তত পশ্চিমে হেলে পড়ছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সেই ভেঙে-পড়া অবয়ব আর চোখে পড়ছে না। আ-ভাঙা পুরো ঢেউগুলো এখন ঝাঁক বেঁধে দিগন্ত জুড়ে যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে! আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। সে বললে, সমুদ্রে ঢেউ আর আকাশে রঙ আছে বলে দেখতে ভালো লাগছে, নইলে এর কোনো আকর্ষণ থাকতো কী?

—তা ঠিক।

এখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা। তারপরেই খাওয়ার ঘণ্টা। খাওয়ার টেবিল আমাদের নির্দিষ্ট ছিল। তিন বন্ধুতে টেবিল ঘিরে বসলাম। মাসুদ দোসীকে জিজ্ঞাসা করলো—কী হে, নেক্সট পোর্ট কী? কোথায় ভিড়ছে জাহাজ?

দোসী বললে,—এখনো অর্ডার হয় নি। ক্যাপ্টেন বলেছেন আমরা সোজা পশ্চিমমুখে চলতে থাকবো। যতক্ষণ না কোথাও থেকে কোনো খবর আসে, ততক্ষণ থামবো না।

মাসুদ বললে,—কাল সকাল থেকে নজর রাখতে হবে। যদি সামোয়া দ্বীপে যাওয়া হয় ত, দারুণ হবে!

—সামোয়া দ্বীপে?—জিজ্ঞাসা করলাম,—সে আবার কোথায়?

মাসুদ বললে,—চার্টরুমে গিয়ে ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবে। বেশি দূরে নয়। কালই হয়ত কাছ দিয়ে চলে যাবো, আর নয়ত সোজা সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের টুটুইলা দ্বীপের বিখ্যাত প্যাগো প্যাগো বন্দরে গিয়ে হাজির হবো। সমুদ্রের বুক থেকে পাহাড় উঠেছে, তারই কোলে ঐ বন্দর, পাহাড়গুলো ঝক-ঝক করা উজ্জ্বল সবুজ বনানীতে ঢেকে আছে!

—তুমি গিয়েছিলে?

মাসুদ উত্তর দিলো,—কই আর গেলাম! এই ত প্রথম আমার এদিকে আসা। বইতে পড়েছি রবার্ট লুই স্টিভেনশন আর সামোয়ার কাহিনী।

আর কোনো কথা হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ করে মাসুদ চলে গেল চার্টরুমে তার কাজে। আর দোসীও গেল রেডিও-রুমে, কখন কী অর্ডার আসে কে জানে! জাহাজের খোল বা ফলকাগুলিতে আরও জিনিস নেবার জায়গা আছে, সেগুলি ভর্তি করতে হবে তো! ক্যাপ্টেনের নজর সেইদিকে!

কাজ অবশ্য আমারও ছিল। সে-সব সেরে যখন বাইরে এলাম, রাত তখন দশটার কম নয়! উঁকি মেরে দেখলাম, রেলিং-এ কেউ নেই, শুধু পাহারাদারি করবার জন্য কোয়ার্টার মাস্টারকে দেখা যাচ্ছে। লোকটা খুব বই পড়ে। ঢাকনা-দেওয়া ছোট্ট একটা বাতি জ্বালিয়ে তারই আলোয় ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে বই পড়ছে। বই যারা বেশি পড়ে, তাদের সঙ্গে সহজেই আমার খাতির

জমে যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি যেতে আমার মন চায়নি, এ পড়ে শুধু আগাথা ক্রিস্টি অথবা অন্য সব খুনোখুনির বই।

বাইরে তাকালাম, সমুদ্র শান্ত, কিন্তু নির্জীব নয়। ছোটবেলায় আমার এক ছোট দিদিমাকে খুব অদ্ভুত কথা বলতে শুনতাম। একবার কোথায় যেন তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তারই বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন,—ওঃ! কী জ্যোৎস্না! যেন রুপোগুলো ফিনকি দিয়ে গ'লে গ'লে পড়ছে! সে রাত্রে ঐ ছোট দিদিমার কথামতো ফিনকি দিয়ে গলা রুপোর জ্যোৎস্না কাকে বলে, তা যেন আমি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম।

আজকের কথা বলছি না, যুদ্ধের কাল সবে শেষ হয়েছে, সবে স্বাধীন হয়েছে ভারত। আমাদের নিজস্ব বাণিজ্য-জাহাজ তখনো তৈরি হয়নি বলে ভাড়া করা জাহাজ নিয়ে ব্যবসা-পত্তর চালাতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এটিও ছিল তেমনি এক ভাড়া করা, যাকে বলে 'চার্টার্ড' জাহাজ। এর মিড শিপ বা ঠিক মাঝখানে ছিল লোকজনদের থাকবার জন্য তেতলা বাড়ি। 'তেতলা'য় 'ব্রীজ', অর্থাৎ বারান্দা বিশেষ, যেখানে দাঁড়িয়ে বা ঘুরে ফিরে ক্যাপ্টেন নির্দেশাদি দিয়ে থাকেন। এছাড়া রয়েছে ক্যাপ্টেনের ঘর, রেডিও রুম, ইত্যাদি। আর তেতলার ওপরে ক্যাপ্টেনের ঘরের মাথায় ছিল রেলিং-ঘেরা ছোট্ট ছাদ, জাহাজী ভাষায় বলা হতো 'ডঙ্কি ডেক।'

জাহাজের ডেক, বারান্দা সবই নির্জন। ভালো করে সমুদ্র দেখবো বলে আমি রেলিং-দেওয়া লোহার সিঁড়ি দিয়ে ঐ ডঙ্কি ডেকে উঠলাম সন্তর্পণে। চমকে দেখি, স্বয়ং ক্যাপ্টেন ওখানে দাঁড়িয়ে। বয়সে প্রৌঢ় হলেও বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, অভিজ্ঞ নাবিক, ইংরেজ, কিন্তু 'ওয়েলস'-এর লোক। আমাকে দেখে বলে উঠলেন,—হ্যালো!

আমি সম্ভাষণের পালা সেরে বললাম,—আমি ভেবেছিলাম স্যর বোধহয় শুয়ে পড়েছেন।

অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—হ্যাঁ, শুয়ে শুয়ে একটু আধটু বই পড়ি, পড়তে পড়তে ঘুমোই। কিন্তু আজ আর তা হলো না। এসব জায়গা দিয়ে যাচ্ছি আর পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠছে। যুদ্ধের সময় নৌ-বিভাগে যোগ দিয়েছিলাম যে! এদিকে যে সব তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমারও যে না হয়েছিল এমন নয়।

বলতে বলতে জাহাজের ডান দিকে অর্থাৎ স্টারবোর্ড সাইড-এর রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। আমাকে ডাকলেন পাশে। স্বভাবে ক্যাপ্টেন সাহেবটি খুবই স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু সেদিনে ফিনকি দিয়ে উপচে-পড়া জ্যোৎস্না বোধহয় তাঁরও মনের আগল খুলে দিয়েছিল। আমি জাহাজের স্থায়ী কর্মচারী নই; কেরাণীটি অসুস্থ হয়ে ওয়ালটেয়ারের হাসপাতালে শয্যা নিলে এই ক্যাপ্টেন আর স্থানীয় এজেন্ট মহাশয়ের চেষ্টায় আমি জাহাজের ঠিকাদার কোম্পানীর

ম্যানেজার-রূপে অন্য লোক না দিয়ে নিজেই বদলি হিসাবে নিজেকে কেরানী-পদে সখ করে নিয়োজিত করেছিলাম। আর তা-ও এই একটি মাত্র যাতায়াত বা জার্নি শেষ করবার জন্য। জাহাজও বিশাখাপত্তন পৌঁছবে, আমিও জাহাজ থেকে নেমে আবার আমার অফিসে গিয়ে বসবো। এইসব কারণে জাহাজে আমার খাতির ছিল একটু অন্যরকম, ক্যাপ্টেনও ব্যবহার করতো বন্ধুর মতো। বললেন,—আমার নাম কী? কী নামে ডাকো তোমরা? ক্যাপ্টেন গিলবার্ট তো? এই আমারই নামে নাম এক দ্বীপপুঞ্জ আছে কিছু দূরের এক অঞ্চলে। সামোয়ার আরও উত্তর-পশ্চিমে।

—গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ?

ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে বললেন,—ঠিক বলেছো। এই গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে 'তারাওয়া' বলে এক 'অ্যাটল' বা গোলাকার প্রবালদ্বীপ আছে, সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল জাপানের সঙ্গে। কিন্তু এই অদ্ভুত জ্যোৎস্না রাত্রে যুদ্ধের বিভীষিকার কথা থাক, ঐ দ্বীপপুঞ্জে আরও একটি অ্যাটল আছে, তার নাম 'আবেমামা।' এর সৌন্দর্যের জন্য একে 'চাঁদের অ্যাটল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'অ্যাটল' মানেই তার মধ্যে থাকবে লেগুন বা উপহ্রদ। ঐ 'আবেমামা'র উপহ্রদের কোনো তুলনাই হয় না।

—আমরা কি ওখানে যাবো?

ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—না বোধহয়।

—সামোয়া?

ক্যাপ্টেনের উত্তর,—বলা যায় না, যেতেও পারি। সামোয়ার খবর কোথা থেকে পেলে? ষ্টিভেনশনের লেখায়? এই ষ্টিভেনশন ছিলেন যক্ষ্মারোগী। সেই মারাত্মক অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি সেকালে এই সামোয়া দ্বীপ-টিপে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভাবতে অবাক লাগে না? তবে শোনো। ঐ 'আবেমামা'-তেও তিনি এসেছিলেন, সে হচ্ছে ১৮৮৯ সালের কথা। ওখানকার রাজার নাম ছিল 'টেম বিনোকা।' তাঁরই অতিথি হয়ে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন ওখানে।

ক্যাপ্টেন থামলেন। আমি বলে উঠলাম,—খুব ভালো লাগছে শুনতে। আরও কিছু বলুন?

ক্যাপ্টেন বললেন,—আর কিছু মনে নেই। কতো ঘুরছি, কতো পড়ছি, সব কি মনে রাখা যায়? এ-ও মনে পড়তো না, এখান দিয়ে যাচ্ছি বলে মনে পড়লো। বললাম,—'বিনোকা'র কথায় কাছাকাছি শব্দের একটা নাম মনে এলো, বিকিনি। এই বিকিনি দ্বীপ কোথায়?

ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকালেন, বললেন,—বিকিনি দ্বীপ অর্থাৎ যেখানে প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটানোর পরীক্ষা করা হয়েছিল? সে এখান থেকে অনেক-অনেক উত্তরে জাপানের দিকে যেতে—ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জেরও আগে—মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে। 'ইকোয়েডোর' (বিষুবরেখা)-এর দশ ডিগ্রি উত্তর

অক্ষরেখার ওপর যেখানে ১৬০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা ভেদ করেছে, ম্যাপে তার কাছাকাছি খুঁজলে বিকিনিকে পেয়ে যাবে। কিন্তু আর নয় হে, কোথা থেকে হালকা মেঘ এসে চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বাড়ছে, সমুদ্র অশান্ত হচ্ছে, জাহাজও দুলছে ! চলো, নিচে নামি।

পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ দোসী আর মাসুদ জাহাজের স্টারবোর্ড রেলিং-এ এসে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে মনোযোগ দিয়ে দিগন্তরেখা দেখতে লাগলো।

—কী দেখছো ?

ওরা ঠোঁট উল্টে বললে,—কী আর দেখবো ? সামোয়া।

বললাম—আমরা কি যাচ্ছি সামোয়ায় ?

দোসী বললে,—না। যাচ্ছি আরও পশ্চিমে, বাড়ির দিকে।

মাসুদ চোখ থেকে দূরবীণ নামালো, হতাশার ভঙ্গি করে বললে,—না হে, সামোয়ার একটা বিন্দুও দেখা যাচ্ছে না।

এই সময় জাহাজের ঘণ্টি বেজে উঠতেই সবাই চকিত হয়ে তাকালো। আমরা তিনজনেই সিঁড়ি বেয়ে ব্রীজে গেলাম, সেখানে ক্যাপ্টেন তাঁর জমকালো পোষাকটা পরে দূরবীণ হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, পাশে চীফ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, আর চীফ স্টুয়ার্ড। দূরবীণটা চীফ অফিসারের হাতে দিয়ে মুখের কাছে একটা চোঙা তুলে ধরলেন, সবাই যাতে শুনতে পায় সেই রকম ঘোষণা করার সুরে বলতে লাগলেন—জাহাজ এখুনি বিখ্যাত কারমাডাক ও টোঙ্গা খাতের ওপর দিয়ে যাবে। আপনারা জানেন, যদিও এখান থেকে অনেক উত্তরে জাপান ও ফিলিপাইনের দিকে যেতে পথে পড়ে পৃথিবীর সব থেকে গভীর জায়গা 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' ৫৯৪০ ফ্যাদম বা পৌণে সাত মাইল গভীর, তবুও এখানকার এই খাতও কম যায় না, গভীরতায় ৫১৫৫ ফ্যাদম। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়, এই টোঙ্গা খাতের ওপর দিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক 'ডেট্-লাইন'। এই লাইন পার হলেই আমাদের তারিখ একদিন পিছিয়ে যাবে। আজ ১৫ তারিখ, যেই ঐ লাইন পার হবো অমনি এটা হয়ে যাবে ১৪ তারিখ। পূবে গেলে এই তারিখ বাড়তো, পশ্চিমে যাচ্ছি বলে কমলো। এই উপলক্ষে ছোট-খাটো উৎসব করা নিয়ম। স্টুয়ার্ড সাহেবকে বলা আছে, আপনাদের খাদ্য তালিকায় আজ একটু নতুনত্ব থাকবে, আর বলা বাহুল্য, 'পানীয়' থাকবে ফ্রি, যে যে-রকম চান হট্ অথবা কোল্ড। আমাদের জাহাজে কুক্‌কে নিয়ে চারজন ভারতীয় আছেন, তাঁরা চাইলে 'নিম্বুপানি' পর্যন্ত পাবেন, কুক্ তা অনায়াসেই তৈরি করে দিতে পারবে।

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শেষ হলো এবং কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা ইণ্টার-ন্যাশনাল ডেটলাইন পার হলাম, তখন আবার ঘণ্টাধ্বনি হলো, জাহাজের ভোঁ বাজলো, শুরু হলো উৎসব। ডেকে নাবিকদের নাচ শুরু হলো, শুরু হলো গান :

Fifteen men on a dead man's chest
Yo-ho ho and a bottle of rum.

আমি আর মাসুদ দোতলার ডেকে লাইফ-বোটের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের হুল্লোড় দেখছিলাম। মাসুদ বললে, ষ্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড'-এর গান গাইছে হে! এসব ওদের মুখস্থ। আমার মনে তখন একটা প্রশ্ন জেগেছিল, তাই মাসুদকে বললাম,—আচ্ছা, আসবার সময়েও তো আমরা এখানে না হোক অন্য জায়গা দিয়ে এই 'ডেট-লাইন' পার হয়েছিলাম, তখন এসব উৎসব-টুৎসব হয় নি কেন?

মাসুদ উত্তর দিলো,—তখন জাহাজ টাইফুনের ধাক্কা সামলাচ্ছে, মরণ-বাঁচন সমস্যা, সারা জাহাজের লোক আমরা মারাত্মক দোলানি খেয়ে অসুস্থ, মনে নেই? তখন উৎসব করবে কে?

—তা বটে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলে উঠলাম, আচ্ছা মাসুদ, স্টিভেনসনের সামোয়া ত আমাদের কলা দেখালো, এখন কোথায় যাচ্ছি ঠিক বলো ত?

—দেশমুখো। আবার কোথায়?

—সেও ত অনেকদূর! এখন গিয়ে থামছি কোথায়?

মাসুদ বললে,—চলো দেখি রেডিও-রুমে। দোসী গিয়ে ঢুকেছে। কোনো খবর থাকলেও থাকতে পারে। আমার মনে তখনও প্রশ্ন। বললাম,—আচ্ছা, এই খবরাখবর কী ভাবে আসে? দেয় কারা?

মাসুদ বললে,—নতুন বলেই তোমার ধোঁকা লাগছে। জাহাজ দেশ ছাড়বার আগেই মোটামুটি একটা ছক ঠিক করা থাকে। সব পোর্টেই ক্যাপ্টেন রেডিও-গ্রাম পাঠায়, যারা মাল রপ্তানী করতে চায়, তারাই 'এসো' বলে আহ্বান জানায়। আর সেই বুঝেই ক্যাপ্টেন জাহাজ ভেড়ায়। একেই সংক্ষেপে বলা হয় 'অর্ডার'। বুঝলে? এসো দেখি দোসী কি করছে।

আর দ্বিরুক্তি না করে আমরা ওপর তলায় গেলাম। দোসীর কানে হেড-ফোন লাগানো। মুখ নিচু করে কাগজে খসখস করে কী যেন লিখছিল। আমাদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো, বললে,—পরবর্তী বন্দর,—ভিতিলেভু দ্বীপ।

—সে আবার কোথায়?

গম্ভীর মুখে দোসী উত্তর দিলো—মানুষখেকো মানুষ যেখানে গিজগিজ করছে, সেই ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। দুটি বড় দ্বীপ নিয়ে মূল ফিজি, 'ভ্যানুয়ালেভু' আর 'ভিতিলেভু'। আমরা যাবো 'ভিতি'তে।

—বন্দরের নাম কী?

—সুভা!

সে রাতটা কেটে গেল। পরদিন বেলা একটা নাগাদ আমরা 'ফিজি'তে

এলাম। আশেপাশের অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে। মাসুদের সঙ্গে চার্টবুমেই আমার সময় কাটতো বেশি। নেভিগেশন চার্টে দেখা গেল, ফিজির ঐ 'ভিতিলেভু'র একটি নদীর নাম 'রেওয়া'।

নামটা শুনে আমি একটু চমকে উঠেছিলাম। দেশ থেকে বাইরে বেরুলে এটা হয়, দেশের কোন পরিচিত নাম হঠাৎ কানে এলে এই রকমই চমক লাগে। মনে পড়লো মধ্যপ্রদেশের একটা জায়গার নাম 'রেওয়া'। কথায় বলে 'রেওয়ার বাঘ'। রেওয়ার আশেপাশের অরণ্যের 'বাঘ'-এর খুব নামডাক। মীর্জাপুর কিম্বা এলাহাবাদ থেকে মোটরে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিবিজড়িত 'মইহার' যেতে গেলে পথে পড়ে এই 'রেওয়া'। কিন্তু সেই নামটা এখানে এলো কী করে?

মাসুদ বললে,—এখানে কতো ভারতীয় বাস করে জানো? দাঁড়াও সরকারী নোটবুকে কী লেখা আছে দেখি।

নোট বার করে মাসুদ দেখালো, এখানকার জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হচ্ছে ভারতীয়, সুতরাং নদীর নাম যদি ভারতীয় ভাষায় 'রেওয়া' হয়ে থাকে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

সেই রেওয়া নদীর মোহনার পাশ কাটিয়ে 'লাংকালা বে' ছাড়িয়ে আমরা 'সুভা'র খাঁড়ির মুখে 'বেরিয়ার রীফ' বা প্রবাল বাঁধ ঘেঁষে নোঙর ফেললাম। লাইট হাউস থেকে আলোর সংকেতে আমাদের জানানো হলো, ওখানে নোঙর ফেলো, বার্থ এখন খালি নেই। হলে যথারীতি পাইলট গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবে।

এইসব খুঁটিনাটি বর্ণনায় না গিয়ে একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, পাইলটের সাহায্যে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে জাহাজ যখন জেটিতে বাঁধা পড়লো, তখন প্রায় সন্ধ্যা। এই সময় আমার প্রচুর কাজ থাকে, আসে এজেন্টের লোক, পুলিশের লোক, কাস্টমসের লোক, ঠিকাদারের লোক। ক্যাপ্টেনের হাঁক ডাকের জন্য আমাকে তটস্থ থাকতে হয়। কাজকর্মের শেষে যখন আমি নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে।

'সুভা' শুধু বন্দর নয়, সমগ্র ফিজি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। দোসা বলেছিল, এখানে 'ক্যানিবল' অর্থাৎ মানুষখেকো মানুষ গিজগিজ করছে আর মাসুদ কেতাব দেখে বলেছিল, এখানকার জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে ভারতীয়। এত ভারতীয় এই সুদূর দ্বীপে এলোই বা কী করে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই, যতদূর স্মরণ করতে পারি সে হচ্ছে ১৯১৫ সালের ঘটনা। এই ফিজি দ্বীপে শ্রমিকদের নিপীড়নের খবরে তখন দেশে একটা আলোড়ন উঠেছিল। কারণ এই শ্রমিকরা সবাই ভারতীয়। গরীব মানুষ এরা, আড়কাঠির মাধ্যমে দ্বীপে গেছে রুজি-রোজগারের আশায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের দুই ইংরেজ সহযোগী সি-এফ-এনড্রুজ আর পিয়ার্সনকে ফিজি দ্বীপে যেতে প্রেরণ

দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখবেন, এই ভারতীয় খেটে-খাওয়া মানুষগুলো যেন আর নিগৃহীত ও অত্যাচারিত না হয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরুবার মতো সাজসজ্জা করে যখন প্রস্তুত হলাম, তখন আবিষ্কার করলাম, ক্যাপ্টেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও জন-কয়েক কর্তব্যরত কর্মী ছাড়া জাহাজে আর কেউ নেই। আমার প্রিয়বন্ধু দোসী আর মাসুদও আমাকে ফেলে চলে গেছে। এমন কি আমাদের গোয়ানিজ কুকটি পর্যন্ত নগর-সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়েছে।

কী আর করবো? একা একা জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাটিতে যখন পা দিলাম, তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি সারা বন্দর জুড়ে একটিও লোক নেই। জাহাজের ডেরিকে যেমন ঘর্ঘর শব্দ নেই, তেমনি জেটিতে মাল ওঠানোর হাঁকডাকও নেই। জাহাজ ভিড়লেই হৈ-হৈ করে মাল ওঠানো বা নামানোর কাজ শুরু হয়, কিন্তু আজ সব একেবারে নীরব! জেটির গেটের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম, কোনো শ্রমিক-ধর্মঘট হয়নি তো? আশেপাশে একটিও লোক নেই। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো? গেটও বন্ধ, মধ্যকার একটি ফোকর শুধু খোলা দেখা যায়, যা দিয়ে লোক গলে যেতে পারে। তাকিয়ে দেখলাম, পাশের অফিসের বারান্দায় ইউনিফর্মধারী একজন কাস্টম্‌স্ অফিসার বসে কাগজ পড়ছেন। মাথার ক্যাপটা খোলা, তাতে তার মাথার কালো আর কোঁকড়া শক্ত চুলের গোছা দেখা যায়, কপালটা একেবারে ঠিক চৌকো, দাড়ি গোঁফ কামানো, রং খানিকটা কালো হলেও চেহারায় ভারতীয় বলে মনে হচ্ছিল না। আমার ভাবভঙ্গি দেখে নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন,—ইয়েস?

বুঝলাম ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন। তাই কথাবার্তা বলার অসুবিধা হলো না। এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণের পালা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম,—জেটির লোক নেই কেন? স্ট্রাইক?

তিনি একটু হেসে বললেন,—না, স্ট্রাইক নয়। আজ শহরে একটা ভারতীয় ফিল্ম দেখানো হচ্ছে, এখানকার মজদুর সবাই ভারতীয় তো? তাই ছুটেছে ছবি দেখতে।

—কাজ ছেড়ে?

—তা, কী করবে বলুন? ক্বচিৎ কখনো আসে ভারতীয় ছবি। ওরা দাঁড়োবে না?

—কতদূরে বলুন তো?

বললেন, জাহাজ থেকে নেমেছেন, জেটিতে একটাই জাহাজ। সেজন্য ধরে নিতে পারি নিশ্চয়ই আপনি ভারতীয়?

—হ্যাঁ।

হেসে বললেন,—তাহলে ত যাবেনই! না-না দূরে নয়, হেঁটে যেতে পারবেন। মিনিট দশ বারোর বেশি নয়। পিকচার হাউস।

এগিয়ে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালাম, বললাম,—মাপ করবেন, আপনি নিজে যান নি যে ?

উত্তর দিলেন,—ডিউটি। তাছাড়া আমি এখানকার লোক—মেলানেশিয়ান।

বললাম,—ঠিক আছে। অশেষ ধন্যবাদ।

বলে, গেটের ফোকর গ'লে বাইরে এলাম। গেটের সামনে আলোর প্রাচুর্য আছে, কিন্তু গাড়িটাড়ির চিহ্ন নেই, তবে দোকানপত্তর খোলা যদিও ভিড় একেবারেই নেই। আমি একজন কনেস্টবলকে ধ'রে পথের হদিশ জেনে নিলাম। তার নির্দেশমতো ডান দিকে চলছি। রাস্তাটা সোজা গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে আর একটি বড়ো রাস্তায় পড়েছে। মনে হলো এটাই বোধ হয় সুভার প্রধান পথ। কিছু লোকজন চোখে পড়লো। একটা হুডখোলা সেকেলে মোটর গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইকেলেও কিছু লোক চলছে। পরনে সবারই প্যান্ট আর সার্ট! একটি সাজানো-গোছানো দোকানের নাম—'ব্রাউন অ্যান্ড জোন্সকে'। সে-দোকান ছাড়িয়ে কিছু দূর যেতেই সিনেমা হলের সামনে পড়লাম। অদম্য আগ্রহ নিয়ে লবিতে ঢুকে স্টিল ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। কিন্তু না, এখন দেখানো হচ্ছে বলে যে ছবিগুলি সাজানো আছে, তা দেখে বুঝলাম, ভারতীয় নয়, একটি ইংরেজী সিরিয়াল ছবি। তাহলে সেই ছবিঘরটি কোথায়, যেখানে ভারতীয়রা নিজেদের ছবি দেখবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে? একজনের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে আরও হাঁটতে লাগলাম। একটু পরেই পেলাম একটি মোড়। মোড় পেরিয়ে অন্য একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকতেই মনে হলো অভীষ্ট স্থানে এসে পড়েছি। একটু এগিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দোসী-মাসুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছবিঘরের লাগোয়া ঠিক আমাদের দেশের মতোই একটি পানের দোকান। সিগারেট থেকে লেমনেডের বোতল সবই সাজানো। ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকছিল। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে বললাম,—এখানে পানের দোকান?

দোকানদারের মাথায় কালো গোল টুপি। সে অল্প একটু হেসে বললে,- ভাইসাব, এখানে আমাদের দেশোওয়ালীরাই বেশি, খাস ফিজির লোক মাত্র শতকরা ৪২ জন, শতকরা আটজন মাত্র ইয়োরোপীয়ান ও অন্যান্য। তাহলেই বুঝুন, আপনাদের সেবার জন্য পান থাকবে না? খেয়ে দেখুন, আসল বেনারসী চীজ। জর্দা দেবো?

বললাম,—না ভাই, জর্দা চলবে না।

তারপর ওদের দিকে ফিরে বললাম,—বেশ যাহোক, আমাকে ফেলে চলে এসেছো যে?

দোসী বললে,—আরে বাবা, যা ব্যস্ত ছিলে তুমি!

মাসুদ একটি পানের খিলি মুখে পুরে বললে,—লোকাল সিগার খাবে নাকি? আমাদের ওদিককার চুট্টার মতো, দারুণ কড়া।

বললাম,—তা এখানে দাঁড়িয়ে করছো কী? সিনেমা দেখবে না?

দোসী বললে,—কী করে আর দেখবো? একটিও টিকিট নেই। এমনকি একস্ট্রাও না। একস্ট্রা টিকিটে লোক নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

এই সময় দোকানদারের খিলি বানানো হয়ে গিয়েছিল, আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে,—ভাইসাব, আমার টিকিটটাও আপনাদের মতো এক জাহাজী দেশোয়ালীকে দিয়েছি, কোথাও কোনো টিকিট নেই।

—কী ছবি হচ্ছে?

দোকানদার বললে,—বহুৎ বড়িয়া ছবি।

মাসুদ বললে,—লবিতে চলো। সাজানো ছবিগুলো দেখি। তাহলেই বুঝতে পারবে।

দোকানদারের পয়সা মিটিয়ে লবির মধ্যে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বইয়ের নাম,—স্ট্রীট সিঙ্গার। প্রধান ভূমিকায় কে? না, আমাদের সায়গল আর কাননবালা।

দোসী, মাসুদ দুজনেই অবাঙালী, কিন্তু আমি যে বাংলার। হিন্দী হলেও কলকাতার ছবি। এ ছবি দেখবো না!

ওরা বললে,—খুব চেষ্টা করেছি, কোনো উপায় নেই। কুক্ অনেক আগে এসেছিল, সে ঠিক ঢুকে গেছে।

—তাহলে কালকে যেরকম করেই হোক দেখতে হবে!

ওরা উত্তর দিলো,—কাল অন্য ছবি। এ ছবি মাত্র একদিনের জন্য। এখানে ইংরেজি ছবিরই দাপট বেশি।

—ঠিক জানো?

দোসী বললে,—বিজ্ঞাপনটা ভালো করে দেখো। আজই শেষ রজনী। কাল ইংরেজি ছবি,—'জোরো রাইডস্ এগেন।'

—তাহলে একদিনের জন্য ছবি আনাই বা কেন?

মাসুদ বললে,—ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা আলাপ করছিলাম। আমাদের বম্বেরই লোক। পার্শী। চেষ্টা করছেন যাতে বেশি বেশি দেশের ছবি দেখানো যায়। কিন্তু আপাতত তাঁর করার কিছু নেই। অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর একখানা ছবি আনানো গেছে, আবার কালই প্লেনে চলে যাবে সিঙ্গাপুর।

—এখানে প্লেন আছে নাকি?

দোসী বললে,—আছে বই কী। কী নেই? রেডিও স্টেশন আছে, দৈনিক খবরের কাগজ আছে। এতসব যেখানে আছে, সেখানে এয়ারপোর্ট থাকবে না? আছে। নাম হচ্ছে নন্দী এয়ারপোর্ট।

বললাম,—অনেক খবর ত যোগাড় করেছো। কিন্তু মানুষ খেকোদের হদিশ করতে পারলে কী?

দোসী উত্তর দিলে, আশেপাশে আছে নিশ্চয়ই! ওশান পাইলট কেতাবে কি মিথ্যে লিখবে?

আচ্ছা সে মীমাংসা পরে করা যাবে। এখন বলো ত, আসল ছবি কি আরম্ভ হয়ে গেছে ?

মাসুদ বললে,—তা হয়ে গেছে বই কী।

বললাম,—কী আফশোষ ? আমি থাকি ভাইজাগে, বাংলা ছবি আমিও বহুদিন দেখি না।

মাসুদ বললে,—ভাইসাহেব, এটা হিন্দী ছবি, বাংলা নয়। তা-ও শুনলাম অনেক পুরানো।

—কিন্তু বাংলায় তৈরি।

বলা বাহুল্য, আমাদের কথাবার্তা চলছিল হিন্দিতে ! কথায়-কথায় কখনো উত্তেজনায় বা আবেগে কণ্ঠস্বর উঁচু হচ্ছিল। আলো আঁধারিতে তেমন লক্ষ্যে পড়েনি, অদূরে লবির একধারে একটি মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, পাতলা চেহারা, রং কালো। কিন্তু অবাক কাণ্ড, পরনে কালো পাড় গোলাপী শাড়ি। তিনি যে কখন ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। হঠাৎ তাঁর উপস্থিতি টের পেতেই আমি চুপ করে গেলাম, আমাদের দেশের হিন্দুস্থানীদের মতোই শাড়ি পড়ার ধরন। চোখে-মুখে খুবই সলজ্জভাব, তবু কৌতুহলের তাগিদ তিনি পরিহার করতে পারেন নি। মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন,—আপলোগ ভারৎসে আরহে হৈ, কেয়া ?

একযোগে আমরা বলে উঠলাম,—জী।

এরপর হিন্দীতেই কথাবার্তা হতে লাগলো। আজ যে একটি ভারতীয় জাহাজ এদেশে এসেছে, সে খবর আর পাঁচজন ভারতীয়দের মতো তিনিও জানেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছেন আমরা ভারতীয় এবং বেশভুষা দেখেও তাঁর অনুমান করতে ভুল হয়নি যে আমরা সেই জাহাজেরই লোক। বলা বাহুল্য, তিনিও ভারতীয়। বললেন, আপনারা কি ছবিটা সত্যিই দেখতে চান ?

মাসুদ বললে,—জরুর।

তিনি বললেন,—তাহলে কৃপা করে আমাদের বাড়িতে আসুন, ওখান থেকে দেখতে না পেলেও কথা শুনতে পাবেন, গান ভী শুনতে পাবেন।

—কোথায় আপনার বাড়ি ?

তিনি বললেন,—ছবিঘরের ঠিক পিছনেই। পাশের সরু গলি দিয়ে ঢুকতে হয়।

আমাদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম, তবু একটু ইতস্তত করছিলাম। বললাম, আপনাদের অসুবিধা হবে না তো ?

তিনি বললেন,—দেখুন ভাইসাব, আপনারা দেশের লোক, আপনাদের কাছ থেকে দেশের খবরা-খবর কতো শুনতে পাবো ! অসুবিধা হলে বরং আপনাদেরই হতে পারে, গরিব এক বহিনের বাড়ি যাচ্ছেন, খাতির-যত্ন কিছুই করতে পারবো না।

এরপরে আর কথা চলে না। আমরা ওঁর সঙ্গে একটা গলি দিয়ে ছবিঘরের পিছনে এলাম। এটাও খুব সরু একটা গলি। গলির ধারে ছবিঘরের উলটো দিকে লম্বা ব্যারাকের মতো বাড়ি। এদিকটা ব্যারাকের পিছন দিক, লম্বা দেওয়ালের মতো সমান্তরাল চলে গেছে, ভিতরে-ভিতরে শিক দেওয়া জানালা বসানো। ঠিক মাঝামাঝি একটা জানালা দেখিয়ে তিনি বললেন,—এই যে আমার ঘর। কিন্তু আমাদের একটু ঘুরে যেতে হবে।

—তা হোক।

বলে আমরা ওঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মোড় ফিরে ব্যারাকবাড়ির সামনে এলাম। বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ছোটখাটো মাঠের মতো। সারি সারি ঘরগুলোর লাগোয়া খানিকটা চওড়া বারান্দাও দেখা গেল, মাথায় টালি দেওয়া ঢালু ছাদ। অনেকের ঘরের সামনেই বারান্দার আলো জ্বলছিল, দু'একজন বৃদ্ধ চৌপায়ায় চুপচাপ বসেছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর ঘরের সামনে এসে তালা খুললেন। খুব ছোট্ট একফালি জায়গা, একপাশে বোধহয় রান্নাঘর, অন্যদিকে কলতলা। তারপরেই ঘর। একপাশে একটা তক্তপোষের ওপর শতরঞ্চি পাতা, অন্যদিকে ছোট একটা টেবিল আর চেয়ার। ভদ্রমহিলা সুইচ টিপে আলো জেলে আমাদের বসতে বলে জানালা দুটো পুরো খুলে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গমগম করা কথা ভেসে আসতে লাগলো ছবিঘর থেকে। কথাগুলো বোঝবার উপায় নেই, শুধু চিৎকার করে কেউ কাউকে যখন ডাকছে, তখনই তা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সায়গল বা কানন দেবীর গানও শুনেছিলাম, কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়নি। তবে সুরের মাদকতা যাবে কোথায়? কথাগুলো বাংলা নয়, তবু কী এক অব্যক্ত আনন্দে চোখের কোণ বারে বারে ভিজে উঠছিল! আজ ভাবতে অবাক লাগে, কী আবেগপ্রবণই না ছিলাম তখন!

আজ গানগুলো মনে নেই, কিন্তু একটা ডাক স্পষ্ট মনে আছে 'ভুলুয়া'। কে যেন কাকে চিৎকার করে ডাকছিল 'ভুলুয়া!'

কিন্তু ছবির কথা থাক, যাঁকে কেন্দ্র করে এই ছবির গান শোনার সুযোগটা হয়েছিল, তাঁর কথা না বললে এ-কাহিনীর অবতারণাই বৃথা যাবে।

এই ব্যারাকে দু-খানি ঘর নিয়ে এক-একটি কোয়ার্টার। আমাদের বহিনজীদের শোবার ঘর পাশেই। তিনি আমাদের বসবার ঘরে বসিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা করে সঙ্গে অতি মুখরোচক চাল-ছোলাভাজা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করলেন। আমরা বসতে বললাম। বসলেন না, পাশের ঘরের দরজা অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে সেই সলজ্জ, মৃদু ভঙ্গিতে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

মাসুদ ও দোসী বম্বে অঞ্চলের লোক, আমি কলকাতার। শুনে বললেন,—খুব ছোটবেলায় পিতাজীর সঙ্গে একবার কলকাতা গিয়েছিলাম। হেঁটে হাওড়ার পুল পার হয়েছিলাম। সারি সারি নৌকোর ওপর বসানো কাঠের

পুল, তার ওপর দিয়ে আদমী ভী যাচ্ছে, হাওয়া গাড়িভী যাচ্ছে। তাজ্জবের কথা!

বললাম,—বহিনজী, আপনি কোনদিককার লোক, মানে—

উনি বললেন,—মধ্যপ্রদেশে সাতনা বলে একটা জায়গা আছে, তার কাছে আমাদের বাড়ি। সাতনা থেকে করিব 'দশ মিল' হবে।

—তবে তো রেওয়ার কাছে?

বললেন,—হ্যাঁ, তা হবে, নাম শুনেছি রেওয়ার।

—মইহার?

—হ্যাঁ, তাও শুনেছি।

—খাজুরাহো।

—হ্যাঁ, ও নাম ভী শুনেছি।

বললাম,—যান নি? ও-তো সাতনা থেকে বেশি দূরে নয়!

বললেন,—ভাইসাব, আমরা গরিব খেতিহর, মুলুক বেড়াবো কী করে? বারো বরষ যখন উমর, তখন সাদী হয়, আর ষোল বরষ বয়সে আমার ঘরওয়ালার সাথ্ এইখানে চলে আসি।

—এর মধ্যে আর দেশে যান নি?

ভদ্রমহিলার চোখ ছলছল করে এলো, বললো,—না।

—সে কী!

কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি, মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, কিন্তু যেই গান কানে ভেসে আসছিল, অমনি চুপ করে যাচ্ছিলাম। গান শেষ হতেই আবার শুরু করছিলাম আলোচনা।

মাসুদ বললে,—বহিনজী যদি কিছু মনে না করেন, এ-ঘরের মালিক কোথায়? তিনি কি ছবি দেখছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন,—না। তিনি এখানে নেই, গত মহিনায় দেশে চলে গেছেন।

—সে কী!

বললেন,—হ্যাঁ। সবাই বলছে, দেশে আজাদী এসেছে। বহুৎ জান কোরবান করে, বহুৎ লড়াই-উড়াইয়ের পর আজাদী মিলেছে, কিন্তু ভাইসাব, আপনাদের পুছ করছি, মনে কিছু করবেন না, আমার ঘরওয়ালা মুলুকে কীরকম আজাদী হয়েছে দেখতে গেছে, সেই সঙ্গে বুড্ঢা বাপ-মাকেও দেখে আসবে। লেকিন বাংলা মুলুকের লোক, কি বোম্বাই মুলুকের লোক, কি মধ্যপ্রদেশের লোক, এইসব ওখানকার লোক আজাদী পেলেই কি তামাম ভারতবাসী আজাদী পেয়ে গেল? আমরাও ত ভারতের লোক। আমরা

আজাদী পেলাম কই? আমাদের কথা কেউ ভাবছে না কেন? ওখানকার মতো এখানেও আংরেজ সরকার কায়েম রয়েছে!

এ-কথার উত্তর আমরা দিতে পারিনি। যখনকার কথা বলছি, তখন ফিজি বা সামোয়া স্বায়ত্তশাসন পায়নি, গভর্নরের অধীনে একটি এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল, বিভিন্ন দ্বীপের প্রধানদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা-পরিষদও গঠিত হয়েছিল। আগে ভারতীয় মজদুরদের অবস্থা আমাদের দেশের সাবেক নীলচাষীদের মতোই ছিল, এনড্রুজ পীয়ারসন এসে কিছু ধাক্কা না দিলে সে অবস্থার পরিবর্তন হতো কিনা সন্দেহ।

যাইহোক ভদ্রমহিলার প্রশ্নের পর কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। কী যেন ভেবে দোসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, যুদ্ধের সময় আপনারা এখানে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—এই সুভা-তে?

—হ্যাঁ। যাবো কোথায়?

দোসীর আরও জিজ্ঞাসা ছিল। বললে,—লড়াই এখানে হয়েছিল নিশ্চয়।

সে বিষয়ে উনি বললেন,—না, লড়াই এখানে হয়নি, বড়ো বড়ো হাওয়াই জাহাজ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে, বন্দরে জাহাজ এসে ভিড়েছে, অনেক জাহাজ জায়গা না পেয়ে বাইরে নোঙর করেছিল এ-ও শুনেছি। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় এখানকার অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই যে ঘরগুলো দেখছেন, এগুলো মিলিটারিরা তৈরি করেছিল, এখন সরকার আমাদের থাকতে দিয়েছে।

—মিলিটারিয়া এখানে ছিল?

মহিলা বললেন,—হ্যাঁ, ফৌজী সব গোরা আদমী। তারাই ত হাওয়াই জাহাজের আড্ডা বানালো, টেলিফোন লাইন বাড়ালো, রাস্তাঘাটও অনেক করলো। যদি বেড়াতে যান, ত দেখবেন, পাহাড়ের ওপরে তাদের ঘাঁটিগুলোর নিশানা রয়েছে।

—এখানে বেস করেছিল বুঝি?

তিনি বললেন,—ঠিক বলেছেন। এখান থেকে রসদ জোগান যেতো। ধানের খেতও ওদের দৌলতে আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে।

—এখানে ধান হয়?

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন,—আগে হতো না, আমরা ভারতীয় মজদুররা এসে বহু মেহনৎ দিয়ে ধান বুনেছি।

—আপনারা নিজেরাই কি ধানক্ষেতের কাজে—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—না। আমরা আখের ক্ষেতে কাম করেছি। আখের ক্ষেতের জন্যেই দেশ থেকে এতো-এতো মজদুর এসেছে ক্ষেপে ক্ষেপে।

—এখানে আখ হয় বুঝি?

বললেন,—আখ মাড়াই করে চিনিভী হচ্ছে আজকাল। তাছাড়া পাহাড়ে গিয়ে দেখবেন, কফির চাষও হচ্ছে।

দোসী জিজ্ঞাসা করলো,—আর কি কি হয় এখানে?

ভদ্রমহিলা এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন, তারপরে বলে উঠলেন,—এখানকার জঙ্গলে একটা জিনিস হয়, তাকে এরা বলে 'বেরেড ফুরুট', আমরা বলি 'রোটিফল।'

মাসুদ কথাটায় উৎসাহিত বোধ করলো। বললে,—ব্রেড-ফ্রুট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুড়ো চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে কথাটি শুনেছি বটে।

মহিলাটি বললেন, মাঝে মাঝে শহরের বাজারে দেখা যায়। ছেলেরা যে ফুটবল খেলে, ফলগুলো ঐরকম গোল, তবে কিছুটা ছোট, বাইরেটা ঝকঝকে সবুজ, আবার কোনো কোনোটা একেবারে হলদে, সেগুলো পাকা ফল।

—খেয়েছেন কখনো?

বললো,—আমার ঘরওয়ালা একবার এনেছিল। ভেতরে নরম শাঁস থাকে। সেগুলো অল্প আঁচে গরম করলে বিলকুল রোটির মত দেখায়। একটু মির্চা আর নিমক মিশিয়ে খেয়ে মনে হয়েছিল যেন রোটি নয় আলুভাতে খাচ্ছি।

—বাঃ চমৎকার ত!

এর মধ্যে আবার গান আরম্ভ হয়েছিল। আবার সব চুপচাপ। গান থামবার পর দোসীই মুখ খুলল প্রথম। বললে,—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

তিনি অল্প অল্প হেসে বললেন,—ফরমাস করুন না, ভাইসাব?

—আপনার স্বামী ফিরবেন তো?

বহিনজী তাঁর অভ্যস্ত মৃদুকণ্ঠেই বললেন,— তা ফিরবেন।

—আপনি সঙ্গে গেলে পারতেন।

বহিনজী বললেন,—আমরা গরিব মজদুর, অতো রুপিয়া পাবো কোথায়? অতি কষ্টে তিনি নিজে গেছেন, আমি বা আমার মেয়ে যেতে পারি নি।

বলে উঠলাম,—আপনার মেয়ে! সে কোথায়?

বললেন—ঐ একটিই সন্তান আমার। সে সিনেমা দেখছে। একটি টিকিট কোনরকমে জোগাড় করেছিলাম, তাই সে যেতে পেরেছে। তাকে ছবিঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সামনে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় কথাবার্তা শুনতে পেলাম আপনাদের! দেশোয়ালী ভাষায় কথা বলছে কারা? আর একটু এগিয়ে দেখি আপনারা।

মাসুদ বললে,—মেয়ে খুব বাচ্চা নিশ্চয়ই? নইলে আপনি নিজে গেলেন বসিয়ে দিতে, এখান থেকে এইটুকু পথ?

মহিলা আমাদের দিকে মুহূর্তের জন্য মুখ ফেরালেন। বললেন,—ভাইসাব, আজকের আখবার আপনারা পড়েছেন?

—না!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন,—তাহলে আমার মেয়ের সম্বন্ধে সব জানতে পারতেন। তার উমর এখন ষোলো, লেকিন সাদী দিতে পারি নি। আমার ঘরওয়ালার দেশে যাবার এটাও একটি কারণ, যদি ভালো ছেলের খোঁজ-খবর পায়।

—কিন্তু খবরের কাগজে আপনার মেয়ের সম্বন্ধে কী বেরিয়েছে? মাপ করবেন, কথাটা জানতে চাইছি বলে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ভাইসাব, বহিন যদি দুঃখের কথা ভাইদের না জানায় তাহলে আর কাকে জানাবে? তা ছাড়া, আখবারে সবই বেয়িয়েছে, রেখে ঢেকে বলবার তো কিছু নেই।

বলে, একটু থেমে তারপরে শুরু করলেন,—ভাইসাব, আপনারা পড়িলিখি আদমী, কতো কী পড়েছেন, দেখেছেন। আমি লেখাপড়াও জানি না, আমার যেটুকু জানা তা ঐ আমার ঘরওয়ালার কাছ থেকে। বলার কিছু চুক হয়ে গেলে মাপ করবেন।

মাসুদ বলে উঠলো,—অমন করে বলবেন না দিদি, আমরাও তেমন পড়িলিখি নই। আপনি বলুন।

'দিদি' বলে সম্বোধন করায় বোধহয় খানিকটা সহজ হলেন মহিলা, বললেন, —ভাইয়া, এই ফিজিতে একটি আংরেজী কথা খুব আপনারা শুনবেন, কানিবল। ইয়ানে, মানুষ, অথচ মানুষ খায়।

এ-প্রসঙ্গে দোসী একেবারে লাফিয়ে উঠলো। বললে, এ-রকম মানুষ তাহলে সত্যিই আছে? তাহলে এখানে আপনারা আছেন কী করে?

ভদ্রমহিলা ওর উত্তেজনার বহর দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলেন। পরে অল্প একটু হাসলেন। বললেন,—আপনাদের জাহাজ শুনলাম কাল বিকেলেই ছেড়ে চলে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে সময় পাবেন কম, নইলে গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে একটু দূরে দূরে ঘুরে আসতে পারতেন। এখানে উঁচু উঁচু পাহাড় ভী আছে, জঙ্গল ভী আছে। কাল সকালের দিকে যদি সময় পান, তো, কম সে-কম একটু শহর ঘুরে নেবেন, দূর থেকে 'নামোসি' পাহাড়-চূড়াটা চোখে পড়বে। ওখান থেকে 'ওয়াইমান' বলে একটা ছোট নদী গিয়ে রেওয়ায় পড়েছে। এখানে অনেক বিহারী ভী আছে, ছট্ পরবে খুব ধুমধাম হয়। আমরা দল বেঁধে ঐ নদীতে গিয়ে অস্নান করে আসি, রেওয়া নদী অনেক দূরে। এত বরষ আছি, ঘোরাঘুরিও থোড়া-বহুৎ করেছি। সব থেকে উঁচু পাহাড় যে মাউণ্ট বিক্টোরিয়া আছে না? সেখানেও গাড়ি ভর্তি করে গিয়ে চড়িভাতি সেরে এসেছি, কখনো 'কানিবল' দেখি নি। এখানে মিউজিয়াম আছে, সকালে গিয়ে দেখতে পারেন। তাতে একটা ছবি লটকানো আছে, একটা গাঁ-মতন জায়গা, ঝোপড়ি-মাফিক একটা কুঁড়েঘর। তার সামনে বসে আছে জামা গায়ে পাকাচুলওয়ালা এক বুড়োমানুষ। নিচে লেখা আছে, ঐ বুড়োটাই নাকি শেষ বুড়ো যে মানুষ হয়েও মানুষের মাংস খেয়েছে। তাহলে ভাইয়া,

কী দাঁড়ালো ? সরকার থেকেই বলছে, সারা ফিজিতে কানিবল আর নেই। তবু মানুষের ভয় যায় না। শহরের ধারে এক জায়গায় সপ্তাহে দুবার বাজার বসে। পাহাড়ী লোকেরা আসে, অন্য দ্বীপের মানুষরা আসে,—তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'কানিবল' থাকতে পারে বলে লোকেরা রটনা করতে ছাড়ে না। আপনাদের বলি, রেওয়া নদীর ওপারে অনেকটা দূরে গেলে সমুদ্রের তীরে পেঁছনো যায়। তারই প্রায় গা ঘেঁষে ছোট্ট এক দ্বীপ আছে। এখানকার লোকেরা বলে, মবায়ু। কিভাবে রটে গিয়েছিল যে ওখানকার লোকেরা নাকি এখনো বাগে পেলে মানুষ ধরে ধরে খায়। আমার ঘরওয়ালা অনেকদিন আগে একবার দোস্তদের সঙ্গে ঐ দ্বীপে গিয়েছিল। কী দেখেছিল শুনবেন ? সেদিন ছিল উৎসব। বড়ো একটা শুওর ধ'রে তার মাথায় ডাণ্ডা মেরে তাকে শেষ করে ফেললো। তারপর তার পেট চিরে তাতে উনুনের মধ্যে-রেখে-গরম-করা পাথরের টুকরো ঢুকিয়ে সেলাই করে দিলো। এরপরে ছাল ছাড়িয়ে উনুনে ভালো করে ঝল্‌সে নিলো। এ পর্যন্ত দেখেই ওরা চলে এসেছিল। উৎসবের বাকি অংশ আর দেখেনি। আমার ঘরওয়ালা বলেছিল, এ-রকম করেই ওরা নাকি মানুষ খেতো। শুওরের বদলে মানুষ।

বহিনজী থামলেন। আমরা অসীম আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম। সিনেমায় তখন গান হচ্ছিল কিনা আমার মনে নেই। বহিনজী আবার বলতে লাগলেন, —এই মবায়ুর লোকেরা হাটে এলে এখনো লোকে ভয় পায়, কাছে ঘেঁষতে চায় না। আমার জিন্দগীতে কখনো এখানে মানুষ খাবার কথা শুনি নি, তবু যে কেন ওটা রটে, কারা রটায় তা জানি না। ভাইয়া সাচ বলবো, আমার ও-ব্যাপারে তেমন কোনো ভয়ডরই ছিল না, কিন্তু সেদিন যখন আমার ষোলো বছরের মেয়ে রাধা হারিয়ে গেল, তখন আমি দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরওয়ালা দেশে, আমি একা মেয়েছেলে কী বিপদে যে পড়লাম বোঝাবার নয়। একদিকে চোখের জল মুছছি, আর অন্য দিকে কোতোয়ালীতে দৌড়চ্ছি, এর মধ্যে আখবারের লোকেরা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো, আমি যেন সাচমুচ বাউরা হয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ কোন খোঁজ পাচ্ছে না, আমাদের দেশওয়ালীরাও ছুটোছুটি করে কোনো হদিশ আনতে পারছে না, লোকে বলতে লাগলো নির্ঘাৎ কানিবলরা ধরেছে। ঐ মবায়ুর দিকে দলবেঁধে যাও, যদি কোনো নিশানা মেলে। ওখানেই মানুষখেকোদের বাস। এতক্ষণে তোমার মেয়েকে ঝল্‌সে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে।

বলতে বলতে বহিনজীর চোখে আবার জল এসে গেল, গলা ধরে এলো। কোনক্রমে নিজেকে সামলে, চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন, কোন সন্তানের মা এ-কথা শুনে বেঁচে থাকতে পারে ! আমি এখানকার শিউমন্দিরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও, নইলে উঠবো না ! বোধহয় অজ্ঞান হয়েও পড়েছিলাম। পরদিন দুপুরবেলায় কোতোয়ালীর সিপাহী গিয়ে আমাকে শিউমন্দিরে খবর দিলো, থানায় এসো, তোমার মেয়েকে

পাওয়া গেছে ! আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লাম, পাগলের মতো ছুটলাম থানার দিকে। দেখি মেয়ে বসে আছে, আর কাছেই সেই ছবিতে দেখা মানুষ খেকো বুড়োর মতন একজন বুড়ো। মা আর মেয়ের মিলনের কথা বলে আর লাভ নেই। মা যত কাঁদে, মেয়েও তত কাঁদে। ক্রমে একটু ঠাণ্ডা হতে সব জানা গেল। ঐ বুড়োটা সত্যিই মবায়ু-দ্বীপের লোক। সমুদ্রের ধার থেকে কান্নার শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখে, একটা পালতোলা বিরাট জাঙ্ক ধরনের নৌকো প্রবাল-বাঁধের মধ্যে কী করে যেন আটকে গেছে, নৌকোর লোকেরা নেমে পড়ে নৌকোটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। হাত-পা-বাঁধা মেয়ে জানালায় শিকগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে! বুড়ো হাঁক দিয়ে লোকজন জড়ো করে তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়লো নৌকোর ওপর। নৌকোর লোকগুলো ফিজির লোক নয়। বলতে লজ্জা করে। তারা রীতিমত সভ্য মানুষ, এই ফিজিতেও তাদের যাতায়াত আছে। তারা মালয় কিম্বা সিঙ্গাপুর কিম্বা অন্য কোথাও থেকে এসেছিল। কালো মানুষ তারা নয়। দিব্যি ঝকঝকে চেহারা, আংরেজী বুলি হরবখৎ ফুটছে তাদের মুখে। শহরেই ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে মেয়েকে কিভাবে একা পেয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে অজ্ঞান করে একটা জীপে তুলে নিয়েছিল। কী তাদের মতলব ছিল কে জানে। ঐ মানুষখেকো দ্বীপের 'মানুষখেকো' লোকগুলো না গিয়ে পড়লে মেয়েকে আর ফিরে পেতাম বলে মনে হয় না। নৌকোর লোকগুলো বিলক্ষণ জখম হয়েও পালিয়ে গিয়েছিল, আর মবায়ু-দ্বীপের সেই বুড়ো মানুষটি মেয়েকে একা পেয়ে ঝলসে পুড়িয়ে খাওয়া তো দূরের কথা, অতি স্নেহে আর যত্নে একা নিয়ে এসেছে তাকে তার মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিতে! মেয়ে বললে মবায়ু-দ্বীপের লোকেরা কবে মানুষখেকো ছিল কে জানে। একটা পাথর-, বাঁধানো বিরাট বেদী আছে। যেখানে নরবলি দেওয়া হতো একথাও ঠিক। কিন্তু এখনকার মানুষরা অন্যরকম। শুনে অবাক হবেন ভাইয়া, তাদের মাতব্বররা আংরেজী বুলি অল্প অল্প বলতে পারে। তারা শহরের হাটে আসে সওদা করতে, সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, তাদের নামে ঐ জঘন্য রনোগুলো করতো মেয়ে চোর বোম্বেটের দল। সব দোষ ওদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু সাজবার চেষ্টা করতো। কোতোয়ালী বলেছে, বিরাট একটা গ্যাং শীগ্‌গিরই ধরা পড়বে। আখবারেও সেইরকম কথা লিখেছে। মহাদেবের অশেষ করুণা, আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি।

॥ ৪ ॥

এরপর আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রা। জাহাজ থামবে একেবারে সিঙ্গাপুরে গিয়ে। বহিনজী যে খবর পেয়েছিলেন, সেটাই ঠিক। পরদিন বিকেলেই জাহাজ তীর ছাড়লো। ক্যাপ্টেন বললেন,—সুভা-তে আরও একটা দিন থেকে আর কিছু মাল

নেওয়া যেতো, কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি 'কোরাল সী' পার হতে হবে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, শীগ্গিরই ওখানকার সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধরবে। শুরু হবে ঝড়-তুফানের কাল।

সমুদ্রে 'তুফান' বা ওখানকার ভাষায় 'তাইফুন'-এর আতঙ্ক কার না আছে? খবরটা শুনে সবারই মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। কেউ আর অকারণে হাসছে না হো-হো করে। কেউ আর মনের আনন্দে শিস্ দিয়ে সুর তুলছে না। দোসী তার রেডিও-রুমে, আমি অবকাশ হলে একবার তার কাছে, আর একবার মাসুদের কাছে চার্টরুমে।

দেখতে দেখতে আমরা উত্তর ফিজি বেসিন ছাড়িয়ে এলাম। এবার বাঁ-দিক ঘুরে চলতে লাগলো জাহাজ। দিন দুই চলার পর দোলা শুরু হলো। নাগর দোলায় বসে ওঠা আর নামার যে শিহরণ, আমরা তা-ই অনুভব করতে লাগলাম সারাক্ষণ। মনে পড়ে একটি মুহূর্তের কথা, আমি তখন বসেছিলাম মাসুদের কাছে। ম্যাপের সামনে ব্রীজে সেকেণ্ড অফিসার আর ক্যাপ্টেন স্বয়ং। স্টারবোর্ডসাইডে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে একমনে কী যেন দেখছিলেন তিনি। হঠাৎ একসময় নাবিক-সুলভ উল্লাসে কলরব করে উঠলেন,—হেই হো! —ল্যাণ্ড অ্যাহয়!

আমরা ছুটে কাছে গেলাম। দূরে আবছা একটা পাহাড় দেখা যায়,—যেন বিরাট একটা ঢেউ উঠে হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে! সেইদিকে একটুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থেকে তারপরে ক্যাপ্টেন বললেন,—বোধহয় ভ্যানিকোরো দ্বীপ।

তাড়াতাড়ি চার্টরুমে গিয়ে ম্যাপ-ট্যাপ দেখে এসে মাসুদ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—হ্যাঁ স্যার।

ওঁর মুখে তখন একটা অদ্ভুত তৃপ্তির আভা ফুটে উঠেছিল। বললেন,—যুদ্ধের সময় এসব জায়গায় ঘুরেছি। এরপর 'সলোমন সী'-তে পড়বো। তারপরে ডানদিকে আসছে রেনেল দ্বীপ। এই রেনেলের উত্তরেই রয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত 'গুয়াদাল ক্যানাল দ্বীপ', যেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল জাপানীদের সঙ্গে। সেকেণ্ড অফিসার জিজ্ঞাসা করলো,—স্যার, আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই!—ক্যাপ্টেন বললেন,—যেমন বৃষ্টি, তেমন জঙ্গল, তেমন মশা। জানো? ম্যালেরিয়া রুখবার জন্য তখন রীতিমতো একটা 'অ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়া ইউনিট'ই গড়ে তোলা হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন আর কিছু বলেন নি, হয়ত স্মৃতির অতলে অবগাহন করছিলেন। এইবার বুঝতে পারছি, এদিককার সমুদ্রের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই হয়ত তাঁর এই চাটার্ড-জাহাজটিকে এতদূরে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু সিঙ্গাপুরে পেঁছবার আগেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। সলোমন সাগরের পর টাগুলা-দ্বীপ ডাইনে রেখে আমরা যখন কোরাল সী বা প্রবাল সমুদ্রে এলাম, সমুদ্র তখন মোটামুটি শান্তই ছিল, কিন্তু নিউগিনির দিকে মোড়

ঘুরে খানিকটা ভিতরে যেতেই পড়লাম প্রবল তুফানের মুখে। সে প্রলয়ঙ্করী তুফান বা 'তাইফুন'-এর বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, আমাদের জাহাজের কলকব্জা কিছু বিকল হয়েছিল, তাই রেডিওর মাধ্যমে কাছের বন্দরে খবর পাঠিয়ে আমরা কোনমতে সেই বন্দরেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পোর্ট মোরস্‌বি। বন্দর শুধু নয়, পাপুয়ার রাজধানী।

সমগ্রভাবে নিউ গিনি দ্বীপটি বেশ বড়ো, তার দক্ষিণ পূর্ব অংশের নাম পাপুয়া। ম্যাপে দেখা যায়, এই পাপুয়ার একটি তীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভূখণ্ডের প্রান্ত প্রায় ছুঁয়ে আছে; মাঝখানে রয়েছে 'টরেস' প্রণালী। অস্ট্রেলিয়ার সুবিস্তৃত 'প্রবাল বাঁধ' (গ্রেট বোরিয়ার রীফ)-এর উত্তরে বিন্দু ঘেঁষে পাপুয়া উপসাগরে ঢুকে 'গ্রেট নর্থ-ইস্ট-প্যাসেজ' দিয়ে টরেস প্রণালী পার হয়ে আরাফুরা সাগর কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে নানান দ্বীপের পাশ কাটিয়ে ফ্লোরেস আর জাভা সমুদ্রে প'ড়ে আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়ে পেঁছিবো কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। 'হাল ভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা নিয়ে সমাগত পাইলট সাহেবের নির্দেশ মতো জাহাজ চালিয়ে আমরা পাপুয়া বন্দরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আকাশ থেকে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

এ বন্দরে আমাদের নিয়মমাফিক কোনো এজেন্ট ছিল না বলে রেডিও মারফৎ হারবার-মাস্টারকে একজন এজেন্ট ঠিক করে দেবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। জানা গেল ফিজিতে যে কোম্পানী আমাদের এজেন্ট ছিল, তাদেরই একটি শাখা-অফিস এখানে রয়েছে। আমাদের জাহাজের নাম দেখে তারা নিজেরাই হারবার-মাস্টারকে জানিয়ে রেখেছিল। সেজন্য জাহাজ ভিড়তেই পুলিশ ও কাস্টমস-এর সঙ্গে আমাদের এজেন্টও এসে উপস্থিত হলেন। অর্থাৎ এজেন্ট-অফিসের স্থানীয় ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং মিঃ কলিন্স, খাস অস্ট্রেলিয়ার লোক। একগাদা কাগজ-পত্র সই-টই করে ক্যাপ্টেন ওঁর সঙ্গে আমাকে ওঁর অফিসে পাঠালেন। স্থানীয় টাকা-পয়সা নিতে হবে, নইলে নাবিকরা তীরে নেমে খরচা করবে কী করে? দ্বিতীয়তঃ জাহাজের মেরামতির জন্য ঠিকাদারও ঠিক করে দেবেন মিঃ কলিন্স। কথায় কথায় বোঝা গেল, যুদ্ধের সময় পাপুয়ার অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা তিনি চোখে দেখেন নি। এখন যেটা ওঁর লক্ষ্যে পড়েছে, সেটা হচ্ছে এক রাজনৈতিক ঢেউ। সমগ্র নিউ গিনি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এখন যাকে পাপুয়া বলা হচ্ছে, তা ছিল ব্রিটিশদের হাতে। উত্তরাংশ ছিল জার্মানদের অধিকারে, আর পশ্চিম ভূভাগ ডাচ্‌দের। এখন পাপুয়ার ভার সরাসরি নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর জার্মানদের অংশ, যাকে বলা হচ্ছে 'ইউ-এন-ট্রাস্ট টেরিটরি' তারও ভার গ্রহণ করেছে অস্ট্রেলিয়া; সেজন্য এদিকে ততটা উত্তাপ নেই। কিন্তু পশ্চিম অংশ, যাকে 'ডাচ্‌ ইস্ট ইণ্ডিজ' বা ইন্দোনেশিয়ার নেতারা বলেন 'পশ্চিম ইরিয়ান', তাকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে বলে প্রবল আন্দোলন চলছে। ১৯৪৫ সালে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চলে যাবার পর ইন্দোনেশিয়া নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেও ডাচ্‌রা সহজে তাদের

অধিকার ছাড়েনি। (বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্য ভিন্ন। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া সার্বভৌমত্ব অর্জন করে, আর পরের বছরে কবে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আলোচ্য নিউগিনির পশ্চিমাংশ বা পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ারই আওতায় এসেছিল। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন আন্দোলন ছিল অব্যাহত। ঐ অংশের রাজধানী বা প্রধান বন্দরের নাম তখনো 'কোটাবারু' হয়নি, তখনো নাম ছিল 'হল্যাণ্ডিয়া।')

বৃষ্টি তখনো পড়ছিল। গায়ের বর্ষাতিটা বাইরের হুকে ঝুলিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকেছি, দেখি অন্য এক আগন্তুক আগে থেকে এসে মিঃ কলিন্সের অফিস ঘরে বসে আছেন। পথে আসতে ঘোর কালো যেসব পথচারীদের দেখে এলাম, ইনি কিন্তু সে রকম নন। লম্বা চেহারা, পঞ্চাশের ওপর বয়স বলে মনে হয়, গায়ের রঙ ফর্সাই ছিল, এখন রোদে পুড়ে বিলক্ষণ তামাটে হয়ে গেছে। পরণে নীল ট্রাউজার, গায়ে সাদা গেঞ্জি। তাঁকে দেখে কলিন্স বলে উঠলো, হ্যালো ডক্টর কতক্ষণ?

—জাস্ট অ্যারাইভড্।

—বোসো। ওঁর সঙ্গে একটু জরুরী কাজ সেরে নি।

আমরা বসে কাজ আরম্ভ করলাম। প্রথমটায় উক্ত 'ডক্টর' ব্যক্তিটি আমাকে তেমন লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু জাহাজ নিয়ে কথা হতেই আমার প্রতি মনোযোগী হলেন। সাধারণত একধরণের আলাপে কোন জাহাজ, কোথা থেকে আসছো, যাবে কোথায়—এরপরেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম কী প্রশ্নটা অনিবার্যরূপে এসে যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। আমি নাম বলতেই ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন। তারপরে চেহারার বর্ণনা শুনে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না। বললেন,—ভয়ানক চেনা লোক! আজ সময় হবে না, কাল সকালেই গিয়ে হাজির হবো। তুমি বলবে যে ডক্টর হ্যারিকেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বিচিত্র নাম। জাহাজে গিয়ে নামটা বলতেই ক্যাপ্টেন চমকে উঠলেন। বললেন,—হ্যারিকেন? এখানে প'চে মরছে নাকি! যুদ্ধের সময় ও তো সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ছিল। গুয়াদালক্যানেল, মালাইটা, ইসাবেল,—কোথায় না দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে? ওরকম অদ্ভুত মাথা খারাপ লোক পৃথিবীতে যদি দুটি থেকে থাকে!

ক্যাপ্টেন মানুষ, ওঁর কাছে খুব বেশি কৌতুহল প্রকাশ করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। উনি নিজে থেকেই বললেন,—ডাক্তার মানুষ, যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল কোরে ছিলেন। নাম হ্যারিয়েট, কিন্তু এ দ্বীপ থেকে সে দ্বীপে অনবরত ছোটাছুটি করেন দেখে সৈন্যরা নাম দিয়েছিল, হ্যারিকেন। সেই নামটাই বহাল আছে দেখছি।

আর কোনো কথা হয়নি। সারাদিন কাজের পালা চললো। মেরামতির কাজে বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পর্যন্ত নিজে হাত লাগালেন। বৃষ্টি ধ'রে

গিয়েছিল, কিন্তু এমন একটা গুমোট ভাব যে বেশ কষ্ট হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়তে লাগলো। জাহাজের সবাই এখানকার কালো-কালো লোকগুলোর মতো গায়ের জামা খুলে ফেললো। সন্ধ্যায় আবার ফুরফুরে হাওয়া। সমুদ্র থেকে শহরটিকে ঠিক দেখা যায়নি বা বোঝা যায় নি। মনে হচ্ছিল, অদূর দিগন্তে বিরাট বিরাট খাড়াই পাহাড় যেন অতিকায় প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরে জাহাজ জনপদের কাছাকাছি হলে বনজঙ্গল আর লম্বা লম্বা নারকেল-গাছের জটলা চোখে পড়ে। আরও কাছে যাবার পর শহরটাকে একটু-একটু দেখা যায়। মনে হয় অরণ্য যেন শহরটাকে দু-হাত দিয়ে লুকিয়ে রাখে, কাছে গেলে আস্তে আস্তে অতি আদরের জিনিসটাকে বার করে দেখায়।

পরদিন সকালে আকাশ দেখে সবাই অবাক। যেন সমুদ্রটাকেই উলটে দেওয়া হয়েছে। সাদা সাদা হালকা মেঘ এদিক-ওদিক দ্বীপের মতো ছড়িয়ে থাকলেও সারা আকাশটা একেবারে সমুদ্রের মতো নীল। সেকেণ্ড অফিসারের ভাষায়, বোতল বোতল নীল কালি যেন আকাশ জুড়ে ঢেলে দিয়েছে!

কিন্তু এ শোভা বেশিক্ষণ নিরীক্ষণ করা গেল না, ক্যাপ্টেনের ঘরে ডাক পড়লো। এখুনি কিছু টাইপ করে দিতে হবে। সে-সব সেরে আন্দাজ নটা নাগাদ আবার ডেকের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছি, দেখি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন ডক্টর হ্যারিকেন। ঠিক সেদিনের পোষাকে, হাতে শুধু একটা চাবির রিং। উনি মুখ তুলতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। হেসে বললেন,—হ্যালো ইণ্ডিয়ান?

সম্ভাষণের পালা শেষ করে বললাম,—আমি যে ইণ্ডিয়ান, সে খবর নেওয়া হয়ে গেছে ত?

বললেন,—নিশ্চয়। আসল কথা, কলিন্স খুব প্রশংসা করছিল তোমার। আমার মক্কেল কোথায়? গিলবার্ট?

এরপরে ক্যাপ্টেনের ঘরে উল্লাসের জোয়ার বইতে লাগলো। আমাকে কী ভেবে বসতে বললেন ক্যাপ্টেন। ডক্টর ওঁকে বললেন,—আমি তোমাকে নিতে এসেছি হে! আজ লাঞ্চ আমার ওখানে। এই ইণ্ডিয়ানটিকেও সঙ্গে নাও, শিকার আছে।

ক্যাপ্টেন আপত্তি করলেন না। বললেন,—সে সব ঠিক আছে, কিন্তু তুমি সলোমান দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে এখানে কেন?

ডক্টর উত্তর দিলেন, শেষ পর্যন্ত এখানেই ডেরা বেঁধেছি। যদিও রুজি-রোজগারের জন্য আমি এখানকার এক রবার-বাগানের ডাক্তার, কিন্তু অন্য কাজও প্রচুর করতে হয়। ভেবেছিলাম ভোরে আসবো, কিন্তু বাড়িতেও রোগীর ভিড় লেগে থাকে, সেরে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল!

ওঁদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলছে, আমি কী কারণে যেন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ কেবিনের গোল জানালার বাইরে চোখ যেতে দারুণ চমকে উঠলাম। ঐ

নীল বোতল ঢালা আকাশে জ্বলছে একটি তারা, তার ঝলমলে স্নিগ্ধ আলো রাতের মতো না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। তারাটি একটু বড়োও বটে।

—কী দেখছো হে, অমন করে?

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—স্যর, এমন সময় আকাশে তারা! তাহিতির কাছেও দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তখন বেলা প্রায় চারটে। তাই বলে এখনই, এই বেলা দশটায়!

ওঁরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তারাটিকে দেখলেন। ক্যাপ্টেন বললেন,—ভেনাস।

ডক্টর বললেন,—আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, সলোমন গ্রুপের ইসাবেল দ্বীপটির কথা। তার আকাশে ঐ ভেনাসকে দেখে, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের জাহাজের ক্যাপ্টেন দ্বীপের উপসাগরটির নাম দিয়েছিল 'নক্ষত্রের উপসাগর'।

ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন,—অবাক হয়ো না, এখানকার আকাশ পরিষ্কার থাকলে দিনের বেলা প্রায়ই ঐ ভেনাসকে দেখা যায়।

যাইহোক, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাকে বেরুতে দেখে আমার বন্ধুরা রীতিমত অবাক হলো। ক্যাপ্টেন জাহাজ ছেড়ে খুব কমই বেরোয়, আর বেরুলে সচরাচর কাউকে সঙ্গে নেয় না। তাহলে আজ এই অঘটন ঘটলো কেমন করে? তাদের অবাক হবারই কথা।

ডক্টরের সঙ্গে ছিল জীপ। সেই জীপে করে শহর ছাড়িয়ে গাছপালা-ঘেরা গ্রামট্রাম ছাড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখলাম, বেশ কয়েকটি নারিকেল গাছের মাথা একেবারে নেড়া, যেন বাজ প'ড়ে সব পুড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন বললেন,—বাজ নয়, বোমা। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে কতো গাছপালা যে পুড়েছে, কতো বাড়িঘর যে ভেঙেছে, তার ইয়ত্তা আছে? এখানে আমি আগে আসি নি বটে, কিন্তু সৈন্যদের কাছ থেকে অনেক কাহিনী শুনেছি। জাপানীরা পাপুয়া দখল করতে চেয়েছিল। এই যে পাহাড়ের শ্রেণী যার নাম 'ওয়েন স্ট্যানলি রেঞ্জ',-এর ওপারে সমুদ্রের ধারের 'বুনা' বলে জায়গায় সৈন্য নামিয়েছিল।

ডক্টর বললেন,—আরও একটু আছে। পাহাড় পেরিয়ে ওদিককার গ্রাম-গুলিতেও ঢুকে পড়েছিল। পোর্ট মোরস্‌বি তখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর। এটা দখল করতে পারলে অস্ট্রেলিয়া আক্রমণের খুব সুবিধা পাওয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে আরও পূর্বদিকে মিত্রশক্তির যে সব 'বেস্' তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থাই বানচাল করে দেওয়া যায়। তাই এই পাপুয়ায় ওরা মরণ-কামড় দিয়েছিল আর সেই সঙ্গে মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়ানরা প্রাণপণ শক্তিতে তাদের উৎখাত করবার চেষ্টা করেছিল। না পারলে তাদের নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করাই যে কঠিন হতো!

ক্যাপ্টেন বললেন,—ওঃ! সে সব কী দিনই না গেছে! ১৯৪২ সালের এপ্রিলের শেষের দিক। জাপানীরা তখন একের পর এক এদিককার রাজ্য জয়

করে চলেছে। হংকং—মালয় ছাড়িয়ে বার্মা পর্যন্ত তাদের হাতের মুঠোয়। এবার তারা সলোমনের 'তুলাগি' আর পাপুয়ার এই 'মোরস্‌বি' ছিনিয়ে নেবার আয়োজন করলো। এদের আক্রমণ ঠেকাতে এই দ্বীপের পাহাড়ে-জঙ্গলে কী ভীষণ যে লড়াই হয়েছিল, তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডক্টরও তখন যেন সেইসব দিনের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। বললেন,—প্রবাল সমুদ্রে আমাদের বিরাট বিমানবাহী জাহাজ 'লেক্সিংটন'-ডুবির কথা কখনো ভুলবো না।

ক্যাপ্টেন বললেন,—এখানকার যুদ্ধের ক্ষত দেখছি এখনো শুকোয় নি। শহরের কিছু বড়ো বড়ো ভেঙে-পড়া বাড়ি এখনো সারানো হয়নি দেখলাম, আর এখানে দেখছি লম্বা লম্বা নারকেল গাছগুলোর শোচনীয় অবস্থা!

ঠিক এই সময় জীপটা একটা বাঁক নিয়ে এক ঢালু পথ ধরে সোজা এগিয়ে চললো। সামনে বেশ উঁচু করে কাঁটা তারের শক্ত বেড়া দেওয়া, বেড়ার মাঝে মাঝে কংক্রীটের স্তম্ভ। ভিতরে লাল টালি ছাওয়া অনেক কুটিরের সমাবেশ। দূর থেকে দেখলে মিলিটারীদের সযত্নরক্ষিত ক্যাম্প বলে মনে হয়, কিন্তু কাছে গিয়ে অবাক হলাম, গেটের কাছে একটি সুদৃশ্য বোর্ডে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'KIRON COLONY'.

'কিরণ' নামটা স্বভাবতই আমাকে চমকে দিয়েছিল। এ যে একেবারে আমাদের 'দেশীয়' নাম।

কয়েকটি কুটির ছাড়িয়ে একটি সুদৃশ্য কুটিরের সামনে গিয়ে আমাদের জীপ দাঁড়ালো। জীপ থেকে নেমে দেখলাম, কুটিরের সংখ্যা কম নয়, সারি দিয়ে ভিতরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে কুটিরগুলো। আমরা যে কুটিরের পাশে গিয়ে নামলাম, তার পিছনে বিরাট এক হলঘর,—মাথাটা কুটিরের মতো লাল টালি-ছাওয়া যদিও। বড়ো বড়ো জানালা, কাঁচের পাল্লা বসানো। ইতস্ততঃ দু-চারজন নার্স ঘোরাফেরা করছে। একটা বোর্ডে লাল অক্ষরে 'Hospital' লেখা। বুঝলাম, ওটা হাসপাতাল। আমরা যে কুটিরে প্রবেশ করলাম, সেটি বেশ প্রশস্ত। একদিকে টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি,—ঝকঝকে-তকতকে রীতিমত গোছানো ও ঝাড়পোছ করা। অন্যদিকে আয়না-বসানো ওয়ার্ড-রোব, একটা দেওয়াল-আলমারীতে বইপত্র শোভা পাচ্ছে কাঁচের পাল্লার আড়ালে। আর অন্যদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি খাট, তাতে বিছানা পাতা; পরিস্কার, টান-টান করে একটা রঙীন নক্‌সা-কাটা বেড-কভার দিয়ে ঢাকা।

বোঝা যায়, এটা চেম্বার ও বেডরুম একসঙ্গে। পাশে আরও একটি ঘরের আভাস পাওয়া যায়। দরজা খোলা থাকায়, সেখানকার ব্যবস্থা দেখে বুঝলাম, ওটা ডাইনিং স্পেস্‌,—তার পাশে বোধহয় আরও একটি ঘর আছে, সেখান থেকে উর্দি-পরা একজন বেয়ারা বেরিয়ে এলো, দোহারা চেহারা, বেঁটে ধরণের, গায়ের রঙ কালো। ডাক্তার তাকে কি ইঙ্গিত করতে সে মাথা নিচু করে সম্মান

জানিয়ে আবার ভিতরে চলে গেল, নিয়ে এলো ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম। অর্থাৎ ডাইনিং স্পেসের পাশে ওটা রান্নাঘর।

চা সহযোগে শুরু হলো আমাদের কথাবার্তা। ক্যাপ্টেনই প্রশ্ন করতে লাগলেন বেশি। বললেন,—এটা তোমার চেম্বার? এখানে বসে রোগী দেখো?

ডক্টর বললেন,—নোপ্! আমার চেম্বার পিছনের হাসপাতালের লাগোয়া। ক্যাপ্টেন, তোমাকে আর তোমার এই ইণ্ডিয়ান বন্ধুটিকে নিয়ে এই কটেজে এসে বসবার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। এই কটেজে এখন কেউ বাস করে না, কিন্তু প্রতিদিন এই ঘরটি ধুয়ে-মুছে সাফ করে রাখা হয়। আজ আমরা এখানে বসেই লাঞ্চ খাবো। আমি সিস্টার ডরেজের কাছে খবর পাঠিয়েছি, তিনিই এই কলোনীর কর্ত্রী, রাউণ্ড সেরে এখুনি এসে পড়বেন। তাঁর কাছ থেকেই সব শুনো। আমি তাঁরই আহ্বানে এই কলোনীর সঙ্গে ডাক্তার হিসাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ক্যাপ্টেন, দু-চারজন দেশী বেয়ারা বা কুক হয়ত দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু এই কলোনীর বাসিন্দা সবাই নারী। চল্লিশটি কটেজ নিয়ে এই কলোনী, তাহলে কতো এর বাসিন্দা, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারো। এদের জন্য স্কুল আছে, কাজকর্ম করবার নানারকম ব্যবস্থা আছে। কলোনী পেরিয়ে আছে বিশাল বাগান, তাতে সব্জী হয়, গম হয়। আর ভিতরে আছে তাঁতশালা, জামা-কাপড় তৈরি করার জন্য সারি সারি সেলাই-মেশিন বসানো কারখানা। সবই পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাবো। এখানে মেয়েরা সবাই কাজকর্ম করে। শহরের কো-অপারেটিভ-ফার্মগুলো এদের কাছ থেকে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে যায়। এককথায় মোটামুটি এদের নিজেদের আয়েই কলোনীর কাজ চলে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন বললেন,—বোঝা যাচ্ছে, এটা মেয়েদের আশ্রম বিশেষ। স্থানীয় মেয়েদের নিয়েই বোধহয় তৈরি। এবং মেয়েরা বোধহয় অনাথ?

ডক্টর বললেন, 'অনাথ'ত বটেই, কিন্তু ঐ একটা কথায় সবকিছু বোঝা যাবে না। ক্যাপ্টেন, এখানে নানান দেশের—সাদা কালো—সবরকম মেয়ে এসেই ভিড় করেছে। আসলে এরা কারা, জানো? আশে-পাশের নানান দ্বীপের বাসিন্দা। এখানকার বাসিন্দা ত আছেই। এককথায় এরা সব 'ওয়ারভিক্‌টিম্‌স্!' যুদ্ধের পাশবিকতার এরা নির্মম বলি। যদি মন্তব্য করি, এখানকার সব মেয়েই কুৎসিত রোগগ্রস্ত ছিল, তাহলে কি তোমরা চমকে যাবে? ভাই হে, ঘুরে ঘুরে এখানকার মেয়েদের দেখে যে স্মৃতি নিয়ে যাবে, তা সবাইকে বলে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করো, যতটুকু পারো। বলছি না, এতেই বিশাল যুদ্ধ-চক্রান্ত একদিন তোমরা বানচাল করতে পারবে, কিন্তু তবু, যতটা সম্ভব। জনমত সৃষ্টি করতে দোষ কী? এই কলোনীর একটা নাম দেওয়া হয়েছে; কিন্তু শহরে যাও, সেখানে এ-নাম করলে কেউ চিনতে পারবে না। সবাই বলে 'ভি-ডি কলোনী'। এ থেকেই এ কলোনী সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

আমরা অবাক হয়ে ডক্টরের কথা শুনছিলাম। এমন সময় পূর্বকথিত সিস্টার ডরেজ এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে নার্সের পোষাক পরা একটি তরুণী ঘোর কালো মেয়ে ছিল। হাতে একটা ব্যাগ। সেটা ঘরের একপাশে নামিয়ে রেখে সে চলে গেল। সিস্টার এসে আমাদের পাশে বসলেন। বছর চল্লিশের মতো বয়স, দীর্ঘ চেহারা, টকটকে গায়ের রঙ। সন্ন্যাসিনীর শুভ্র পোষাকে আগাগোড়া আচ্ছাদিত।

প্রাথমিক সম্ভাষণের পর যখন আমার পরিচয় ও঻কে দেওয়া হলো, উনি একটু চমকেই আমার দিকে তাকালেন। তারপরে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন,—যুদ্ধের সময় ভারতেও কয়েকটা মাস আমাকে কাটাতে হয়েছে, তারপরে চলে আসি অস্ট্রেলিয়া। আর তারপরে এখানে। ডক্টরের মতো আমিও আমার নিজের দেশের কথা ভুলে গেছি, কিন্তু আমাদের কথা থাক। যদি মনে কিছু না করেন, আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনি ভারতের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ?

বললাম,—পূব অঞ্চলের। বেঙ্গল।

—বেঙ্গল !—উনি সবিস্ময়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। ডক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আই অ্যাম এক্স্ট্রিম্লি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ ডক্টর, হি ইজ দি রাইট্ পার্সন !

—আই নো !—ডক্টর ঠোঁটের প্রান্তে হাসি টেনে এনে বললেন,—আমি সে-কথা আগেই জেনে নিয়েছিলাম। না হলে জাহাজে আরও ইণ্ডিয়ান ছিল, তাদের কাউকে আনতে পারতাম ! নাও, এখন বলো ওকে সব। তোমার মুখ থেকেই ও সব শুনুক।

ভদ্রমহিলা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে বিশেষ উত্তেজিত, এ বিষয়ে ভুল নেই। বললেন,—যুদ্ধ-বিরতির পর এইখানে এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁকে ডক্টর দেখেন নি, কিন্তু আমার কাছ থেকে সব শুনেছেন। আমিও কি সব জানি ? তাঁর একটি ডায়রী আমরা পেয়েছি। কিন্তু তার ভাষা আমরা কেউ পড়তে পারছি না। আপনি একটু সাহায্য করবেন ? তাহলে খুব উপকার হয় আমাদের। মনে হয়, এ আপনাদেরই অঞ্চলের ভাষা।

বলে, তিনি উঠে, দেওয়াল-আলমারীর বন্ধ পাল্লাটা তালাচাবি দিয়ে খুলে কালো মলাটের একটা ছোট এবং পুরাতন ডায়রী নিয়ে এলেন। আমার হাতে ওটি সমর্পণ করে বললেন,—দেখুন তো, আমার অনুমান সত্যি কিনা ?

আমি ডায়রীটা খুললাম। ডায়রী বলতে যে চেহারা আমরা বুঝি প্রতি পৃষ্ঠায় সাল তারিখ ছাপানো,—এটি সে রকমের নয়। ডায়েরী আকারের একটি বাঁধানো খাতা বলা যেতে পারে।

প্রথম পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নেই, লেখা আরম্ভ হয়েছে পরের পৃষ্ঠা থেকে।

এবং ভাষা সম্পর্কে ওঁদের অনুমান নির্ভুল। খুব সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে যে ভাষায় দিনপঞ্জী লেখা, তা বাংলা।

বললাম,—হ্যাঁ আপনার অনুমান ঠিক।

ডরেজ বললেন,—তাহলে অনুগ্রহ ক'রে এটা আপনি নিয়ে যান, কাল সকালে এসে দয়া করে দিয়ে যাবেন, কালও আজকের প্রোগ্রাম ফলো করা হবে, অর্থাৎ তিন জনেই একত্রে এখানে লাঞ্চ খাবেন, আশা করি আপত্তি নেই ?

না। আমাদের তিনজনের কারুরই আপত্তি ছিল না। সেদিন আমি ডায়রীটা জাহাজে নিয়ে এসে কেবিনের দরজা বন্ধ করে পড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোকের নাম কোথাও লেখা নেই, অনুমান করছি, তাঁর নাম,—'কিরণ।'—কিন্তু পদবী কী ? পড়লে হয়ত বুঝতে পারবো।

ভদ্রলোক নিয়ম করে ডায়রী লেখেন নি, মাঝে মাঝে লিখেছেন, যখন যে রকম খুশি। লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধে মেডিক্যাল কোরে নাম লিখিয়েছিলাম। সেই কাজেই একদিন এখানে আসতে হয়েছিল। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কার্যকলাপ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব,—এসব কিছুই আমি দেখতে পাইনি, তার অনেক আগেই আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় আসতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে 'তুলাগি'- এবং সেখান থেকে পোর্ট মোর্সবি। যুদ্ধের বিভীষিকা।

যেদিন 'যুদ্ধ-শান্তি' ঘোষিত হলো, সেদিন এই মোর্সবি বন্দরেও উৎসব হয়েছিল, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি। আমি তখন পাহাড়ের জঙ্গল-প্রান্তে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে। পোর্ট মোর্সবির পর্বতশ্রেণী ও বিশাল অরণ্যের বিপরীত দিকে সমুদ্রের আর এক অংশের তীরভূমি সংলগ্ন শহর 'বুনা'তে হয়েছিল তুমুল যুদ্ধ, আমাকেও থাকতে হয়েছিল সেখানে। সৈন্যরা বলতো, গুয়াদালক্যানালের যুদ্ধের থেকে এই 'বুনা'র যুদ্ধ কম বীভৎস ছিল না। কিন্তু যুদ্ধে আহত হইনি, আহত হয়েছিলাম নিদারুণ 'টাইফাস'- রোগে। এই রোগ ও-অঞ্চলে এক সময় মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। উপযুক্ত ওষুধ এসে পেঁছিতে পারছে না, সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। অসহায় রোগীদের কাতর আর্তনাদ শুনতে শুনতে সে সময় আমার বা আমার সহকর্মী- দের মনের অবস্থা যে কী রকম হয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কবে যে ওষুধ যুদ্ধের আগুন পার হয়ে আমাদের হাতে এসে পেঁছিবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। ডাক্তার হিসাবে তখন যেন অসহায় উম্মাদের মতো নিজেরই হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করতো। যাইহোক, শেষে রোগ এসে ধরলো আমাকেই, যখন আমি একটা ট্রানজিট্ ক্যাম্প থেকে রিট্রিট করে বা পিছু হটে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

পরে শুনেছি, একটা অকেজো জীপের ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আমি উবু হয়ে পড়েছিলাম শিথিল দেহে, একেবারে অচৈতন্য ; আশেপাশে আমার কোনো

সহকারী বা সৈন্যসামন্ত কেউ ছিল না, অদূরে থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছিল মেসিন গানের শব্দ।

আমার যখন চৈতন্য হলো, তখন আমি জঙ্গলের মধ্যে কোনো এক কুঁড়েঘরে একটি খাটিয়ার ওপরে অতি সাধারণ বিছানায় শুয়ে আছি। আবছা বুঝতে পারছিলাম, ঘরের মধ্যে একজন নার্স ঘোরাফেরা করছে। আমি কি কোনো অস্থায়ী হাসপাতাল-ক্যাম্পের কোনো কুঁড়েঘরে শুয়ে আছি ?

পরে, যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো, মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তখন ওর পোষাক দেখে বুঝলাম, নার্স নয়। সাধারণ একটা ছিটের খাটো গাউন পরা, মাথার চুল নিউগিনির বুনোদের মতো শক্ত শক্ত কোঁকড়া নয়। গায়ের রঙও তাদের মতো ঘোর কালো নয়, বলা যায় বাদামী। একটু লম্বাটে ধরণের চেহারা। পরে পরিচয় হতে জানিয়েছিল, সে পলিনেশিয়ান।

আসলে জীপে আমাকে ঐভাবে প'ড়ে থাকতে দেখে মেয়েটিই আমাকে কোনক্রমে টেনে নিয়ে আসে তার কুঁড়েঘরে। তারপরে তার অক্লান্ত সেবা-পদ্ধতির সাহায্যে পোর্ট মোর্সবির বড়ো হাসপাতাল থেকে ডাক্তারের উপদেশ মতো কিছু ওষুধ নিয়ে আসে।

সে ওষুধের শিশি আমি পরে দেখেছিলাম, নিচে একটুখানি তলানি পড়ে আছে। দেখেই বুঝলাম, সাধারণ ফিভার মিকচার, যা তখনকার দিনে সাধারণ সৈনিকদের দেওয়া হতো। ওতো টাইফাসের যথাযথ ওষুধ নয়! তাছাড়া সমগ্র দ্বীপে তখন টাইফাসের ওষুধ ছিল দুষ্প্রাপ্য। সে ওষুধ পাওয়াই বা যাবে কী করে? এবং তা-ই যদি হয়, তাহলে আমি বেঁচে উঠলাম কী ভাবে?

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে। সে বললে,—আমি আমাদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতাম।

—কেন!

—বাঃ! তোমাকে সারিয়ে তুলতে হবে না!

—কেন! হঠাৎ আমাকে সারিয়েই বা তুলতে গেলে কেন?

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকালো। আমি নাম দিয়েছিলাম পলি। পলি বললে,—অবাক কাণ্ড! জীপে তোমাকে ঐভাবে দেখতে পেয়ে তোমাকে ফেলে আসবো!

বললাম,—আমাকে কি চিনতে? দেখেছিলে আগে?

তিনি বললেন,—বোধহয় না। কী করে দেখবো?

—তবে?

প্রশ্ন শুনে সে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো। বললে,—সত্যি বলবো? তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, বোধ হয় আমারই কোনো ভিজিটর। কতো অগুনতি লোক এসেছে! সবাইয়ের মুখ মনে রাখতে পেরেছি নাকি? এই পোষাকে সবাইকেই দেখতে একরকম।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—তুমি কি তাহলে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—হ্যাঁ, যা ভাবছো, আমি তাই।

এরপরে ডায়রীতে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দিনের পর দিন দুটি মন কেমন করে পরস্পরের কাছে আসতে লাগলো, তার বর্ণনা দিতে লিপিকার কোনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু একটা জায়গায় পলি ছিল অনড়,—পাথরের মতো ; ধরা ছোঁয়া দিতো না। একদিন কেঁদে বলেছিল, আমাকে কাছে টেনোনা, আমার খারাপ রোগ।

কিরণ বলেছিলেন, আমি ডাক্তার, তোমাকে সারিয়ে তুলবো।

কিন্তু সে-সব বিস্তারের মধ্যে না গিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পলি সেদিন কাছেরই কোনো এক জায়গা থেকে ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসছিল, জীপের মধ্যে ওকে ঐভাবে দেখতে পেয়ে সঙ্গের বান্ধবীর সাহায্যে ওকে তুলে নিয়ে আসে। ও যে মিত্রপক্ষের সৈনিক, এটা পোষাক আর চিহ্ন দেখে বুঝেছিল, কিন্তু সে যে ডাক্তার, তার সংক্ষিপ্ত চিহ্ন দেখে বুঝবার মতো অভিজ্ঞতা পলির ছিল না।

যাইহোক, এরপরে কিরণ লিখে গেছেন অদ্ভুত কথা ঃ

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, আমার ফিরে যাওয়া উচিত। দেশে মা-বাবা-ভাই-আত্মীয়স্বজন সবাই আমার আসার পথ চেয়ে বসে আছে, তবু আমার যাওয়া হলো না! পলিকে কেন্দ্র করে আমি এক জগৎকে আবিষ্কার করলাম, এরা যুদ্ধের বলি। নানান দ্বীপ থেকে এদের টেনেটুনে নিয়ে এসে এ-দ্বীপ ও-দ্বীপ ঘোরানো হয়েছিল। ফলে, এদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কুৎসিত এক উদগ্র ব্যাধি। এবং সে ব্যাধির প্রতিক্রিয়াও সাংঘাতিক। বিশেষ করে একদিন একটি মেয়েকে যখন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে আত্মহত্যা করতে শুনলাম, সেদিন আর স্থির থাকতে পারিনি। এই দ্বীপে একটি আশ্রম করে ঐসব হতভাগিনীদের নিয়ে এসে কী করে জড়ো করবো, এই হয়ে দাঁড়ালো আমার দিবারাত্রের চিন্তা। শুধু জড়োই করবো না, তাদের চিকিৎসা করে ভালো করবো। কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, তবু আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার। পলি আমাকে দুরন্ত রোগ থেকে বাঁচিয়ে তুলে নতুন জীবন দিয়েছে ; সেই পলির মুখের দিকে তাকিয়ে তার ঋণশোধ করবার জন্যই আমাকে এই কাজ, তা সে যতই দুরূহ হোক, করে যেতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, কাজ নিয়ে দিনের পর দিন আমার কেটে গেছে, দেশে যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। এমনকি মাকে নিয়ম মতো চিঠি পর্যন্ত লেখবার অবসর পেতাম না। একাজে সাহায্য যেমন পেয়েছি, বাধাও পেয়েছি প্রচুর। একদল প্রাক্তন সৈনিক প্রমত্ত হয়ে একবার আশ্রমে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল, আমি রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দেওয়ায় আমাকে প্রচণ্ড প্রহারে শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল, যদিও তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই হতভাগিনীদের দলই একসঙ্গে তেড়ে এসে তাদের হটিয়ে দিয়েছিল। সরকার থেকে আমাকে জমি দেওয়া হয়েছিল, প্রচুর জমি। আর তাছাড়া অর্থও তাদের কাজ থেকে কিছু পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য।

আমি তখন শহরে গিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলাম। ঐ হতভাগিনীরাও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চাঁদা-ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়তো। এমনি করে কী ভাবে যে একদিন এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠলো, তা আমিই ভাবতে পারছি না। আমার সব থেকে বড়ো সান্ত্বনা আশ্রমের একটি রোগিনীও মারা যায় নি, তারা ধীরে ধীরে সেরে উঠে এই আশ্রমেরই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তারা কেউই আশ্রম ছেড়ে তাদের পুরানো জীবিকায় ফিরে যেতে চায়নি, আমার পুরস্কার এইখানে। তার ওপর পেলাম সুদূর বেলজিয়ামের এক সন্ন্যাসিনীকে, তিনি সর্বস্বপণ করে এই আশ্রমের ভার তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তি আমি পাচ্ছি কী? এই হতভাগিনীরা যখন 'ব্রাদার' বলে আমার দিকে তাকায়, তখন বুঝি তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকেই ঐ ডাক বেরিয়ে আসছে! সে ডাক উপেক্ষা করতে পারছি কই? কখনো কখনো সমুদ্রতীরে চলে যাই, যিনি নিজেকে 'সরসামস্মিসাগরঃ' বলে গীতায় উল্লেখ করেছেন, সেই তাঁকেই যেন দেখতে পাই। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে যেন ক্রমাগত কাছে আসছেন, বলছেন, "মাভৈঃ, ভয় নেই। আমি আছি তোমার সঙ্গে।"

এখানে বলা দরকার, খুব সংক্ষেপেই আমি ডায়রীর বৃত্তান্ত লিখে গেলাম। কিরণ কিন্তু পাতার পর পাতা ব্যয় করে গেছেন—তুচ্ছ খুঁটিনাটি বর্ণনাও তিনি বাদ দেননি। কিন্তু কোথাও দেননি তিনি তাঁর নিজের পরিচয়। তাঁর দেশের ঠিকানা, নিজের পুরো নাম বা মা-বাপ-ভাইদের নাম।

কিন্তু তারপর? গেলেন কোথায় তিনি? কী হয়েছিল তাঁর পরিণতি?

উত্তর পেলাম পরদিন সিস্টার ডগেজের কাছ থেকে। তিনি জানালেন, "অস্বাভাবিক পরিশ্রমে তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না। তার ওপর তাঁর মন ছিল অতিরিক্ত সংবেদনশীল। এই হতভাগিনীদের দুঃখকষ্ট লক্ষ্য করে, এবং এদের মধ্যে যারা আশ্রমেই সন্তান প্রসব করেছিল, তাদের বিকলাঙ্গ কিম্বা অন্ধ বাচ্চাগুলোকে দেখে তিনি নাকি সহ্য করতে পারতেন না। স্নায়ুর ওপর এই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবতঃ তার হয়েছিল মৃগীরোগ। ডাক্তার হিসাবে তাঁর শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। তা তিনি নেননি। ঐ রোগেই হঠাৎ তিনি জলে ডুবে মারা যান। বন্দরের সী-বীচে অনেকে স্নান করতে যায়, ডাক্তারও নেমেছিলেন একদিন কীসের খেয়ালে কে জানে,—আর উঠে আসেন নি! সম্ভবতঃ স্নানের সময় হঠাৎ ঐ মৃগীরোগেই তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেনি, জলে ডুব দিলেন আর উঠলেন না।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ডায়রীটি না পড়তে পারায় আমরা সরকারী সাহায্য নিয়েও তাঁর দেশে তাঁর ঠিকানায় কোনো খবর দিতে পারিনি। আশ্রমের মেয়েরা, বিশেষ করে তাঁর 'পলি' তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করে। তাঁর স্মৃতি-চিহ্নকে বহুমূল্য মণির মতোই রক্ষা করতে চায়, কিন্তু সেটুকুই ত সব নয়। তাঁর দেশের লোক—বাড়ির লোক হয়ত এখনো তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে। আপনি তো ডায়রীটা পড়লেন, জানতে পারলেন ওঁর পুরো নাম ঠিকানা?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—না। ও-দুটোর একটা নিয়েও তিনি মাথা ঘামাননি। সারা ডায়রী জুড়ে শুধু ঐ হতভাগিনীদের কথা—আর যুদ্ধ নামক বিভীষিকার কথা বলে গেছেন,—আর যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের খোঁচায় মানুষের মধ্যকার দৈত্যরা বেরিয়ে আসে, দেবতারা পড়ে ঘুমিয়ে। সে অবস্থা একেবারেই কাম্য নয়!

॥ ৫ ॥

আমাদের জাহাজ পোর্ট মোর্স্‌বির পর টেরেস প্রণালী পেরিয়ে বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরতম প্রান্ত থার্সডে দ্বীপে এসে থেমেছিল। ঠিক দ্বীপে নয়, দ্বীপ থেকে একটু দূরে নোঙর ফেলেছিল, তা-ও মাত্র চার ঘণ্টার জন্য। কী কারণে ঠিক মনে নেই, বোধ হয় যান্ত্রিক কোনো গোলযোগ ঘটেছিল। ওদিকে দিনের বেলার আকাশে 'ভেনাস' বা শুক্রগ্রহ জ্বলজ্বল করছে, আর দ্বীপের নাম 'থার্স ডে' বা বৃহস্পতি দ্বীপ! দ্বীপের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু এই নামটা আমার কাছে বড়ো অদ্ভুত লাগছিল। এই জাহাজের চীফ অফিসার বড়ো স্বল্পভাষী মানুষ, যখনই দেখি, হয় কাজে মত্ত, নয়ত নিজের ঘরে ব'সে রেডিও শুনছেন বা হাতের-কাছে-পাওয়া যে কোনো বই বা পত্রিকা পড়ছেন। ঘটনাচক্রে সেদিন 'থার্স-ডে' দ্বীপ দেখবার সময় আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু একটা বলা উচিত মনে করে মন্তব্য করে-ছিলাম,—থার্স ডে! কী অদ্ভুত নাম, তাই না?

চীফ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন,—হ্যাঁ, এরকম নাম আরও আছে। আর একটা দ্বীপের নাম আছে, 'সান ডে দ্বীপ',—সেটা এখান থেকে আমরা ঠিক দেখতে পাবো না। সবই বোধহয় ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ কুকের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত।

আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে চীফ বলে চললেন,—'গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ' থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার অনেক অংশই ক্যাপ্টেন কুক আবিষ্কার করেন। সে হচ্ছে ১৭৭০ সালের কথা। এখান থেকে দক্ষিণে—পূর্ব উপকূল ঘেঁষে ওঁর নামাঙ্কিত একটি শহরই রয়েছে,—'কুকটাউন'।

কথাগুলো ভদ্রলোক বলছিলেন আমাকে, কিন্তু মুখ ছিল দ্বীপের দিকে। রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন, কথাটা শেষ করে সোজা হলেন, ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত, বললেন,—দ্বীপের ঐ ভারী জঙ্গলটা লক্ষ্য করছো?

আমি ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। তটরেখায় ছোটখাটো শহর, যেমন হয় বন্দরের চেহারা, তেমনি। কিন্তু তার পটভূমিকায় বিরাট অরণ্যানী চোখে পড়ে। গাছপালা যেন দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। খুব উঁচু পর্যন্ত সে অরণ্যানী বিস্তৃত। মনে হচ্ছে ওখানে পাহাড় আছে, পাহাড়ের ওপর কিছু বড়ো গাছ—আমাদের অশ্বত্থ গাছের মতো মনে হয় যেন,—দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় জটলা করে।

চীফ বোধহয় গাছপালার ভক্ত। ভালো করে তাকাতে তাকাতে একসময় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন,—আহ! ইট্‌স্‌ নো মাউণ্টেন অ্যাট অল্‌! ও-গুলো পাহাড় নয়! গাছগুলোই অতো বড়ো।

গাছ!

চীফ বললেন,—হ্যাঁ—বিগ ট্রি—আমি 'সেডার' ভাবছিলাম। না—সেডার নয়—সেডার অতো উঁচু হবে না। ও-গুলো হচ্ছে 'কারি'-গাছ। এ-গাছগুলো তিনশো ফিট পর্যন্ত উঁচু হয়! কী ম্যাজেস্টিক! দেখেছো?

আমি ছাতার মতো ডালপালা মেলে দেওয়া গাছগুলো দেখবার চেষ্টা করছিলাম। এতো দূর থেকে ভালো বোঝা যায় না। গাছগুলো দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছে। ও-গুলো 'থার্স ডে' দ্বীপের গাছ, না, মূল ভূখণ্ডের,—তা এখান থেকে বোঝবার উপায় নেই।

চীফ ততক্ষণ তাঁর ঘর থেকে দূরবীণ নিয়ে এসে ভালো করে দেখতে আরম্ভ করেছেন। চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন,—হোয়াট এ ফেট্‌! এর পরে যখন আসবো, তখন হয়ত দেখবো, বিগ-ট্রিগুলো আর নেই, কেটে ফেলেছে! মানুষের লোভ!

বলতে বলতে চলে গেলেন নিজের কেবিনের দিকে। আমি যে সঙ্গীর মতো পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে-কথা বোধহয় সেই সময় তাঁর মনেই ছিল না। অতিকায় 'কারি'-বৃক্ষ একদিন কাটা পড়বে, এই দুঃখই তাঁকে তখন অভিভূত করেছিল বোধহয়।

যাই হোক, জাহাজ আবার একসময় নোঙর উঠিয়ে যাত্রা শুরু করলো। আরাফুরা সাগর পেরিয়ে যেতে কতো দ্বীপের পাশ কাটিয়েই না আমরা গিয়েছিলাম! 'তৌনিম্বার', 'মোয়া' 'আলোর' ইত্যাদি। তারপর 'ফ্লোরেস সাগর'-এ প'ড়ে আবার তুফানের মুখোমুখি। সেটা কাটিয়ে যখন জাহাজ বা আমরা একটু সুস্থ হয়েছি, তখন 'মাদুরা'-দ্বীপের কাছাকাছি হবার আগেই মুখ একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে যেতে যেতে একসময় বোর্ণিও ( এক অংশের আধুনিক নাম 'কালিমানতান' ঃ যেটা ইন্দোনেশিয়ার অধিকারে ) কে ডানদিককার দিগন্তে রেখে একদিন এসে পেঁছিলাম সিঙ্গাপুর-বন্দরে। দূরে বোর্নিওকে দেখতে দেখতে আমরা যখন চলছিলাম, তখনো ঘটনাচক্রে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন চীফ অফিসার। বোর্ণিও সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। বললেন,—'রাজা ব্রুক'-এর নাম শুনেছো? জেমস্‌ ব্রুক?

—না!

তিনি বললেন,—বোর্ণিওর সঙ্গে এই মানুষটির নাম জড়িয়ে আছে। ডাচরা এখানে কিছু খুঁটি গেড়েছিল বটে। সে হলো ১৬০৪ সালের কথা। কিন্তু দুশো বছর ধরে তারা খুব একটা ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি নি। দ্বীপের লোকেরা বাধা দিয়েছিল প্রচণ্ড। বাধা দিয়েছিল জলদস্যুরা। যে ভদ্রলোক এখানকার অধিবাসীদের ওপর প্রথম কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন,

তিনি ডাচ্ নন, একজন ইংরেজ : জেম্স ব্রুক। আগে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করতেন। এখানে এসে তিনি একদিকে রুখে দিয়েছিলেন জলদস্যুদের, অন্যদিকে সভ্যতা বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে। এ হচ্ছে ১৮৩৮ সালের কথা, যখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। ১৮৩৯ সালে তিনি যখন 'সারাওয়াক' (বোর্নিওর একটি অঞ্চল)-এ নামলেন, তখন ওখানকার সুলতানের বিরুদ্ধে নরমুণ্ড শিকারী দুর্ধর্ষ 'ডায়াক' জাতিরা বিদ্রোহ করেছে। জেমস ব্রুক সুলতানের হয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সুলতান ব্রুককে নিজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় রাজা ব্রুক।

যাহোক আমি বলছিলাম সিঙ্গাপুরের কথা। অতীতে যখন ভারতের সঙ্গে মালয়ের বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক লেনদেন চলতো, তখন এই 'সিংগাপোর'-এর নাম ছিল 'সিংহপুর।' কে যেন লিখেছিলেন, 'কলকাতা বন্দরের তুলনায় এ-বন্দর অন্ততঃ দশগুণ বড়ো।' কথাটা মিথ্যা নয়। এর 'বাংকারিং' বা জাহাজে কয়লা বোঝাই করবার বিপুল আয়োজন দেখে প্রথমেই সে-কথা মনে হয়। তীরে যেন সারি সারি কয়লার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন চীনে মজুরদের সংখ্যাই ছিলো বেশি, এখন কী হয়েছে জানি না।

সিঙ্গাপুর বিষুবরেখার কাছে, সেজন্য খুবই গরম হবার কথা। কিন্তু সিঙ্গাপুর প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ, এর চারদিকেই জল আর জল—তাই আবহাওয়া যাকে বলে 'নাতিশীতোষ্ণ।'

বিরাট বন্দর, বিপুল কর্মচক্র, বন্দরে জাহাজের পর জাহাজ ভিড়েছে, কিছু জেটিতে, আর কিছু বয়ায় বাঁধা প'ড়ে আছে, জেটিতে স্থান পায় নি। আমরাও সাধারণ জেটিতে জায়গা পাইনি, পেয়েছিলাম 'বাংকারিং'-জেটিতে। আমাদের দরকার জ্বালানী, অর্থাৎ কয়লা এবং সাধারণ খাদ্যদ্রব্য।

সত্যি কথা বলতে কী, সিঙ্গাপুর দেখার আমার আগ্রহ ছিল সব থেকে বেশি। এবং এখানকার 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা' তুলনায় অনেক সুশৃঙ্খল বলে আমার দিককার কাজকর্ম শেষ হতে সময় বেশি লাগলো না। দোসী আর মাসুদকে টেনে নিয়ে যখন শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, তখন সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি।

বন্দরের মধ্যে জাহাজও যেমন আছে, তেমনি একটু বড়ো ধরণের ক্ষুদে ছই-ওয়ালা পানসীও আছে। পানসী আছে, পালতোলা বড়ো নৌকো 'জাঙ্ক'-ও আছে। জাহাজ আর পানসী-টানসি নিয়ে সর্বক্ষণ বন্দরটা যেন গমগম করছে। বন্দরে যারা পানসী ও নৌকো নিয়ে আসে, কারা অধিকাংশই চীনা। বন্দরের এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়তে যে রিক্সার ঝাঁক চোখে পড়লো, সে-গুলিও টানছে চীনা। অবশ্য মালয়ী ও চীনাদের চট্ করে এক নজরে আলাদা করে চেনা যায় না। কিছু কালো মালয়ী আছে, যাদের চট্ করে চিনতে অসুবিধা হয় না,

কিন্তু ফর্সা মালয়ীদের চীনাদের মধ্য থেকে খুঁজে বার করতে দেরি লাগে। পরে শুনেছিলাম, এখানকার শতকরা প'চাত্তর ভাগই চীনা।

সিঙ্গাপুর-সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেশি এই কারণে যে, বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে, আমার এক সম্পর্কিত মামাতো দাদা ( যাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিশাখাপত্তন-শাখায় আমি তখন কর্মে নিযুক্ত ) তাঁদের জাহাজী-কাজের শাখা-অফিস খোলার জন্য সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন কলকাতা থেকে জাহাজে করে। যাতায়াতে তাঁর লেগেছিল তেইশ দিন, এই তেইশ দিন তিনি মাত্র পাঁউরুটি খেয়ে কাটিয়েছিলেন। তিনি পোষাকে 'সাহেব' হলেও ভিতরে ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ছোঁয়াছুঁয়ি-বাছবিচার ইত্যাদি তাঁর ছিল খুব বেশি, তদুপরি খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল সাংঘাতিক। সিঙ্গাপুরে তিন-চারদিন অবশ্য ভালো হোটেলে পছন্দমতো খাবার খেয়েছিলেন, কিন্তু জাহাজে পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছুই না। তাঁর এই শুধু পাঁউরুটি-খেয়ে-থাকা নিয়ে আমাদের ভ্রাতাভগ্নী বা বন্ধুমহলে অল্পবিস্তর রসিকতা চলতো বলে কথাটি আমার আজও মনে আছে।

তাঁর কাছ থেকে কিছু বর্ণনা শুনেছিলাম সিঙ্গাপুরের। যে-কথা শুনেছিলাম, সে-কথা আজ সবাই জানেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর কথা কারুর অজানা নয়, অজানা নয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা। কিন্তু আমি যখনকার কথা লিখছি, তখন পুরোনো হয়ে যায়নি ও-সব প্রসঙ্গ। তাই আমি সঙ্গীদের নিয়ে রিক্সা করে প্রথমেই ঢুকলাম 'সিটি হল' কোথায়, সেটি খুঁজে বার করতে। আজ সিটি হলের সামনে নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে বলে শুনেছি, কিন্তু সেদিন যখন সিটি হলের সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন কোনো মূর্তি বা স্মারক-স্তম্ভ চোখে পড়েনি। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে নেতাজী রাসবিহারীর সঙ্গে এই সিটি হলের সামনের প্রাঙ্গণেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই সিঙ্গাপুরেই নেতাজীর 'দিল্লী চলো,—চলো দিল্লী'র আহ্বান! এই সিঙ্গাপুরেই তাঁর অভিবাদন-বাণী,—'জয় হিন্দ!' এই সিঙ্গাপুরেই তাঁর বিখ্যাত উক্তি,—'রক্ত দিন, আমি দেবো স্বাধীনতা'।

দোসী আর মাসুদকে প্রথমে বলিনি কোথায় যাচ্ছি। মাসুদ একটু স্থূলকায় বলে সে একটা আলাদা রিক্সায় পিছনে পিছনে আসছিল। তারা প্রথমে ভেবেছিল, সিঙ্গাপুর আমার জানা শহর এবং সে-জন্য স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো আকর্ষণীয় স্থানে বুঝি তাদের নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সিটি হলের সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পেঁছে রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে যখন নেতাজীর কথা বললাম, তখন তারাও সসম্ভ্রমে সবকিছু শুনতে লাগলো।

এইখানে একটু ব্যক্তিগত কথা বললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার ঐ দাদা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে যখন তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল, তার মধ্যে রাসবিহারী বসুর প্রসঙ্গ ছিল। আমি ও'র কাছ থেকে শুনে রাসবিহারী

সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা আরম্ভ করি। 'প্রবর্তক' পত্রিকার কিছু পুরানো কপি আমাদের বাসায় দিল, তাতে রাসবিহারীর প্রসঙ্গ ছিল। আর তাছাড়া বিশাখাপত্তনে আসবার আগে কলকাতায় থাকাকালীন কিছু পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে নেতাজী—আজাদ হিন্দ-ফৌজ-রাসবিহারী সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করছিলাম। তখন আমি কেন, প্রত্যেক বাঙালীই বোধহয় এসব কথা শুনতে আগ্রহী ছিলেন। ঠিক এই সময় ঘটনাচক্রে চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের একটি উৎসবে সবান্ধব যোগদান করতে গিয়ে হঠাৎ আলাপ হয়ে গিয়েছিল রাসবিহারীর অনুজ অধ্যাপক বিজনবিহারী বসুর সঙ্গে। তিনিও তখন উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁদেরও আদি বাড়ি ছিল চন্দননগরে। আমি তাঁর কাছ থেকে রাসবিহারী-প্রসঙ্গে বহু তথ্য শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আজ অবশ্য সে-সব তথ্য বাঙালী পাঠকের জানা, তবু সে-সময় ও-সব কথা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। সেজন্য সিঙ্গাপুরে গিয়ে প্রথমেই সিটিহলের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। বিজনবাবু আর একটি জায়গার নাম করেছিলেন, 'বিদাদরি।' এই 'বিদাদরি'র সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। না দিলেও ঘুরে ফিরে আবার আমরা সিটি হলে ফিরে এসে-ছিলাম। তখন মাসুদ আর দোসিও এ-প্রসঙ্গ শুনতে বিশেষ উৎসুক হয়ে পড়েছিল। আজাদহিন্দ্ বাহিনীর সংগঠনে রাসবিহারীর অবদানের কথা সবাই জানেন, তার পুনরুল্লেখ এখানে করার দরকার নেই। ব্রিটিশ শক্তির শক্ত ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছিল ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। সে-সময় মালয়—সিঙ্গাপুরে জাপানীসেনা যে পাশবিক বর্বরতার সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা মেলা ভার। লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, ইত্যাদির ঘটনা ছিল ব্যাপক। পরে একটি বিবরণ মারফৎ জানা গিয়েছিল, মালয়-সিঙ্গাপুর মিলিয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার নারী ; যার মধ্যে মারা গিয়েছিল চার হাজার। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, কোনো ভারতীয় নারীর অসম্মান তারা করে নি, কোনো ভারতীয় পুরুষও হয়নি লাঞ্ছিত। এর মূলে ছিলেন রাসবিহারী, এবং পরে আজাদহিন্দ্ ফৌজের তৎকালীন সামরিক অধিনায়ক মোহন সিং। তখনো নেতাজী জার্মানী থেকে সাবমেরিনে ক'রে এসে পৌঁছান নি। সে ব্যবস্থারও মূলে ছিলেন রাসবিহারী।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মোহন সিং-এর কৃতিত্বের কথাও স্মরণ করা উচিত। সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে ব্রিটিশ-পক্ষে যে ভারতীয় সৈন্য ছিল, বিপক্ষে দাঁড়ানো 'আজাদহিন্দ্ ফৌজ'-এর সামরিক অধিনায়ক মোহন সিং-এর হৃদয়স্পর্শী ভাষণে সেই সৈন্যরা দলে দলে এসে এ-পক্ষে যোগদান করেছিল।

অথচ এই মোহন সিং-ই পরে কর্তৃত্বের মোহে আসক্ত হয়ে রাসবিহারীর বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি। তখন আজাদহিন্দ ফৌজ-সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। দোসী ও মাসুদকে বিশদ করে সব বললেও এখানে তা বলার দরকার নেই। কারণ, মোহন সিং-এর হঠকারিতার কথা আজকের বাঙালী

পাঠকের অজানা নয়। তবে সিঙ্গাপুরকে কেন্দ্র করে সেদিন যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সংক্ষেপে কিছু বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। মোহনসিং ও তাঁর কয়েকজন অনুচরের প্ররোচনায় সেদিন অনুপস্থিত রাসবিহারীর ছবি ও জাতীয় পতাকা ভারতীয় সামরিক ও অসামরিক জনতা পুড়িয়ে দিয়েছিল, এমন কী, আজাদহিন্দ্ ফৌজের নথিপত্র জ্বালিয়ে দিতেও তারা ইতস্ততঃ করেনি। শেষ পর্যন্ত এই সিঙ্গাপুরের 'বিদাদরি'তেই রাসবিহারী ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারি আজাদহিন্দ্ ফৌজের ছোট-বড়ো সব কর্মচারীদের এক সভা আহ্বান করলেন। যারা সভায় এসেছিলেন, তারা অনেকেই রাসবিহারীকে আগে দেখেননি। বিরুদ্ধবাদীরা যে-ভাবে রাসবিহারী সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন, তাতে তাঁদের কাছে রাসবিহারী ছিলেন এক ভীষণ প্রকৃতির ও আকৃতির মানুষ। কিন্তু 'ভীষণ আকৃতি'র বদলে তাঁরা গাড়ি থেকে নামতে দেখলেন এক দীর্ঘকায় শীর্ণকায় বিধ্বস্ত বৃদ্ধকে। মনে রাখতে হবে, তখনো সুভাষচন্দ্রের পদার্পণ ঘটেনি। সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে একতাবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে সেই সভায় রাসবিহারী বলেছিলেন, মোহনসিং না থাকতে পারে, আমিও না থাকতে পারি, তাই বলে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেন বন্ধ হবে? দেশ কারও একার নয়, একা কেউ দেশ স্বাধীন করতে পারে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? প্রথমে নানারকম কটূক্তি, পরে অশালীন ভাষায় গালাগালি জনমণ্ডলী থেকে রাসবিহারীর উদ্দেশে বর্ষিত হতে লাগলো। সেই জনগর্জনে রাসবিহারীর কণ্ঠ ডুবে গেল। তিনি চুপ করে রইলেন। যেন স্তব্ধ, সমাহিত মূর্তি! দুটি চোখে ফুটে উঠলো অশ্রুবিন্দু। সেই বিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে হঠাৎ জনতা নির্বাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে এধারে-ওধারে শুরু হলো মৃদু গুঞ্জন। তারপরেই হঠাৎ জনগণ চিৎকার করে উঠলো, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ! রাসবিহারী বাস কি জয়!' যারা তাঁর ছবি পুড়িয়ে একদিন পদদলিত করেছিল, তারা আজ তাঁরই গুণগ্রাহী হয়ে দাঁড়ালো মুহূর্তে। পরবর্তীকালে আজাদহিন্দ ফৌজের মেজর বীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'মুক্তিসেনার ডায়রী'তে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখে গেছেন, 'নিতাই গৌরের সহিষ্ণুতার কাহিনীর মতোই এ-কাহিনী অদ্ভুত।'

কিন্তু সিঙ্গাপুরের কাহিনী আরও আছে। আজাদহিন্দ বাহিনীর পুনর্গঠনে রাসবিহারী যখন ব্যস্ত, তখন এই সিঙ্গাপুরে বসেই তিনি খবর পেলেন তাঁর একমাত্র পুত্র অশোক (মাসাহিদে) যুদ্ধে মারা গেছে! এই নিদারুণ শোকের বার্তা কাউকে জানতে দিলেন না তিনি। বুকের ব্যথা বুকে রেখেই তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। ফলে আক্রান্ত হতে লাগলেন হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায়। কিন্তু তবুও বিশ্রাম নেই। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'I am a Fighter! One Fight more!' এই প্রসঙ্গেই বিশেষ করে মনে পড়ে যায়।

সিঙ্গাপুরের 'ক্যাথে থিয়েটার গ্রাউণ্ড' আমরা অবশ্য সেদিন খুঁজে বার

করেছিলাম। এই ক্যাথে থিয়েটার-ময়দান ভারতীয়দের কাছে আজ মহাতীর্থ সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে সুমাত্রায় এসে পেঁছিলেন। সুমাত্রা থেকে সিঙ্গাপুরের পথের দূরত্ব আর কতটুকু? কিন্তু সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে রাসবিহারীর কাছে না পেঁছে আকাশ-পথে চলে গেলেন সরাসরি টোকিও। সেখানে জাপানী মন্ত্রী ও সমর-দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার পর সিঙ্গাপুরে এসে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই সিঙ্গাপুরেই ক্যাথে থিয়েটার-ময়দানের জনসভায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদহিন্দ ফৌজ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সভাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী জনতার উদ্দেশে বললেন, আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, টোকিও থেকে আপনাদের জন্য আমি কী এনেছি? এনেছি এই উপহার—সুভাষচন্দ্র বসু।

আদর্শ কর্মীর মতো নেতাজীর হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে তিনি টোকিও ফিরে গেলেন নিজের শাশুড়ী শ্রীমতী কোকো সোমা (স্ত্রী বহুপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন) ও কন্যা তেৎসু (ডাক নাম, তেতিকো)-র কাছে। কঠিন পীড়ায় তিনি তখন আক্রান্ত। তারপরে নেতাজী-প্রেরিত দুঃসংবাদ 'মুক্তিসেনা কোহিমা ও ইম্ফলে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত,'—শোনবার পর তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি জাপানী জনসাধারণের প্রিয় 'সেনসেই' বা 'মাষ্টারমশাই' এবং আমাদের আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু মহাপ্রয়াণ করলেন।

কিন্তু ইতিহাস ছেড়ে এখন আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ক্যাথে থিয়েটারের সামনে বসে বসে গল্প করতে করতে কখন যে রাত হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রিক্সা ধরলাম। রাতের সিঙ্গাপুর তখন অভিসারিকার রূপ নিয়েছে। আজ আমরা জাহাজে 'খাবোনা' বলে নোটিস দিয়ে এসেছিলাম, তাই শহরের কেন্দ্রে এসে আমরা রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে 'সৌখিন' বা 'ফ্যাসানেবল' পাড়ায় এলাম। লোকজনে যেন গম গম করছে। দোসী বললে,—এযেন মেলা বসে গেছে! রাত হয়ে গেলেও মেয়েদের আনাগোনার বিরাম নেই। অভিজাত মহিলারা 'শপিং' অর্থাৎ কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন। রেডিও-র সরব চিৎকার, রিক্সা, গাড়ি ইত্যাদির ভিড়, তার মধ্য দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথিকের চলাচল! একটা কথা প্রচলিত আছে—'Singapore never sleeps!'…দেখে মনে হলো, কথাটা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। চীনা শ্রমিক-মেয়েরা প্যান্টের ওপর লম্বা জামা প'রে দ্রুত পথ হাঁটছে, হাঁটছে সাটিনের ঝকমকে পোষাক পরে মালয়ী মেয়েরা। তার মধ্যে শাড়ি-পরা ভারতীয় মেয়েদেরও দেখা যায়।

যাইহোক, আমরা একটা খানদানী হোটেল দেখে ঢুকলাম। আজকাল কলকাতায় চাইনীজ খাবার 'চাউ-মেন'-এর চাহিদা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তখন কলকাতার মানুষ ওতে তেমন অভ্যস্ত হয়নি। আমরা তখনকার দিনে সেই 'চাউমেন' খাবো বলে একটি ছোট টেবিল ঘিরে তিনজনে বসলাম। তখনকার

দিনে ডলার ( মালয়-ডলার অবশ্য ) হিসাবে রীতিমত খরচাই হয়েছিল আমাদের। বেশি খরচা হবার আরেকটা কারণ ছিল। ঐ হোটেলে ছিল ক্যাবারে নাচ। বলা বাহুল্য, ক্যাবারে-নাচ দেখার অভিজ্ঞতা সে-ই আমার প্রথম। প্রায় নিরাবরণ মহিলাটি ( মালয়ী, না, স্থানীয় চীনা, কে জানে ? ) নাচছেন একটা মঞ্চে, মাঝে মাঝে আমাদের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছেন, আর তাঁর ওপর এসে পড়ছে রঙ-বেরঙের আলোর বৃত্ত, কিন্তু আমি 'হাঁ' হয়ে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে থাকলেও, দোসী বা মাসুদ, যারা এই সব ব্যাপারে প্রায় প্রতি বন্দরেই উৎসুক হয়ে ওঠে, তারা নিস্পৃহ হয়ে বসে রইলো। খাওয়া তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা বললে,—দূর ভালো লাগছে না, উঠে পড়া যাক !

মহিলাটি ঘুরে ফিরে স্টেজে গিয়ে হাজির হলেই পুরো আলো জ্বলে উঠছিল। সেইরকম একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপার কী ! এমন অভাবনীয় দৃশ্য ছেড়ে—

দোসী বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—প্যাথে-গ্রাউণ্ডে যে প্রসঙ্গ হচ্ছিল, সেসব শোনবার পর আর কি ওসব ভালো লাগে ? জাহাজে ফিরে চলো। ফিরে গিয়ে তোমার কাছে সব শুনবো। আজ দেখছি তুমিই 'হিরো'।

কিন্তু জাহাজে ফিরবো কী ? জাহাজ কয়লা-বোঝাই শেষ করে জেটি পরিত্যাগ করে একটি 'বয়া'য় গিয়ে বাঁধা পড়ে আছে, অন্য জাহাজকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে। আমাদের জাহাজের মতো বহু জাহাজই ঐ রকম বয়া অবলম্বন ক'রে জলে ভাসছে, তাদের ভিড়ে আমাদেরটি খুঁজে বার করবো কী করে ?

সমাধান করে দিলো সামপানের মাঝি। জাহাজের নাম বলতেই সে ঠিক আমাদের পেঁৗছে দিলো। গ্যাঙওয়ে নামানো ছিল, আমরা যথারীতি উঠে গলাম জাহাজে।

আমরা যখন সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম, তখন ওখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মালয়ী এবং স্থানীয় চীনাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপানীদের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর ফিরে পাবার পর থেকেই। 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠন'-এর নামে তারা ক্রমশই বিভেদ-সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠছিলো। কিন্তু জনতার জাগ্রত অংশও চুপ করে ছিল না। মূল চীন ভূখণ্ডের মুক্তি-আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় মালয়েও গণসংগঠন তৈরি হয়ে গেরিলা-যুদ্ধের মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানবার প্রয়াস করছিল। সিঙ্গাপুরের আলোঝলমল 'ক্যাবারে নৃত্য' শোভিত নৈশজীবন বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে এসব বোঝবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কিন্তু একেই বলে বোধ হয় 'দৈববাণী'। জলে দাঁড় ছপছপ করে ফেলে সামপানের চীনা মাঝি আমাদের জাহাজে নিয়ে চলেছে, আর আমরা তার কাছেই ছইয়ের বাইরে বসে ( কারণ, ছইয়ের মধ্যে মাঝির স্ত্রী আর দুটি বাচ্চা ঘুমোচ্ছিল।

সামপানেরই বুকে ওদের ঘরবাড়ি আর সংসার। সেজন্য সামপানের আকৃতি তুলনায় একটু বড়ো। ) আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলাম ইংরেজীতে। আলোচ্য বিষয় ছিল, ক্যাবারে নাচ। মাঝিটি যে ইংরেজী বুঝতে পারে এটা জানবো কী করে? হঠাৎ দৈববাণীর মতোই সে বলে উঠলো,—দেয়ার ইজ আদার সিংগাপোর অল্‌সো।

এবং এই 'আদার সিংগাপোর' সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, যদি না সে মুখ খুলতো। আমাদের আগ্রহ দেখেই সে ঐ তথ্যগুলো আমাদের পরিবেশন করেছিল।

॥ ৬ ॥

সিঙ্গাপুরের পর জাহাজ যখন মালয়ের সুবিখ্যাত 'পেনাং' বন্দরে ধরলো না, তখন অনেকে বলাবলি করছিল, তাহলে নিশ্চয় 'রেঙ্গুন' যেতে হবে। কিন্তু প্রত্যাশীদের হতাশ করে রেঙ্গুনে জাহাজ না গিয়ে গ্রেট নিকোবরের পাশ কাটিয়ে পৌঁছালো গিয়ে আন্দামানে। নিকোবরের কাছাকাছি হতেই আবার তুমুল ঝটিকার মুখে গিয়ে পড়লো জাহাজ। আমাদের 'সী-সিক্‌নেস'-এর বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, ক্যাপ্টেন স্থির করেছিলেন সোজা দেশের মাটিতে গিয়ে ভিড়বেন। কিন্তু জাহাজের যান্ত্রিক দুর্বলতা, বিশেষ করে একটি বয়লারের গোলমালের জন্য তাঁকে মত পরিবর্তন করে 'নানকৌরী'র কিনার ঘেঁষে কার নিকোবরের 'কাহানা'র কূলে নোঙর ফেলে রাত কাটিয়ে পরদিন গিয়ে পৌঁছতে হয়েছিল দক্ষিণ আন্দামানের 'পোর্টব্লেয়ার' বন্দরে।

গ্রেট্ নিকোবরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন ঝড়ের উথাল-পাথাল সামলে নান্‌কৌরী দ্বীপের হারবার বা বন্দরে গিয়ে জাহাজের 'অসুখ' পরীক্ষা করা হবে বলে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন তখনো দেশের মাটিতে ভিড়বার আশা ছাড়েননি, তাই নান্‌কৌরীতে না থেমে সোজা এগিয়ে

চললেন। তারপরে জাহাজের অসুখ খুব সোজা নয় মনে হওয়ায় একটু খতিয়ে দেখার জন্য কার নিকোবরে এসে থামলেন। আকাশজুড়ে তখনো মেঘ, যদিও সমুদ্র মোটামুটি শান্ত। ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটু 'খতিয়ে' দেখার পর স্থির হলো, উপায় নেই, জখমী বয়লারকে সামলানোর জন্য পোর্টব্লেয়ার গিয়ে অন্ততঃ দিন তিনেক বিশ্রাম না নিলে আর উপায় নেই।

আমাদের উপরি লাভ হলো একরাত্রির জন্য 'কার নিকোবর' অবলোকন। 'কাহানা'তে শিপিং অফিস আছে। খবর পেয়ে নৌকোয় করে অফিসটির কর্তা জাহাজে এসে উঠলেন। স্থানীয় মানুষ। খৃষ্টান। এঁর মুখে শুনলাম যে ঝড়ে আমরা বিপর্যস্ত হচ্ছিলাম, তার কারণ নিছক ঝড় নয়, ঝড়ের এক অপদেবতা 'টারাই' আমাদের পিছনে লেগেছিলেন। ধর্মে খৃষ্টান, অথচ 'অপদেবতা'য় বিশ্বাস কেন, একথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে আর বলা হলো না। তাঁর এ মন্তব্যে তিনি যে অত্যন্ত 'সিরীয়াস,' একথা তাঁর মুখ দেখে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। বয়স আন্দাজে ভদ্রলোককে দেখায় তরুণ। কাজ শেষ হলে আমার ঘরে ওকে টেনে আনলাম। সেলুনে গিয়ে খেয়েও এলাম আমরা একসঙ্গে। চেহারা সিঙ্গাপুরে-দেখা মালয়ীদের মতো, ফর্সা চেহারা, উচ্চতায় পাঁচফুটের একটু বেশি হবে। খুব ফুর্তিবাজ, মিশুকে লোক। নাম জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলেছিল, আসল নাম বেশ বড়ো, মনে রাখতে পারবে না, ফিলিপ বলে ডেকো।

ফিলিপ পোর্টব্লেয়ারের স্কুলে লেখাপড়া করেছে, ইংরেজী মোটামুটি জানে, বলতে, পড়তে, লিখতে জানে, নইলে এজেন্ট্ কোম্পানীর স্থানীয় অফিসের ম্যানেজারের চাকরি পেলো কী করে? হিন্দীও একটু আধটু জানে, 'কেয়সা হ্যায়?' 'আচ্ছা', 'তন্দুরস্তি', 'কোশিশ', 'নিম্বুপানি', 'মুরগা' 'মছলি', 'গোস্ত্'-এসব কথা তার বাক্যাংশের মধ্যে প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছিল।

দোসী প্রশ্ন করলো,—ওয়েল ফিলিপ, এ-দ্বীপে তোমাদের খৃষ্টানদের সংখ্যা কতো?

ফিলিপ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো,—সিক্স থাউজ্যান্ড স্যার, ইন দিস লিট্ল আইল্যান্ড। আমাদের নেতার নাম নিশ্চয় শুনেছো,—বিশপ রিচার্ডসন? তিনি এখানকারই লোক।

ওর দ্বীপের ইতিকথা পর্যন্ত ফিলিপের নখদর্পণে। ওর কাছ থেকেই জানলাম, ভারতের দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল নিকোবর দ্বীপ জয় করেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। পুরো দ্বীপটাকে তাঁর সময়ে 'নাক্কাভরম' বলা হলেও, 'গ্রেট নিকোবর'কে আলাদা ক'রে বলা হতো 'নাগদ্বীপ', এবং 'কার নিকোবর'কে বলা হতো 'কারদ্বীপ'। 'নাক্কাভরম' কথাটার মানে হচ্ছে 'নগ্ন বা নাগাদের দেশ।' সে-হিসাবে কোথাও কোথাও 'নগ্নদ্বীপ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

যাই হোক, রাত প্রায় দশটা নাগাদ ফিলিপ নেমে তার নৌকো করে ঢেউয়ে

নাচতে নাচতে চলে গেল। ভোরবেলা আমাদের জাহাজ ছাড়বে বলে তোড়জোড় চলেছে, আমরা গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। দেখি, তীরের কাষ্ঠনির্মিত ছোট্ট জেটিতে অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফিলিপ হাত বাড়িয়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। তার পাশে একটি নিকোবরী মহিলা দাঁড়িয়ে, বোধহয় ওর বউ। তরুণী। তার পরণে মালয়ীদের মতো ছাপা কাপড়ের লুঙ্গি, গায়ে সাদা ব্লাউজ, দু-হাতে দুটি ক'রে চুড়ি, গলায় হার। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে, কাণে রিং।

সমুদ্র তখন শান্ত। এত শান্ত যে সমুদ্র বলে চেনা যায় না, যেন চিল্কা হ্রদের জলের মতো স্থির। শুধু তীরে গিয়ে ঢেউ যখন পড়ছে, তখন সাদা ফেনার রেখা দেখা যায়। কয়েকটা টালির ছাদওয়ালা পাকাবাড়ি দেখা গেলেও অদূরের কুটিরগুলো বড়ো অদ্ভুত। আমাদের গ্রামের ধানের গোলা যেমন হয়, তেমনি গোলাকার-স্তূপের মতো দেখতে, কিন্তু আকারে বড়ো, আর ঘরগুলো সাত-আট ফুট উঁচুতে খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

জাহাজ তখন ছেড়ে যাচ্ছে। আমরাও হাত নাড়ছি, ওরাও হাত নাড়ছে। বউটির সঙ্গে আলাপ হয়নি আমাদের। কিন্তু ফিলিপ আমাদের কথা তাকে বলাতে সে-ও আমাদের 'বন্ধু' করে নিয়েছে মনে মনে। ওদের দ্বীপভর্তি নারকেল গাছ। অতি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা, প্রায় গায়ে-গায়ে ঠেকানো। ফিলিপ বলেছিল, আমাদের প্রধান খাদ্য যেমন ভাত, ওদের প্রধান খাদ্য তেমনি নারকেল। ওর কাছ থেকে আরও জেনেছিলাম, কার নিকোবরের জনসংখ্যার অনুপাত অন্যান্য দ্বীপের থেকে বেশি। যুদ্ধের সময় জাপানীদের একটা ছাউনি পড়েছিল ঐ দ্বীপে তারা পাকা রাস্তাও তৈরি করেছিল কয়েকটি; পাকা দেওয়াল-ঘেরা টালির ছাদওয়ালা ঘরও তাদের তৈরি। নেতাজী এসে এই দ্বীপের নামকরণ করেছিলেন 'স্বরাজ'। ১৯৪৫ সাল থেকে সরকারের সঙ্গে চুক্তি ক'রে আকুজি এ্যান্ড কোম্পানী নিকোবরীদের সঙ্গে ব্যবসা করছে। এই দ্বীপের সাধারণ লোক, বিশেষ করে গ্রামের লোক, এখনো টাকা-পয়সার ব্যবহার জানে না, নারিকেল-এর বদলে দরকারী জিনিসপত্তর কিনে নেয়। 'বিনিময়'-পদ্ধতি এখনো চলছে, তবে বেশি দিন আর নয়, সভ্যতার ঢেউ যত এসে দ্বীপে লাগবে, ততই ও-সব আদিম অভ্যাস বদল হয়ে যাবে,—এই ছিল মিস্টার ফিলিপের অভিমত।

যাই হোক, ভোরে রওনা হয়ে আন্দামান অর্থাৎ পোর্ট ব্লেয়ারের জেটিতে গিয়ে যখন আমাদের জাহাজ ভিড়লো, তখন বিকেল হয়ে গেছে,—বলা যায় পড়ন্ত বিকেল। এক ধরণের নরম গোধূলির আলো চারদিকে প'ড়ে অপরূপ এক স্নিগ্ধতা ফুটিয়ে তুলেছে। সিঙ্গাপুরের হৈ-চৈ-রৈ-রৈ আর সমারোহের তুলনায় এ-যেন নিস্তব্ধ-নিঝুম একটি ছোট গ্রাম। দু-পাশে পাহাড় সমুদ্রের বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্য দিয়ে পথ করে আমরা জেটিতে ভিড়লাম। জেটির পিছনেই পাহাড়ী পথটা চোখে পড়ে—খানিকটা উঠে ভিতরের দিকে মিলিয়ে গেছে!

যথারীতি এজেন্টের লোক এলো। এলো পুলিশ, কাস্টম্‌স্‌। কাগজপত্র সই-সাবুদ ক'রে মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে গেল। বোধহয় ভদ্রলোকদের তাড়া আছে, অফিসের ঝামেলা চুকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চান। জাহাজে খাওয়া-দাওয়া হয় সন্ধ্যার সময় এ-কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু এঁদেরকে ক্যাপ্টেন সান্ধ্য-ভোজনে আমন্ত্রণ জানালেও তাঁরা সবিনয়ে 'দুঃখিত—অপারগ', এই কথা জানিয়ে 'কাল আসবো' বলে চলে গেলেন। পিছনে পিছনে সৌজন্যের খাতিরে আমিও তাঁদের এগিয়ে দেবার জন্য জেটিতে নামলাম, এবং জেটিতে নামলাম বলেই ঘটনাটা ঘটলো, নইলে কী হতো, কে জানে। ওঁদের বিদায় দিয়ে ফিরবো বলে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর যেন আমার পায়ে তৎক্ষণাৎ শিকল পরিয়ে দিলো ঃ এই যে লেখক মশায়, যাচ্ছেন কোথায় ?

একে তো এক যুগ বাদে বাংলা ভাষা এসে 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল', তার ওপরে 'লেখক' বলে এই সুদূর আন্দামানে সম্বোধন করে কে ?

তাকিয়ে দেখি আমারই বয়সী একটি দোহারা চেহারার ফরসা ব্যক্তি, ঘোর খয়েরী প্যাণ্টের ওপরে সাদা বুশসার্ট প'রে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় পাখীর বাসার মতো একরাশ চুল, চিরুণীর শাসনেও তেমন সজুত হয়নি।

চিনতে হয়ত আরও একটু দেরি হতো, কিন্তু ঐ পাখীর বাসার মতো রাশি-কৃত চুলই ওকে চিনিয়ে দিলো মুহূর্তে। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—তুই !

এগিয়ে এসে আমাকে দু-হাতে বিজয়া দশমীর সম্ভাষণের মতো জড়িয়ে ধরলো, বললে,—হ্যাঁরে—আমি। অনিমেষ বাগচি—পিতার নাম সুরেশ বাগচি—সাকিন—

—চুপ কর—চুপ কর !—বলে উঠলাম,—এখানে কী করছিস ? গবর্ণমেণ্ট তোকে দ্বীপান্তরে পাঠালো কবে ? হাতে-পায়ে বেড়ি পরেছিস তো, নাকি !

অনিমেষ বললে, নারে ভাই—'বেড়ি' পরার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। আর গভর্ণমেণ্ট পাঠাবে ? সেই বরাত করেছি কী ? পাঠিয়েছে এক প্রাইভেট কোম্পানী,—তাদের দেশলাই কারখানা আছে এখানে—তারই একটি জোরালো কিসিমের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘুরছি আর কী !

—তার মানে তুমি অফ্‌সর-লোগ !—বললাম,—আয় জাহাজে আয়—এখন আমাদের নৈশ ভোজের টাইম—চলে আয়—একসঙ্গে খাবো—তুই আমার গেস্ট।

জেটির অন্যান্য লোকজন আমাদের কাণ্ড দেখছিল। জেটিতে অনিমেষ একাই ছিল না, আরও অনেকে ছিল। কেন, কে জানে ! এ-তো প্যাসেঞ্জার জাহাজ নয় যে, আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে আসবে !

কিন্তু 'অনিমেষ' কি সেই ছেলে ? সে কিছুতেই জাহাজে 'খেতে' আসবে না, আমিও ছাড়বো না, রীতিমত হাত ধ'রে টানাটানি চলতে থাকলো কিছুক্ষণ। জাহাজের 'ডেক'-এর কাছ থেকে মাস্টুদ দেখছিল ব্যাপারটা। জেটির লোকজন আরও ঘন হয়ে এলো। চারপাশের এতগুলি কৌতূহলী দৃষ্টির জন্যই হার মানলো অনিমেষ, বললে—চল্‌। তোর সঙ্গে পারবে কে ?

ওপরে যেতেই মাসুদ ওর অপরিচিত অনিমেষকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,—হ্যালো মিস্টার, ওয়েল কাম। বঙ্কিং-এর বাকি অংশটুকু জাহাজে হয়ে যাক, আমরা একটু দেখি।

আমি অনিমেষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম মাসুদের। অনিমেষ এইবার উত্তর দিলে মাসুদের মন্তব্যের। বললে,—জোটিতেই হেরে গেলাম বঙ্কিং-এ; আর কি তার জের টানা চলে? তবে হেরেও সুখ আছে, কলেজের বন্ধু কি না! কলেজে খুবই অন্তরঙ্গ ছিলাম দুজনে।

মাসুদ বললে,—ভেরি গুড! আসুন, আগে খাবার টেবিলে গিয়ে বসা যাক।

খাবার টেবিলের বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। শুধু একটা ব্যাপার দেখে অনিমেষ বোধ হয় অবাকই হয়েছিল। আমি 'চিকেন' নিলাম না দেখে ও বললে, সে কী! এখনো মুরগী ধরিস নি?

একটু হেসে বললাম, না। কলেজ-লাইফে কতো চেষ্টা করেছিস তোরা খাওয়াতে, রেষ্টুরেণ্টে বসে? পেরেছিলি?

অনিমেষকে একটু চিন্তান্বিত দেখালো, বললে,—তাইতো! তোকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কী খাওয়াবো। এখানে তো মুরগী ছাড়া—

আমাদের বাংলা কথাবার্তার মধ্যে এইখানে দোসী একটু বাধা দিলে। বলা বাহুল্য, দোসীও আমাদের টেবিলের শরিক ছিল এবং তার সঙ্গেও অনিমেষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।

সে বললে,—হোয়াট্ ইজ ইট্! এনি প্রবলেম?

সবটা শুনে তারপরে হেসে উঠলো, বললে,—ও-তো 'পাক্কা' জাহাজী নয়, তাই 'ফুড-হ্যাবিটে' বহুৎ গোলমাল আছে। ইলসা-রুহি-চিংড়ি ছাড়া আর কোনো মাছ খাবে না, 'মাটন' ছাড়া আর কোনো মাংস খাবে না, ওকে ভেজিটেরিয়ানই বলতে পারো। কারণ জাহাজে ওসব পদার্থ সবসময় থাকে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরে এসে দেখা গেল, তখনো গোধূলির আলো আকাশ থেকে মিলিয়ে যায় নি। অনিমেষ জানালো, এখানে আকাশ পরিস্কার থাকলে গোধূলি একটু বেশিক্ষণই বিরাজ করে।

আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে অনিমেষ বললে—আজ আর শহর কী দেখবি, রাত হয়ে যাবে। এখানে আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই সব নিঝুম হয়ে যায়, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

বললাম—তাহলে কাল সকালেই বেরুনো যাবে। আমার ঐ বন্ধুরাও সঙ্গে থাকবে। বুঝলি?

ও বললে—সেইজন্যই তো কথাটা বলছি। যে বাড়ি, তিনজনের জায়গা হওয়া মুশকিল। ওরা সকালে যাবে, তুই আমার সঙ্গে চল্—রাতটা আমার ঘরে থাকবি—কোনো অসুবিধে হবে না।

বললাম—সর্বনাশ! রাত বারোটার পর জাহাজের বাইরে থাকার নিয়ম নেই। ঠিক আছে চল্, বারোটার আগে ফিরে এলেই হবে।

অনিমেষ বললে,—বললাম না, রাত আটটা—সাড়ে-আটটার পর সব নিঝুম হয়ে যায় ? অতো রাতে ঘোরাফেরা খুব 'সেফ'-ও নয়।

—কেন ?

ও বললে—এটা যে কয়েদীদের উপনিবেশ ছিল, তা ভুলে যাচ্ছিস কেন ? বঙ্গদেশ থেকে বিপ্লবীরা এই কালাপানি পার হয়ে এসেছিল বটে, সেইসঙ্গে মারাত্মক খুনী বা ডাকাতরাও কি আসে নি, বিশেষ ক'রে অন্যান্য জায়গা থেকে ? তাদের অনেকে এখানেই থেকে গেছে, দেশে আর ফিরে যায় নি।

—তাহলে ?

অনিমেষ বললে,—রাতের বেলা ছুটি নে না ? দ্যাখ্‌না চেষ্টা ক'রে ?

খুবই আশঙ্কা ছিল ছুটি পাবো না বোধহয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন খুশমেজাজে ছিলেন, বললেন,—ঠিক আছে, কাল সকালে রিপোর্টিং। কেমন ?

—ধন্যবাদ স্যর—গুড নাইট্।

চলে এলাম অনিমেষের সঙ্গে। দোসীদের বললাম,—কাল এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

মাসুদ বললে,—ওল্ড ম্যানকে ম্যানেজ করে ছুটি নিলে কী ক'রে ?

দোসী মন্তব্য করলে,— পাপুয়ার পোর্ট মোর্সবির কথা মনে নেই ? ওখান থেকেই ওল্ড ম্যানকে হাত করেছে।

হেসে বললাম,—তাহলে আমার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করো ?

—ও-ইয়েস।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

জেটি ছেড়ে ওপরের পথে হাঁটতে হাঁটতে বললাম,—কতদূরে তোর বাসা ?

ও বললে,—চল্ না—বেশি দূর নয়।

বললাম,—পায়ে যখন বেড়ি পরিস্ নি, তখন একাই আছিস্ বুঝতে পারছি। কেমন কাটছে দিন ?

বললে,—প্রথম-প্রথম মন্দ লাগেনি। সেলুলার জেল—বিপ্লবীদের গৌরব গাঁথা—কিম্বা ম্যারিনা পার্কে পায়চারী করা—অথবা একটু দূরে 'করবাইন্স্ কোভ'-এ দলবল মিলে সমুদ্রের নিরালা তটে গিয়ে চড়ুইভাতি করা,—অথবা কখনো তুষনাবাদ অঞ্চলে গিয়ে আমাদের দেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে গিয়ে একটু-আধটু সমাজসেবা করা—কিন্তু তার পর ? তারপরেই হাঁপিয়ে উঠতে হয় !

—লাইব্রেরী-টাইব্রেরী নেই ?

বললে—'অতুল স্মৃতি' বলে বাঙালীদের একটা আড্ডা ছোটখাটো যে গ'ড়ে ওঠেনি এমন নয়, কিছু বই-ও আছে, মাঝে মাঝে থিয়েটার-ফিয়েটারের চেষ্টাও করা হয়। বিশেষ করে এখানে যিনি কমিশনার আছেন, তিনি বাঙালী, মিঃ ঘোষ, তাঁর উৎসাহে কিছু কিছু উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে জাগছে। তাঁর স্ত্রী

মিসেস্ ঘোষ, এখানকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক আর গান করাবার আয়োজন করছেন,—কিন্তু তবুও কি মন ভরে ?

কথা বলতে বলতে আমরা পোর্টব্লেয়ারের আসল বিকিকিনি বা 'মার্কেটিং সেণ্টার'-এ এসে পড়লাম। সামনেই ঘড়ি-ঘরের স্তম্ভটি দেখা যাচ্ছে।

ও বললে,—কাল সব ঘুরে ঘুরে দেখিস। আজ বাড়ি গিয়ে সারারাত গল্প।

—সেলুলার জেলটা আগে দেখবো, বুঝলি ?

ও বললে,—বাঙালী যারা আসে, সবাই তাই দেখতে চায়। আমাদের কাছে তো 'দ্বীপান্তর' মানেই ছিল আন্দামানের বিভীষিকা! জানিস? বীর সাভারকরকে যখন সেলুলার জেলের গেটে নিয়ে এলো, তখন তাঁর কাগজপত্র দেখে দুঁদে লালমুখো অর্থাৎ ব্রিটিশ জেলারেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল, বলেছিল,—মাই গড! ফিফ্‌টি ইয়ার্স!

—তার মানে—পঞ্চাশ বছরের জেল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ,—অনিমেষ বললে,—সেলুলার জেলে আর 'দ্বীপান্তর'-এ এখন অবশ্য কেউ আসে না। এর কটি 'সেল' বা 'খুপরী' ছিল জানিস? ৬৯৮টি। গত যুদ্ধের সময় জাপানীদের অধিকারে থাকার কালে ১৯৪১ সালে দারুণ ভূমিকম্প হয়ে এই জেলের অনেক ভাঙচুর হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে নেতাজী এসে এর নামকরণ করেছিলেন 'শহীদ' দ্বীপ। এর থেকে ভালো নামকরণ আর কী হতে পারে? এখন এটা হাসপাতাল হয়েছে, মিউজিয়াম হয়েছে, কিন্তু তখনকার দিনগুলির কথা ভাবতো? 'চাবুক' মারার যন্ত্রটা তোকে দেখাবো। ওখানে উপুড় করে বেঁধে সপাং সপাং করে চাবুক মারা হতো। অত্যাচারে অত্যাচারে বহু বন্দী পাগল হয়ে গিয়েছিল, বহু বন্দী আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছিল!

আমরা হাঁটছিলাম। জিমখানা মাঠের কাছে ওর ছোট্ট কাঠের একখানা বাড়ি। শুনলাম কোম্পানী থেকে ব্যবস্থা করা ছিল বলে রক্ষে, নইলে পোর্ট ব্লেয়ারে এসে চট্ করে আস্তানা পাওয়া অত সোজা নয়। অবশ্য কমিশনার খুব চেষ্টা করছেন, নতুন-নতুন ট্যুরিস্ট লজ ইত্যাদি করার অনেক পরিকল্পনা আছে, যেমন আছে পানীয় জল আনবার ব্যবস্থার পরিকল্পনা।

ওর বাড়ির বারান্দায় একটি বর্মী মেয়েমানুষ বসে ছিল পাশে একটি হ্যারিকেন নিয়ে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। বর্মী লুঙ্গি আর সাদা জামা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আর গায়ের রঙও কালো। কালো রঙ কি বর্মীদের হয়?

অনিমেষ তার সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলছিল। বোঝা গেল মেয়েটি ওর বাসায় কাজকর্ম করে। ওর দেরি দেখে বসেছিল, নইলে অনেকক্ষণ আগেই চলে যেতো। ও বোধ হয় ওকে রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরি করতে বলে থাকবে। মেয়েটি তাই চলে না গিয়ে পাশের একটি ঘরে ঢুকলো হ্যারিকেনটা উঠিয়ে নিয়ে। আমরা ওর ঘরে ঢুকলাম। কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্পটা শোভা পাচ্ছে। কাঠের সব আসবাবপত্র। বেতের টেবিল আর ইজিচেয়ারও আছে।

বললে,—এটা বসার ঘর। পাশেরটা শোবার। বি কম্‌ফার্টেব্‌ল্‌। কফি খেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে একেবারে বিছানায় গড়াবো।

ওর পাশ ঘেঁষে গদি-দেওয়া কাঠের সোফাটায় বসলাম, বললাম,—নিরালা-নিঃঝুম—দারুণ তো !

ও বললে,—হ্যাঁ, লেখকদের পক্ষে আইডিয়াল ! কিন্তু আমাদের পক্ষে ?

বললাম,—হ্যাঁরে, মেয়েটি বর্মিজ, না ?

অনিমেষ হাসলো, বললো,—মেয়েটি আন্দামানী। খাস এখানকার মেয়ে। কিছু কিছু আন্দামানী রক্তে সভ্যতার রক্ত ঢুকেছিল। এ-মেয়েটিও তাই, মা ছিল আন্দামানী জংলী, বাপ ছিল বাইরের লোক। হয়ত বা এখানকার বাসিন্দা হয়ে যাওয়া কোনো প্রাক্তন কয়েদী। কে বলতে পারে ?

একটু পরেই মেয়েটি বেতের তৈরি ট্রে-তে করে দু-কাপ কফি আর কিছু বিস্কুট নিয়ে এলো। অনিমেষ তাকে বললো,—রাত্রে আমরা খাবো না, রুটি-গুলো তুই বাড়ি নিয়ে যা। শুধু চিংড়িগুলো এখানে দিয়ে যা।

—চিংড়ি ?

—হ্যাঁরে—আজ বাজারে চিংড়ি উঠেছিল। খেয়ে দেখ্‌না—গলদা চিংড়ি।

সুতরাং চিংড়ির কারিও এলো। খেতে খেতে গল্প করছিলাম। মেয়েটি বিদায় নেবার পর বললাম,—নাম কীরে—মেয়েটির ?

বললে,—নোভা। ওর কাহিনী তোকে বলবো, তোর কাজে লাগতে পারে।

—বল ?

—হ্যাঁ,—অনিমেষ বললে,—কাহিনী এখানে অজস্র ছড়ানো—তুলে নিয়ে মালা গাঁথতে পারলেই হলো ! এক একটি মানুষ এক-একটি কাহিনী !

বললাম,—আশ-পাশের দ্বীপগুলিতে ঘোরাঘুরি করেছিস ?

অনিমেষ উত্তর দিলো,—২০৩টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান, কটাতে ঘুরবো বল্‌ ? পাশের রস্‌ আইল্যান্ড ? ওখানেই আগে কমিশনার এবং হোমরা-চোমরারা থাকতেন ব্রিটিশ আমলে, এখন পরিত্যক্ত। ওখানেই একবার গিয়েছিলাম। আর উঠেছিলাম একটা পাহাড়ে। এখানকার অর্থাৎ পোর্টব্লেয়ার-অঞ্চলের দ্বীপের সব থেকে উচু পাহাড় মাউন্ট হ্যারিয়েটে—উচ্চতায় প্রায় দুহাজার ফিট। ওখান থেকে দৃশ্য অবশ্য সত্যিই দেখবার মতো।

—তাই নাকি ! তাহলে কাল নিয়ে চল্‌ না ?

অনিমেষ কফি শেষ করে সিগারেট ধরালো, বললে,—অত সোজা নয় ব্রাদার—দলবল না নিয়ে আমরা ওসব জায়গায় যাই না। জঙ্গুলে জায়গা তো ? ভয় আছে।

—কিসের ভয় ! বাঘ-টাঘ ?

ও হেসে বললে,—না—না—জন্তুজানোয়ারের ভয় নয়—মানুষেরই ভয়।

এক ধরনের জংলী মানুষ, তাদের আজও বশ করা যায়নি—সভ্য, কাপড়চোপড়-পরা মানুষ দেখলেই তারা তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে, এমনি আক্রোশ!

—কেন?

উত্তর দিলো—ওরাই তো এখানকার আদিবাসী। সভ্য মানুষ যত এসেছে, তত ওরা লড়াই ক'রে তাদের হঠাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারবে কেন? তাই সভ্যরা যত এগুচ্ছে, ওরা তত পেছিয়ে যাচ্ছে। পেছিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আক্রোশ যাচ্ছে না। ওদের বলে, জারোয়া বা জারুয়া।

অনিমেষ একটু থেমে তারপরে বললো—শুনবি তাহলে? এখান থেকে খানিকটা দূরে জঙ্গল কেটে বসতি হয়েছে—জায়গাটার নাম তুষনাবাদ—ওখানে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল। তাদের একটি অল্পবয়সী বউ—কী করতে যেন জঙ্গলের ধারে গিয়ে পড়েছিল—কাঠকুটো কুড়োতে হয়তো—তখন গোধূলিকাল—সন্ধ্যা অবশ্য হয়নি—গাছের আড়াল থেকে তীর মেরে তাকে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে!

সোজা হয়ে উঠে বসেছি, বললাম,—বলিস কী!

ও বললে,—এই তো মাসখানেক আগেকার ঘটনা—হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল—বাঁচলো না!

আমি চুপ করে রইলাম। ও-ও নিস্তব্ধ। তারপরে ওর শোবার ঘরে যখন পাশাপাশি খাটে এসে পা ছড়িয়ে বালিশ কোলে বসে আরাম করে সিগারেট ধরিয়েছি, তখন প্রসঙ্গটি আবার উঠলো। বললাম,—এই অনিমেষ, কাল আমাকে ঐ ওখানে, মানে, তুষনাবাদে নিয়ে যাবি?

—ওরে বাবা! জীপ দরকার হবে।

—পাবি না?

অনিমেষ বললে,—কাণ্ড অনেক। ফ্যাক্টরি থেকে ছুটি নিতে হবে—জীপ জোগাড় করতে হবে! তার থেকে কাল শহর দ্যাখ্ না—অতুল স্মৃতি-মন্দির-ম্যারিনা—আমাদের 'স-মিল', মিউজিয়াম, সেলুলার জেল।

বললাম,—পরশু দেখবো। তুই দ্যাখনা ভাই—যদি কাল তুষনাবাদ যাওয়া হয়?

—দেখি।

সকালে জাহাজে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করাই সার হলো। একটি চিঠির খসড়া তৈরি, টাইপ করা, আর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে কিছু টাকার ব্যবস্থা করা। ব্যস—দশটাতেই জাহাজ ছেড়ে বেরুতে পারলাম। দোসী আর মাসুদকে নিয়ে সেলুলার জেলে গেলাম। খুপরি খুপরি ঘরের সারি—তিনতলা। দেখলাম, বেত-মারার যন্ত্র—ফাঁসির দড়ি—ইত্যাদি, দেখতে দেখতে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়। অনিমেষ দ্বীপের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করেছে, 'মেভারিক' জাহাজ সংক্রান্ত ঘটনা বললো, ১৯১৫ সালের ঘটনা। বাঘা যতীন—রাসবিহারী বসু—এম-এন-রায়দের পরিকল্পনা। বালী দ্বীপের কাছাকাছি

কোনো জায়গা থেকে জার্মানী অস্ত্র বোঝাই করে দেশে যাবে মেভারিক জাহাজ। পথে আন্দামান আক্রমণ করে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত করতে হবে, এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু সে-পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, ইত্যাদি।

এখান থেকে গেলাম আমরা ওর ফ্যাক্টরিতে। সেখান থেকে জীপে ক'রে কয়েক মাইল দূরে অরণ্য-রাজ্য তুষনাবাদ অঞ্চলে। এখানেই ক্ষুদে ট্রেন দেখি। দার্জিলিং রেলওয়ের মতো ক্ষুদে ট্রেনের লাইন পাতা। তাতে করে ছোট এঞ্জিন ছোট ছোট ফ্লাট-ওয়াগনে করে বড়ো বড়ো কাঠের টুকরো বয়ে নিয়ে চলেছে। এক জায়গায় দেখলাম, হাতিতে সেই কাঠের গোলাকার খণ্ডগুলিকে ওপর থেকে শুঁড় দিয়ে গড়িয়ে নিচে ফেলছে। জাহাজের ডেরিকের মতো ছোট ক্রেনে করে সেই কাঠের গুঁড়ির খণ্ড ওয়াগনে তোলা হচ্ছে।

তুষনাবাদ একটা উপত্যকা মতন। মুলি বাঁশ কেটে সেই বাঁশের দরমা দিয়ে ঘর করে নিয়েছে উদ্বাস্তুরা। নিজেরা খেটে ধান ক্ষেত করেছে। আমরা যখন গেছি, তখন কিছু ছেলে একজন মাতব্বরের কাছ থেকে সড়কি ছোঁড়া শিখছিল। বেত দিয়ে তৈরি ঢাল, বেতেরই তীক্ষ্ন সরকি। আমাদের দেখে তারা কাছে এলো। মাঠে যারা কাজ করছিল, তারাও মুখ তুলে তাকিয়েছে। এবং আমরা দুজন বাঙালী শুনে তাদের আগ্রহ বেড়ে গেল। আমরা খুঁজে খুঁজে সেই বউটির স্বামীকে বার করলাম। তখনো তার স্বাভাবিকতা ফিরে আসে নি। চুপচাপ থাকে। পড়শীরা ওকে স্নান করিয়ে আনে, পড়শীরাই ওর ভাত রেঁধে দেয়। ওর আর কেউ ছিল না। স্বামী আর স্ত্রী—এই দুজনেই সবার সঙ্গে 'মহারাজা' জাহাজে চ'ড়ে আন্দামানে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করলেও কথা বলে না, বিশেষ করে লোকজন দেখলে কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। লোকটি গেল না আমাদের সঙ্গে জঙ্গলের সেই কিনারের জায়গাটাকে দেখাতে, যেখানে ওর বউকে তীর মেরেছিল জারুয়ারা। সে বসে একটা দা দিয়ে যেমন বাঁশ চিরে দরমা বানাচ্ছিল, তেমনি বানাতে লাগলো। আমাদের নিয়ে গেল অন্য লোকেরা।

অরণ্যের এ অংশটা তত গভীরও নয়। সমতল শেষ হয়ে একটু উঁচুতে উঠে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ে মিশে গেছে, সেখানে জঙ্গল নিবিড় হতে পারে—এখানে নয়। রেল লাইন জঙ্গলের ভিতরে আরও এগিয়ে গেছে। অনিমেষ চাথাম জেটির লাগোয়া বিরাট কাঠের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, সেজন্য কাঠ ও চেনে। একটি পড়ে থাকা মহীরুহের কাটা কাটা খণ্ডগুলির দিকে এগিয়ে গেল। গুঁড়ির কাটা অংশটা একেবারে ধবধবে সাদা। বললে,—এখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা। ধবধবে গাছের গুঁড়িগুলো দেখতেই বোধ হয় মেয়েটি এগিয়ে এসেছিল। গাছটি দেখবার মতো নয়? একে বলে 'হোয়াইট চুংলাম'। মরা গাছ, তাই কাটা প'ড়ে গেছে।

কী হে, কাজ হচ্ছে এখানে?

ওরা বললে,—না বাবু।

অনিমেষ কথা প্রসঙ্গে নানান গাছের নাম করতে লাগলো,—হোয়াইট ধূপ, চুই, কোকা, মার্বেল-উড, ইত্যাদি। আমার সেদিকে মন ছিল না। আমি ভাবছিলাম তরুণী বউটির কথা। হয়ত বনের এই শোভা দেখার আগ্রহ ছিল তার, নইলে একা একা 'বসতি' ছেড়ে এতটা পথ সে আসবে কেন? অবশ্য খুব দূর পথ নয়, ঐ তো দেখা যাচ্ছে, একটু নিচে – সমতল ভূমিতে—এক ঝাঁক কুটির —ছিন্নমূল মানুষদের নতুন বসতি।

আমরা বেশি ক্ষণ থাকতে পারিনি ওখানে। কারণ, জীপ ছেড়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি। আমরা চারজন আজ আবার অনিমেষেরই অতিথি। সেজন্য তাড়াতাড়ি ফিরতে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সময়ে পেঁছানো গেল না। জিমখানার প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে যখন আমরা অনিমেষের বাড়ির সামনে নামলাম, তখন বেলা প্রায় দুটো। আমাদের খাবার আগলে বসে আছে অনিমেষের 'নোভা'।

আমাদের ছেড়ে দিয়ে জীপ চলে গেল। বসবার ঘরেরই এক প্রান্তে খাবার টেবিল সাজানো। প্লেট, জলের গ্লাস, জাগ ইত্যাদি। অনিমেষ নোভাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো,—ঘরমে খানা দে আয়া, কি নেহী?

—নেহী।

অনিমেষ বললো,—তো আভি চলা যাও—তুরন্ত-জল্‌দি!

নোভা বোধ হয় অনুরূপ আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে ওর যা নেবার, তা গোছাতে লাগলো।

আমরা যে যার চেয়ারে বসবার পর অনিমেষ বললে—ফ্রেণ্ডস, প্লিজ। হেল্‌প্‌ ইয়োরসেল্‌ভস্‌।

—ও শিয়োর!

আমার দিকে ফিরে অনিমেষ বললে,—ওকে ছুটি দিলাম। নইলে ওর ঘরের লোকের খেতে দেরি হয়ে যাবে।

রান্নার আইটেম কম ছিল না। চাপাটি, ঘি-ভাত, তার পরে লাউ-চিংড়ি, পেঁপের ডালনা, মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল, রুইমাছ ভাজা, নারকেলের কুচি দিয়ে তৈরি একবাটি মিষ্টি। এছাড়া মুরগির ঝোল ছিল ওদের জন্য।

বললাম,— তোমার নোভা তো দিব্যি রান্না করে!

অনিমেষ বললে,—শিখেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর দোসী বললে,—নাইস ডিসেস। থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ বাগচি।

সোফায় বসে যে যার সিগারেট ধরালাম। মাসুদ বললে,—তোমার বন্ধুকে রাত পর্যন্ত রাখতে পারো মিঃ বাগচি, কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, হুকুম আছে। এর ইতিহাসটা একটু বলো।

অনিমেষ বললো,—১৮৫৭ সালের সিপাহী-জাগরণের বন্দীদের নিয়ে ১৮৫৮ সালে এই বন্দীনিবাস গ'ড়ে ওঠে। তখন জাহাজ ভিড়বার এই এবার্ডিন জেটি আর ঐ Penal settlement—এ ছাড়া কিছু ছিল না। কর্তারা

থাকতেন রস-আইল্যাণ্ডে। তারপরে এলেন বাংলার বিপ্লবী বন্দীরা দফায় দফায়। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। তারপরে ১৯২২-২৩ এ আসে এখনকার কেরালা ( তখনকার 'মালাবার' )-র ১৯২১-র মোপ্‌লা বিদ্রোহের প্রায় পাঁচ হাজার বন্দী। ওদের অনেকে এখানেই চিরতরে বাসা বেঁধে ছিল। তারপরে ১৯২৬ এ আসে বার্মা থেকে 'কারেন'-বন্দীরা। আসলে এটা বন্দীদেরই উপনিবেশ ছিল তখন। যুদ্ধের সময় জাপানীরা দখল করেছিল আন্দামান। তারাও অনেককে বন্দী করে সেলুলার জেলে রেখেছিল, অনেককে এখানে ফাঁসি দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে—বন্দীরা আর আসছে না বটে— আসছে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর দল। আর আমরা যারা এসেছি ? কেউ চাকরি করতে, কেউ ব্যবসা করতে। সব মিলিয়ে এখানকার মানুষরা হচ্ছে পাঁচমিশেলী। আদিবাসী আছে নানান রকম, তার মধ্যে সেণ্টিনেলী আর জারুয়ারা হিংস্র। পাল্টা আক্রমণ করে ওদের মেরে না ফেলে ওদের আস্তে আস্তে বশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যাইহোক, বেলা তিনটে নাগাদ ওরা বেরিয়ে পড়লো। ওদের আমরা ঘড়িঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। ফেরার পর জিমখানা মাঠের প্রান্তে এসে অনিমেষ একটু দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—সিগারেট খাবি ?

—দে।

সিগারেট ধরালাম, বললাম,—হঠাৎ দাঁড়ালি কেন ?

অনিমেষ বললে,—তোর বন্ধুদের কাছে এখানকার ইতিহাস বলতে বলতে মন হঠাৎ সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে চলে গেল। মনে আছে তোর সঙ্গে আমার কবে ছাড়াছাড়ি হলো ? ১৯৪১ সালে কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের দিনটির কথা মনে পড়ে ? সেই তোতে আমাতে পাগলের মত ছুটে জোড়াসাঁকো চলে গিয়েছিলাম ? মনে পড়ে সেই এলিট সিনেমার পাশের 'ওয়াই-ডাবলিউ-সি-এ' হলটির কথা, যেখানে ঐ সালেরই নভেম্বরে তোর লেখা নাটক হয়েছিল ? তার পরেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তুই চাকরি পেয়ে চলে গেলি ঘাটশিলায়, আর আমি চলে এলাম চাকরি নিয়ে আন্দামানে। তখন যুদ্ধেরই চাকরি—যদিও আমি ঠিক মিলিটারি ছিলাম না। থাকলে নির্ঘাৎ আমাকে বন্দী করতো জাপানীরা। জাপানীরা আন্দামান দখল করার হিড়িকে অনেকেই পালিয়েছিল—আমি পারিনি—আমি এখানকার এক সিন্ধী ভদ্রলোকের দয়ায় তাঁর গদিতে চাকরি পেয়েছিলাম। তাঁর দোকান ছিল ঘড়িঘরের কাছে। তাঁর দোকান এখনো আছে, তিনি অবশ্য বেঁচে নেই, ছেলেরা ব্যবসা দেখছে। তাঁর দোকান ছিল, কাঠের ব্যবসাও ছিল, 'উইমকো' ফ্যাক্টরিতে কাঠ চেরাই করে চালান দেওয়া। এই জিমখানার মাঠে দাঁড়িয়ে ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরের শেষ তারিখে নেতাজী যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। কিন্তু তিনি আসবার আগে জাপানীদের আমলে এখানে এমন একটি নৃশংস ব্যাপার দেখেছিলাম, যা মনে পড়লে আজও আমি শিউরে উঠি।

জানিস ভাই, সেদিন ছিল ছুটির দিন। ঘরে বসে বই পড়ছি, এমন সময় ঢ্যাঁড়া শুনলাম, যে যেখানে আছো এখ্খুনি ছুটে জিমখানার মাঠে জড়ো হও!

চমকে উঠলাম। কয়েকজন জাপানী সৈন্য মার্চ করে চলেছে। ওদের নিয়ম জানতাম। ঢ্যাঁড়া পড়লে যে যেখানে যেভাবে থাক, তখ্খুনি ছুটে যেতে হবে। নইলে বেত, বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো, কিম্বা বুটের লাথি। সেজন্য পাজামা আর গেঞ্জি পরা অবস্থায়, সার্টটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে গায়ে গলাতে গলাতে পড়ি-কি-মরি করে ছুটলাম! গিয়ে দেখি, আমার মতো বহু লোক ছুটে এসেছে। মাঠটাকে ঘিরে কাতারে কাতারে লোক। ভিতরে কিছু সঙ্গীনধারী জাপানী সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। আর মাঠের মাঝখানে একটি মানুষকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কে মানুষটি তা আমরা জানি না, তার পরণে একটা জাঙিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। একটা সৈন্য কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য একটি সৈন্য সজোরে চাবুক চালাচ্ছে তার সারা গায়ে। এক একটা চাবুক পড়ছে, আর মানুষটি চিৎকার করে উঠছে! সারা পিঠে চাবুকের চিহ্ন দড়ির মতো ফুঠে উঠেছে! আমি যখন গিয়ে পেঁছেছি, তখন মানুষটি প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে আর চিৎকার করছে! চারদিকের লোক নির্বাক হয়ে দেখছে, চোখে তাদের আতঙ্কের ছাপ, ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করছে না, প্রতিবাদ করা দূরের কথা! লোকটি একসময় সহ্য করতে না পেরে একটা হাত দিয়ে চাবুকের দণ্ডটি ধরে ফেলেছিল। আর যাবে কোথায়! দুজনে ওর সেই হাত ধরে হাতের কনুইয়ের কাছে মোটা বেটনটি গলিয়ে মট্ করে হাতটি ভেঙে ফেললে! সেই 'মট্' করা শব্দ আমরা সবাই শুনতে পেয়েছিলাম। সবার মুখ দিয়ে নিজেদের অজান্তেই একটা অস্ফুট চাপা শব্দ একযোগে বেরিয়ে এলো,—আ! সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সৈনিকদের চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠলো, একজন চিৎকার করে উঠলো—সাইলেন্স, খামোশ। জনতা চুপ। নিদারুণ আক্রোশে লোকটির অন্য হাতটিও ঐভাবে 'মট্' করে ভেঙে ফেলা হলো! মানুষটি তখন অর্ধমৃত—সে গোঙাচ্ছে! শুধু তার পা দুটো ছট্ফট্ করছিল বলি-দেওয়া ছাগলের মতো! জাপানীরা এটাকেও ঔদ্ধত্য মনে করে একটি পা ঐরকম ক'রে ভেঙে ফেললো। অন্য পাটাও ভাঙতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটলো। একটি জংলী তরুণী মেয়ে, পরণে ময়লা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরা, বুকে ময়লা জামা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—চিৎকার করে ছুটে গেল লোকটির দিকে। জাপানী সৈন্যরা হকচকিয়ে গিয়েছিল, নইলে মেয়েটি লোকটির কাছে পেঁছোবার আগেই তাকে ওরা ধরে ফেলতো। মেয়েটি লোকটির বুকে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল কী যেন ওদের ভাষায় বলতে বলতে, কিন্তু তখন দুদিক থেকে দুজনে ওকে ধরে ফেলেছে। মেয়েটির হাত ছাড়াবার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! যে সৈন্যটা চাবুক মারছিল, সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—আওরৎ কেয়া বোল্তা হ্যায়?

প্রথমে কেউ উত্তর দেয়নি বা দিতে সাহস পায়নি। সৈন্যটি তখন ধমকে উঠলো,—আওরৎ কেয়া বোল্‌তা হ্যায় ?

ওর কাছের সারির একটি বুড়ো মত লোক এবার উত্তর দিলে। বললে,—উসকো মরদ—সোয়ামী !

জাপানীটা এবার মেয়েটির দিকে তাকালো। তারপরে অপর সৈন্য দুটিকে ইঙ্গিত করলো। সৈন্য দুটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলো মেয়েটিকে। মেয়েটি তাড়াতাড়ি বসে লোকটির মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিলো। লোকটির গোঙানী তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু আমাদের মনে হলো, সে যেন বলছে, —পানি পানি !

সারির মধ্য থেকে কে যেন ছুটে গিয়ে কাছের কোনো ঘর থেকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের লোটায় জল নিয়ে এলো। জলটা দেখে মেয়েটি হাত বাড়ালো জলটা নেবে বলে। জলটা নিয়ে সে তার 'মরদ' বা 'সোয়ামী'র মুখে দেবে। কিন্তু জলের লোটাটি তার কাছে পৌঁছাবার আগেই সেই লোটার ওপর এসে পড়লো চাবুক-হাতে সৈন্যটির লাথি। জল গড়িয়ে পড়ে গেল মাটির ওপর ! আবার উঠলো জনতার মধ্যে চাপা আর্তনাদ,—আ !

মেয়েটির চোখ দুটিতে তখন যেন আগুন জ্বলে উঠলো। সে আর দ্বিরুক্তি করলো না, নিজেই তার বুকের জামা ছিড়ে ফেলে একটি স্তন গুঁজে দিলো লোকটির তৃষ্ণার্ত মুখখানার মধ্যে, তখন তার আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

চাবুক হাতে সৈন্যটি জনতার সারির দিকে একটু সরে এলো। বললে,—আওরৎ জংলী হ্যায় ?

সেই বৃদ্ধটিই উত্তর দিলো, –জী।

—সাচ্ ?

—সাচ্।

জাপানী সৈন্যটি বললে,—মগর ও আদমী তো জংলী নেহী।

বৃদ্ধটি বললে,—এইসা হোতা হ্যায় জী এহী মুলুক মে।

জাপানীটি কী ভাবলো কে জানে, গটগট করে সঙ্গের সৈন্যটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে জীপে উঠে চলে গেল। পাহারাদার জাপানী সৈনারা দাঁড়িয়ে রইলো। ওদের ভয়ে আর কেউ কাছে গেল না।

খানিক পরে একটি অ্যাম্বুলেন্স এলো। লোকটাকে আর মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

অবাক হয়ে ওর কাহিনী শুনছিলাম। ও থামতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—তারপরে কী হয়েছিলো জানো ?

—জানি, অনিমেষ বললে, –তুমি শুনলে আরও অবাক হবে, ঐ জংলী মেয়েটা লোকটার বউ ছিল না। লোকটাকে চিনতো না, দেখেওনি এর আগে। চ্যাঁড়া শুনে সবার সঙ্গে সেও ছুটে এসেছিল দেখবে বলে। ঐ নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে দেখতে আর সহ্য করতে না পেরে সে ঐ ভাবে পাগলের মতো ছুটে

গিয়েছিল ওর কাছে, 'আমার মরদ—আমার মরদ' বলে ওদের নিজস্ব ভাষায় চিৎকার করতে করতে। ভেবে দেখো ভাই, আমরা এতো লোক দাঁড়িয়ে, এতো সভ্য লোক, কিন্তু কারুরই বিবেক সাড়া দেয়নি, হয়ত বা ভয়ে আমরা সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে একটি জংলী মেয়ে কেমন করে ছুটে গেল ? ছুটে গেল এমন এক লোকের কাছে, যে ওদের জাতের লোক নয়, যাকে ও চেনে না, এমন কী, দেখেও নি কোনো দিন !

আমি হাতের সিগারেটটা 'অ্যাশ্-ট্রে'তে গুঁজে বলে উঠলাম,—কিন্তু তারপর কী হলো ? লোকটি বাঁচলো ?

অনিমেষ বললো,— দেখতে চাও তাকে ? এসো আমার সঙ্গে।

বলে আমাকে নিয়ে বাইরে এসে তালা দিলো দরজায়। তারপরে রওনা হলো ওর বাড়ির পিছন দিককার একটা পায়ে-চলা পথ ধ'রে।

এ-ও কাঠের একটি বাড়ি। ছোট্ট, ঝুপড়ি মতো। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে হয় ! একটি খাটিয়ার ওপর একটি মানুষ শুয়ে আছে, শীর্ণ মানুষ। গায়ে গেঞ্জি। তার দুটি হাতই কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। পরণে ছিল খাকির হাফ প্যান্ট। তাই দেখতে অসুবিধা হলো না, তার বাঁ-পাটা হাঁটুর কাছ থেকে বাদ। অন্য পা-টা ঠিকই আছে, তবে অস্বাভাবিক শীর্ণ। আর শিয়রের কাছে মেঝের ওপর বসে তার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল সেই মেয়েটি, যার নাম—নোভা।

আমাদের দেখে প্রথমটায় সে অবাক হলো, তারপরে উঠে দাঁড়ালো। অনিমেষ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো,—কেয়সা হ্যায় ইয়ুসুফ ?

লোকটা একটু হাসলো, বললো,—আচ্ছা হ্যায়, বাবুজী।

আমাকে দেখিয়ে অনিমেষ বললে,—হামারা দোস্ত।

ইয়ুসুফ বললে,—নমস্তে বাবুজী।

—নমস্তে।

অনিমেষ তার চাবির রিংটা নোভার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে,— চাবিটো রাখ দো, হাঁ ? হাম ঘুমনে যাতা হ্যায় দোস্তকো সাথ্।

তারপরে আরও দুটো দিন ছিলাম আন্দামানে। শুনলাম, জাহাজ এলে যে পারে সে-ই যায় জেটিতে জাহাজ দেখতে। অনেকটা পাড়া-গাঁয়ের পোস্টাফিসে ডাক আসার সময় জড়ো হবার মতো। যদি চেনাজানা কেউ জাহাজ থেকে হঠাৎ নেমে পড়ে,- যার চিঠি আসে না, সেই ব্যক্তির হঠাৎ চিঠি আসার মতো এখন অনেক জাহাজ হয়েছে, তখন ছিল এক এবং অদ্বিতীয় 'মহারাজা' জাহাজ অনিমেষরা 'মহারাজা' জাহাজ আসার খবর পেলেই জেটিতে ছুটতো, তার ওপরে আমাদের জাহাজ গিয়ে ওদের জেটিতে ভিড়লো, তা হোক না মালবাহী জাহাজ, এ-একটা নতুন খবর বটে ! তবু তো সবাই টের পায় নি, অনিমেষ বলেছিল, টের পেলে রীতিমত ভিড় হয়ে যেতো।

ওর সঙ্গে কত জায়গাই না ঘুরেছিলাম। 'করবাইন্স কোভ' নামক

মনোরম সমুদ্র-বেলা বা 'সী-বিচ' থেকে শুরু ক'রে 'চাথাম জেটি,' 'মধুবন' থেকে শুরু করে দুর্গম সুদূর দক্ষিণ আন্দামানের পাখীদের উপনিবেশ 'চিড়িয়াটাপু' পর্যন্ত। অবশ্য ফ্যাক্টরির জীপ আর লঞ্চ না পেলে এ-সব ঘুরে ঘুরে দেখার সুবিধা হতো না।

কিন্তু জাহাজে ওঠার পরে ফেরার পথে অনিমেষের সঙ্গে মনে পড়ছিল নোভার কথা, পাপুয়ার কিরণের কথা, ফিজির বাহিনজীর কথা, তাহিতির সেই অপরূপ মাতৃমূর্তির কথা!

॥ ৭

জাহাজ যখন মুখ ফেরালো দেশের মাটিতে গিয়ে পৌঁছবে বলে, তখন আমার মনে চিন্তা ঢুকলো, ঠিক কোথায় যাবে জাহাজ? ক্যাপ্টেন কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখনো উত্তর আসে নি। যদি সরাসরি কলকাতা যায়, তো কী হবে? কলকাতায় আমার বাবা-মা-ভাইরা আছে, তাদের সঙ্গে এই ফাঁকে দেখা হয়ে যাবে অবশ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তাও থেকে যাচ্ছে। বিশাখাপত্তনে আমি যে কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করতাম, তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতায়। আগেই বলেছি, আত্মীয়তা আছে তাদের সঙ্গে। তাদের অবশ্য না জানিয়েই জাহাজে উঠেছিলাম, জানালে যদি নিষেধাজ্ঞা জারী হয়? তাই ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে জানাজানি হয়ে যেতে পারে। যদিও তাতে খুব একটা অপরাধ হবে না এই কারণে যে, ঐ সময়, আমাদের যে-সব জাহাজী লাইনের সঙ্গে কারবার, সেইসব লাইনের একটি জাহাজও বিশাখাপত্তনে আসবে না। সুতরাং কাজের ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু তাঁদের আসল কথাটা না জানিয়ে এভাবে হঠাৎ বেরিয়ে পড়া,—এটা কি ঠিক হয়েছে? আমার বয়স তখন ছাব্বিশ-সাতাশ। সে-বয়সে যুক্তির থেকে আবেগটাই বড়ো হয়ে থাকে। যখন বিশাখাপত্তনের বন্ধু সনৎবাবু জাহাজে ওঠবার সুযোগটা করে দিলেন এই জাহাজের স্থানীয় এজেন্টকে বলে, যখন তিনি ছাড়া বাঙালী মহলের কাকপক্ষীও কেউ জানবে না এই ভরসা পেলাম, তখন সমুদ্রে ভেসে পড়তে দোষ কী? আমার বিশাখাপত্তনের বাসা তখন 'অবিবাহিতের গুহা', সেজন্য অন্য কোনো টানও ছিল না। কিন্তু যতই 'কলকাতায় জাহাজ না গেলেই ভালো হয়' বলে বারবার নিজের মনে আওড়াই, ততই আর একটা চিন্তার উদয় হয়। জাহাজ যাক না কলকাতায়, পাপুয়ার সেই 'কিরণ'-এর মা-বাবা-ভাই-বোনদের ঠিকানা যদি কোনরকমে পাওয়া যায়!

কিন্তু না, সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাহাজ ফিরে গেল যে বন্দর থেকে বেরিয়েছিল, সেই বন্দরেই। অর্থাৎ বিশাখাপত্তন থেকে এসেছিল, বিশাখাপত্তনেই ফিরে গেলো। অফিসে সহকারীদের বলে গিয়েছিলাম এবং

কলকাতায় হেড-অফিসেও ট্রাঙ্ক-কলে জানিয়েছিলাম, এখন তো জাহাজ নেই, আমি একটু ছুটি নিয়ে দাক্ষিণাত্য ঘুরে আসতে যাচ্ছি।

কিন্তু কানাঘুষা জিনিসটা সাংঘাতিক। কতরকমই না রটেছিল! আমি নাকি ছুটি নিয়ে অন্য কোনো কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করতে কোথাও গেছি, ইত্যাদি। তা, সনৎবাবুর সঙ্গে দেখা হতে জানা গেল, আসল কথা কেউ টের পায় নি।

জাহাজ থেকে নামলে দু-তিনদিন একরকম মাথা ঘোরা থাকে, সেটা সারতে-না-সারতেই চিঠির মাধ্যমে হেড-অফিস থেকে আদেশ এলো,—"অবিলম্বে 'কোকনদ' যাত্রা করো, সেখানে একটি ক্ষুদে জাহাজে কিছু কাজ পাওয়া গেছে। বিস্তৃত বিবরণ সঙ্গে দেওয়া গেলো। লোকজন সঙ্গে নেওয়ার দরকার নেই, তুমি একা গেলেই হবে।"

অতএব, আবার ডানা মেলো। এ অবশ্য সমুদ্র পেরুনো নয়, ট্রেনে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হয়ে খানিকটা মাত্র যেতে হবে, অন্ধ্রদেশের মধ্যেই। অমন যে গমগম-করা দীর্ঘ গোদাবরী-ব্রীজ, তা-ও পার হতে হবে না।

তথাস্তু। ছেলেবেলায় ভুগোলের বইতে একটা নাম মুখস্থ করতে হয়েছিল: 'কোকনদ।' 'কোকনদ' ভারতের পূর্ব উপকূলের একটি বিশিষ্ট বন্দর।

কিন্তু গিয়ে দেখি, নামেও মিল নেই, চেহারায়ও বিশিষ্ট বন্দর বলে মনে করবার হেতু নেই।

স্থানীয় নাম, 'নাকিনাদা',—ছোট একটি জনপদ, বন্দর বলতে যে চিত্রটি মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে, এ-বন্দরের সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই! দূরে, কখনো-সখনো দু-একটি জাহাজ এসে নোঙর করে। নৌকোর সাহায্যে সেই জাহাজ থেকে মাল খালাস করে নিয়ে আসতে হয়। খাতায়-কলমে এই জায়গাটাকেই বন্দর বলে। কিন্তু আমার চোখে গোদাবরী নদীর একটি শাখা জনপদের কাছেই যেখানে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলিত হয়েছে, সেখানটাই যা একটু বন্দর বলে মনে হলো। নইলে পুরোনো বাড়িঘর আর ছোট ছোট গলি-সমাকীর্ণ অন্ধ্রপ্রদেশের আর সব ক্ষুদ্র শহরের মতোই কাকিনাদাকে দেখতে। কোথাও নতুন নতুন বাড়িঘর বা অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তার নির্মাণ কার্য চোখে পড়লেও শহরের পুরোনো চেহারাটা ঢাকা পড়তে চায় না।

বলা বাহুল্য, আমার কাজের ব্যাপারে বন্দরের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ করতে হয় সব থেকে বেশি। এই বন্দরের কোলে জাহাজ ভেড়ে না বটে, কিন্তু পালতোলা নৌকো, যা সমুদ্রে যাতায়াত করে মাল নিয়ে এ বন্দর থেকে সে বন্দরে, তার ভিড় অবশ্য কম নয়। বিড়ির পাতা, তামাক পাতা, হরতুকি, ছাগলের চামড়ার স্তূপ,—এগুলিই ছিল প্রধান পণ্য। এই পণ্যই বয়ে নিয়ে আসতো ঐসব ছোট-ছোট পালতোলা কাঠের জাহাজ,—যাদের কর্ণধার বা ক্যাপ্টেনকে বলা হতো, 'নাওখোদা।' তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করার দরুণ শোনাতো, 'নাখোদা।' (কলকাতার 'নাখোদা' মসজিদের 'নাখোদা' নামটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়)।

এইরকম একটি কাঠের পালতোলা জাহাজের 'নাখোদা'র সঙ্গে আমাকে আলাপ-পরিচয় করতে হয়েছিল কাজের খাতিরে। থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম ছোট্ট একটি হোটেলের ছোট্ট একটি ঘরে। আহার্য অবশ্যই নিরামিষ।

বন্দরের ভিতরে বড়ো জাহাজ না এলেও জাহাজ চলাচল ও বহুবিধ কাজ-কর্মের জন্য এজেণ্টদের অফিস ছিল, তাদের মধ্যে গোটা তিন-চার নাম-করা অফিস, যাদের হেড অফিস কলকাতা বা মাদ্রাজ। তখন দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম, ও-সব কাঠের পালতোলা জাহাজের জন্যও নির্দিষ্ট এজেণ্ট আছে, এজেণ্টদের অফিস আছে। মিঃ রামলু এইরকমই এক এজেণ্ট-অফিসের ম্যানেজার। কাজের ব্যাপারে এঁর সঙ্গেই আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল সবার আগে। এক কথায়, আমার সেই কাকিনাদা-ভ্রমণের দিনে এই মিঃ রামলু আর কাঠের ঐ পালতোলা বড়ো নৌকো বা জাহাজের 'নাখোদা',—পোলাইয়াই হয়ে পড়লো আমার সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তি। বেশ মনে আছে, একদিন মিঃ রামলুর অফিস থেকে বেরিয়ে আমি পোলাইয়ার জাহাজে যাবো বলে বেরিয়েছি, অনেক সময় তাড়াতাড়ি করার জন্য রিক্সা নিতাম, সেদিন পথটুকু হেঁটেই পার হচ্ছিলাম। বড়ো রাস্তা পার হয়ে সর্টকাট করবো বলে একটা নাবাল জমির মধ্য দিয়ে চলেছি, পায়ে চলা সরু পথ, একধারে ছোট ছোট ঝুপড়ি,—কাচ্চাবাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মায়েরা গৃহকাজ করছে। বেলা তখন এগারোটা সাড়ে-এগারোটা হবে—রোদ্দুর বেশ প্রখর,—আমি শেষ ঝুপড়িটা পার হয়ে গেছি, এমন সময় কে যেন ডেকে উঠলো,—সাব ?

কণ্ঠস্বর বেশ ভারী, তাই মৃদুভাবে উচ্চারিত হলেও আমার কানে স্পষ্টই বাজলো ঐ ডাক।

স্বভাবতই একটু থমকে গিয়েছিলাম, যদিও জানতাম না আমিই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কিনা।

পরক্ষণেই আবার কানে এলো সেই ডাক,—সাব ?

এবার ফিরে তাকালাম। কালো চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দাড়ি কামানোই অভ্যাস, কিন্তু দিন দুই না-কামানোর দরুণ খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি বড়ো বড়ো, একটু গোলাকার ও আরক্ত। ভুরু দুটি ঘন। কপালের ডানপাশে সিঁথির কাছাকাছি একটা দাগ। পরনে লস্করদের মতো নীল প্যাণ্ট, গায়ে খাকি সার্ট। পোশাক খুবই ময়লা। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে বলে সেলাই করা,—লোকটাকে আগে দেখেছি বলে মনে পড়লো না।

লোকটি বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল একটা খুপরীর কাছ ঘেঁষে। মুখে বিনীতভাব, হাত দুটি জড়ো করা।

—সাব, আমি আপনাকে চিনি।

লোকটা অবশ্যই বাংলায় কথা বলেনি। বলেছিল হিন্দীতে। বোঝবার সুবিধার জন্য আমাকে বাংলাতেই বলতে হবে। হিন্দী-ভাষণ শুনেও একটু

চমকে গিয়েছিলাম। কারণ, ও অঞ্চলে হিন্দী-ভাষণ অন্তত তখনকার দিনে সুলভ ছিল না।

বললাম,—কিন্তু আমি ত তোমাকে চিনতে পারছি না!

বললো,—আমার নাম রাজু—পোতরাজু। আমি পোলাইয়ার জাহাজে কাজ করতাম। এই পোর্টে এসে ও আমার নোকরি খতম করে দিয়েছে—আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম,—সে কী! এ কী পারে নাকি? তোমাদের ইউনিয়ন আছে না?

মুখখানা কালো হয়ে গেল রাজুর। বললে,—আছে সাব। লেকিন আমাদের ইউনিয়ন কিছু করতে পারবে না বলেছে। আমি এমন একটা কাজ করেছি, যার জন্য নাখোদা আমাকে তাড়াতে পারে, বলার কিছু নেই।

—তবে আমাকে বলছো কেন?

লোকটা বিনয়ের ভঙ্গিতে আরও নুয়ে পড়লো, বললো,—আপনার কথা শুনবে সাব! আপনি পড়িলিখি আদমী। আপনাকে খুবই মান্য করবে।

বললাম,—কিন্তু তোমাকে আমি চিনি না, জানি না—তোমার কথা বলবো কী করে, অ্যাঁ?

লোকটা আমার কথা শুনে একেবারে পায়ের কাছে বসে পড়লো, বললো,—দয়া করুন হুজুর। আমি মারা পড়বো!

আমি একটু কঠোর স্বরেই বলে উঠলাম,—ওঠো বলছি!

লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

বললাম,—তোমার যদি এমন অবস্থা, তাহলে আমাকে না ধরে মিঃ রামলুর কাছে গেলে না কেন?

বললো,—গিয়েছিলাম সাব। তিনি কোনো কথা কানেই তুলছেন না। নাখোদা, যা বলবে বা যা করবে, তার ওপর তিনি কোনো কথা বলবেন না। সত্যি কথা বলতে কী, রামলু সাব আমাকে তাঁর অফিস থেকে দারোয়ান দিয়ে বার করে দিয়েছেন।

বলতে বলতে মানুষটার গলা ধরে এলো, চোখ ছলছল করে উঠলো।

বললাম,—দেখ, এ ব্যাপারে আমিও কিছু বলতে পারবো না। আমি নতুন লোক, এখানকার ধরন-ধারণও জানি না। তুমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছো, যা গুরুতর অপরাধ।

আমি হয়ত আরও কিছু বলতাম, কিন্তু লোকটা বাধা দিয়ে হঠাৎ মধ্য পথে বলে উঠলো,—সাব!

তার মুখে একটা বিস্ময় ও বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো।

বললাম,—না ভাই, আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি চললাম।

সে আবার বলে উঠলো,—সাব!

তার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত কাতরতা ফুটে উঠলো, আমি পা বাড়িয়েও থমকে

দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। সে বলতে লাগলো,—সাব, যদি কিছু মনে না করেন, এই ঝুপড়ির মধ্যে একবার আসবেন ? আপনি নিজেই সব দেখতে পারবেন—বুঝতে পারবেন—আমি হয়ত 'কসুর' করেছি, লেকিন সব কসুরেরই ত 'মাফি' আছে ?

আমি একটু অবাক হয়েই লোকটিকে দেখছিলাম। কৌতূহল যে না হচ্ছিল এমন নয়, কিন্তু কোনো বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারি এই শঙ্কায় কৌতুহলকে দমন করলাম। গম্ভীর গলায় বললাম,—না বাপু, আমার দ্বারা সম্ভব নয়, চললাম।

বলে, আর না দাঁড়িয়ে সোজা হনহন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমার গন্তব্যস্থানের দিকে। পিছন থেকে লোকটা বার কয়েক 'সাব-সাব' বলে ডাকতে লাগলো, কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করলাম না।

'নাবাল' জমি গিয়ে মিশেছে একটা অপরিসর রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে মেছুনীর দল মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে হেঁটে চলেছে, আমি তাদের পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলাম পোলাইয়ার কাঠের নৌকো বা 'জাহাজ'-এর দিকে।

একটু দূর থেকেই সারি সারি কাঠের জাহাজগুলি চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি জাহাজ থেকে দুটি করে তক্তা জেটির ওপর এসে পড়েছে। জেটিগুলি কাঠ দিয়ে তৈরি। জেটির নিচে কালো রঙকরা কাঠগুলির ওপরে সাদা সাদা অজস্র বিন্দুর ছাপ। শামুক বা ছোট শাঁখ লেগে ঐ অবস্থা হয়েছে কাঠগুলোর।

সমুদ্রের জল এখানে সামান্য স্তিমিত। ঢেউ তুলে কাঠের গায়ে আর তীরভূমির পাথরে এসে পড়ছে। দূর থেকে একটা কোলাহলও কানে আসে। মাথায় বস্তা নিয়ে যে কুলিগুলি তক্তার ওপর দিয়ে জাহাজ থেকে জেটিতে আসছে, তাদেরই কলরব একটা সম্মিলিত কোলাহল হয়ে বেজে উঠছে। জলের আছড়ে পড়ার শব্দের সঙ্গে মিশে ওদের কলরব একটা অদ্ভুত স্বরধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে।

আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম পোলাইয়ার জাহাজের দিকে। জাহাজের একটা নাম ছিল, মালয়ালম ভাষায় লেখা, জাহাজের পিছনে খোদাই করে তার ওপরে কালো রঙ করা। ( পরে জেনেছিলাম নামটা—বেল্‌পরত্তি —যার নাম জবা ফুল ) আর জাহাজের সামনে গলুইয়ের বাঁ দিকে ছিল ইংরেজি অক্ষরে খোদাই করা—'কে ৫৭৩৭'।

আমি জেটি থেকে তক্তার ওপর উঠে কুলিদের পাশ কাটিয়ে কোনক্রমে জাহাজের পাটাতনে নামলাম। পোলাইয়াকে বৃদ্ধ বলা চলে, কিন্তু শরীরের পেশীগুলি এখনো শিথিল হয়নি। দাড়ি গোঁফ নেই, মাথার চুল সামনের দিকে পাতলা, সেখানে যেটুকু চুল আছে, তা একেবারে সাদা। বেশ দীর্ঘ চেহারা, ঘাড়ের কাছটা সামান্য নুয়ে পড়েছে মনে হয়। পোলাইয়ার মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু দাগ—গায়ের তামাটে রঙ মুখে ঘোর কালো দেখায় ঐ দাগের জন্য। পোলাইয়ার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার জুলপি দুটি। কানের শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে, বেশ ঘন, কিন্তু আগাগোড়া পাকা চুলে ভর্তি।

আমাকে দেখে পোলাইয়া এগিয়ে এলো, বললে,—আসুন বাবুজী, ঘরে বসবেন চলুন।

ওর সঙ্গে ওর ঘরে অর্থাৎ কেবিনে গিয়ে বসলাম। কাজের কথাবার্তা শেষ করে আমি এলাম পোতরাজুর প্রসঙ্গে। বললাম,—পোতরাজু বলে কাউকে চেনো ?

ভ্রূ-কুঁচকে বললে,—পোতরাজু ? ও বুঝেছি, আমার জাহাজের মাল্লা ছিল। তা আপনি ওকে চিনলেন কী করে ?

বললাম,—পথে আসতে আমাকে ও ধরেছিল। ওকে নাকি তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো ?

—হ্যাঁ।

—কেন বলো ত ?

পোতরাজুর কথায় মুখখানা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল পোলাইয়ার। বললে,—সে অনেক 'শরম'-এর কথা বাবুজী। ওসব আপনার না শোনাই ভালো।

বললাম,—শোনবার আকাঙ্ক্ষা আমার খুব নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকে ও ধরলো কেন, সেইটাই ভাবছি।

পোলাইয়া উত্তর দিলো,—ওর ঐ স্বভাব। জাহাজে কে আসে না আসে সবই দূর থেকে লক্ষ্য করে। আপনি কেন, রামলু সাহেবকে পর্যন্ত ও গিয়ে ধরেছিল। কিন্তু থাক এসব কথা, আপনি চা খান বাবুজী।

ছোট্ট কাঠের জাহাজ, কিন্তু ভিতরে সব ব্যবস্থাই আছে। জাহাজের বাবুর্চি ইতিমধ্যে একটা ট্রে ক'রে আমাদের জন্য চা আর আলুর বড়া নিয়ে এসেছে। দেখেছি, আলুর বড়া চাটনি দিয়ে খেতে এরা খুব ভালবাসে।

আমি নিশ্চুপে চায়েই মন দিয়েছিলাম। পোলাইয়া একটা বড়ায় কামড় দিয়ে চায়ের কাপে একটু চুমুক দিলো। তারপরে বললে,—লোকটিকে ছাড়িয়ে দিয়ে আমারই কি কম ক্ষতি হয়েছে বাবুজী ? ওর মতো দক্ষ মাল্লা খুব কম পাওয়া যায় এই লাইনে। কিন্তু উপায় নেই, আইন আমাকে মেনে চলতেই হবে।

বললাম,—লোকটার কষ্টও ত খুব। এ-বাজারে চাকরি যাওয়া—

পোলাইয়া বললে,—চাকরি পাওয়া ওর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। এই যে সারি সারি সব জাহাজগুলি রয়েছে, যে-কোনো জাহাজে যাক, কেউ না কেউ ওকে নিয়ে নেবেই।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম পোলাইয়ার দিকে। বললাম,—তাহলে ও যাচ্ছে না কেন ?

পোলাইয়া একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। মুখখানা নিচু, থমথমে। আমার সন্দেহ হলো, বুড়োর চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো,—সাহেব, আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে আমার জাহাজে কাজ করতে এসেছিল। সেই থেকে আমার চোখের সামনেই বড়ো হয়ে উঠেছে। এ জাহাজের ওপর আমার যেমন মায়া, ওরও তার থেকে কম মায়া নয়। এই

জাহাজেই ত ও বড়ো হয়ে উঠেছে। কতো ঝড়-ঝাপটা থেকে এই জাহাজকে আমরা দু'জনে বাঁচিয়েছি। তরতর করে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, শক্ত হাতে দরকার হলে এর হাল ধরতেও সাহায্য করেছে।

বললাম,—বুঝলাম। কিন্তু বাঁচতে ত হবে! অন্য জাহাজে চাকরি নিক। সে সবও ত এই ধরণের জাহাজ।

পোলাইয়ার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এলো, বললে,—ওর দুঃখটা বুঝি, কিন্তু আমারও উপায় নেই। আইন-কানুন আজকাল বড়ো কড়া। এককালে জাহাজে 'নাওখোদা'ই ছিল আইন। সে যা করতো, তাতে কারুর কোনো কথা বলার এক্তিয়ার ছিল না। তখন আমিও অনেক বে-আইনী কাজ করেছি। কিন্তু এখন আর পারি না। অন্য মাল্লারা গিয়ে ঠিক নালিশ করে আসবে। সে বড়ো ঝঞ্ঝাট। বুড়ো বয়সে আর ঝুট-ঝামেলা সহ্য হয় না।

বলে, একটু থেমে নিজেই শুরু করলো পোলাইয়া,—আমরা দরিয়ায় ঘুরে বেড়াই, ছোট-ছোট বন্দরে আসি যাই সওদা নিয়ে। দূরপাল্লা আমাদের নয়, বড়ো জোর সিংহল, কিম্বা মালদ্বীপ, কি লাক্ষা দ্বীপ। কিন্তু তবু ত দরিয়ার মানুষ আমরা। বন্দরে গিয়ে জাহাজ যখন ভেড়ে, মাঝি-মাল্লারা যে কলের জাহাজের মাল্লাদের মতো একটু-আধটু ফুর্তি-টুর্তি না করতে যায় এমন নয়। আমার মতো বুড়ো হাবড়াদের কথা ছেড়ে দিন, জোয়ান মানুষরা একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদ করবে বই কি। সেটা কি খুব দোষের?

বলে উঠলাম,—সে ত খুবই স্বাভাবিক। এ রকম কোনো দোষের জন্যই কি ওকে তুমি শাস্তি দিয়েছো পোলাইয়া?

মাথা ঝাঁকিয়ে বুড়ো বলে উঠলো,—না সাহেব না। অমন দোষ-টোষ একটু-আধটু সবার আছে—ওর জন্য কোন্ মাল্লা আর অফিসে যাবে নালিশ করতে?

অবাক হয়েই বললাম,—তবে?

পোলাইয়া বলতে লাগলো,—সাহেব ছেলেটা আমার এমন ছিল যে, বন্দরে জাহাজ ভিড়লে সব মাল্লারা যখন আমোদ-আহ্লাদ করতে যেতো, ও তখন আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতো না। আমার কাছে ব'সে ব'সে 'সজরুতল মুনতাহার'-এর কাহিনী শুনতো।

—সেটা আবার কী?

পোলাইয়া বললো,—আমাদের দরবেশদের কাছ থেকে শোনা। বেহেস্তে একটা গাছ আছে। সে গাছের পাতায় আমাদের প্রত্যেকের নাম লেখা আছে। সেই নাম-লেখা পাতাটি যখন খসে যাবে, তখন আমাদেরও দুনিয়ার খেলা ফুরিয়ে যাবে। বুঝেছেন তো সাহেব? প্রত্যেকের নাম-লেখা এক-একটা পাতা। এক পাতায় দুটো নাম থাকে না।

বললাম,—বাঃ! সুন্দর ত!

পোলাইয়া তার কথার ঝোঁকে বলতে লাগলো,—এইরকম ছেলেকে নিয়ে আমি বিপদেই পড়েছিলাম সাহেব। ওর বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ হয়েছে,

আমি ওর জন্য একটি 'বহু' ঠিক করলাম। নেগাপট্টম থেকে একটি গরিবের মেয়ে জোগাড় করলাম, মেয়েটির বাপের খবর কেউ বলতে পারলো না। মা ছেলেবেলায় মারা গেছে, মানুষ হয়েছে এক পাতানো মাসীর কাছে। মানুষ হয়েছে মানে মাসীর সংসারে দাসী-বাঁদীর মতো খেটেছে। মাসী মেয়ে দিতে রাজী হলো এক কাঁড়ি টাকার বিনিময়ে। আমি মেয়েটাকে সোজা জাহাজে এনে রেখেছিলাম সাহেব। এটা বে-আইনী কাজ। তবে, তখনকার দিনে 'নাওখোদা'র ওপরে কেউ কথা বলতে পারতো না। ভাবলাম, মেয়েটাকে নিয়ে ত যাই, পরের বন্দরে নেমে ওর সঙ্গে শাদীর বন্দোবস্ত করবো। ছেলে প্রথমটায় বিগড়ে গেলেও পরে রাজী হলো। পরের বন্দর ছিল মুসলিপত্তন। সেখানে ওর শাদী দিলাম। কিন্তু যে কথা আমরা আনন্দের হিল্লোলে একবারও ভাবিনি, সেটাই সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। শাদী ত দিলাম, বউটাকে রাখবো কোথায়? কার কাছে? আমরা ত দরিয়ার মানুষ। এক, ওকে জাহাজ থেকে সরিয়ে যদি ঐ মুসলিপত্তনেই সংসার পেতে দেই? কিন্তু সে প্রস্তাবে ছেলে রাজী হয় না। সে দরিয়ার মানুষ, দরিয়া ছেড়ে যাবে কেন? সেইজন্য আবার 'গয়েরকানুনি' বা বে-আইনী কাজ করলাম। মেয়েটাকে শাদীর পরেও জাহাজে রেখে দিলাম। ঠিক করলাম, নেগাপট্টম যখন যাবো, তখন মেয়েটাকে ঐ মাসীর বাড়িতেই রেখে দেবো। ছেলে টাকা দেবে তার বউয়ের জন্য, তাহ'লে আর তাকে রাখতে আপত্তি কি? কিন্তু বাবুজী কার্যক্ষেত্রে তা হলো না। মাসী রাখতে রাজী হলো না। আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে সোমত্ত বউকে একা-একা রাখাও ঠিক নয়। ওর জানাশোনা পাড়া-পড়শীরাও বারণ করলে। বললে,—দিনকাল ভালো নয়—যদি কোনো বিপদ ঘটে? আমরা আর কতো পাহারা দিতে পারবো? ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তারও বোধহয় তেমন ইচ্ছা নয়, অগত্যা ওকে জাহাজেই রাখলাম। আপনাকে বলবো কী সাহেব, আগাগোড়া ব্যাপারটা বে-আইনী হলো। অনেক মাল্লা হৈ-চৈ করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো আমরাও বউ এনে জাহাজে রাখবো।

অবশ্য তা তারা করে নি শেষপর্যন্ত। সত্যিকথা বলতে কী তারা কেউ শাদী করবার লোকও নয়। তারাও মিছিমিছি হৈ-চৈ করতো, আমিও মুখ বুজে সব সহ্য করতাম। এই ভাবে দু-দুটো বছর কেটে গেল। আমার বুড়ো বয়স, আমার মনটা খুঁত-খুঁত করতো। এখনো পর্যন্ত একটি ছেলে কোলে এলো না বউটার। কিন্তু বলার কিছু নেই সবই খোদার ফজলে হয়। ততদিনে মাল্লাদের হৈ-চৈ অনেক কমে এসেছে। মেয়েটা সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথাবার্তা বলতো। জাহাজের অনেক রান্নার কাজ অনেক সময় নিজের হাতেই করতো, শাড়ির আঁচলটা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে ঐ পাটাতনের ওপর ঘোরাঘুরি করতো, মাল্লাদের কাজে পর্যন্ত সময় সময় সাহায্য করতো। আমার ভালোই লাগতো দেখতে। ও যেন জাহাজেরই একজন হয়ে গেছে। সাহেব, খোদার ফজলে সবই ভালো চলছিল, ছেলেটারও মন আনন্দে ভরপুর ছিল। একবার

টিউটিকোরিনের কাছে আমরা ঝড়ে পড়ি, জাহাজ ভেঙে পাল ছিঁড়ে সে এক নিদারুণ অবস্থা। কোনক্রমে তীরে এসে ভিড়েছিলাম। টিউটিকোরিনে জাহাজ মেরামতির জন্য আমাদের এক মাসের ওপর আটকে থাকতে হয়েছিল। আমি জাহাজের মেরামতি নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, অন্য কোনো দিকে মন দেবার উপায় ছিল না। ছেলেটাও সব সময় আমার কাছে থাকতো, আমার সঙ্গে খাটতো। জাহাজ মেরামতি হবার পর জাহাজে মাল ভর্তি করে আবার আমরা যেদিন দরিয়ায় ভাসলাম, সেদিন হঠাৎ আবার হৈ-হৈ পড়ে গেল, মেয়েটার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ততক্ষণ আমরা দরিয়ার অনেকটা মধ্যে এসে পড়েছিলাম। সাহেব, আবার আমি বে-আইনী কাজ করলাম। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার টিউটিকোরিনে। একটু দূরে নোঙর ফেলে ছোট নৌকো করে কয়েকজনকে পাঠালাম তীরের দিকে! তার মধ্যে অবশ্য ছেলেটিও ছিল। ওরা ঘণ্টা তিনেক খোঁজাখুঁজি করলো। তারপরে হতাশ হয়ে ফিরে এলো। মেয়েটির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। কী বলবো সাহেব, ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বড়ো কষ্ট হয়েছিল সেদিন, কিন্তু কী আর করা যাবে? কেউ কোনো খোঁজই দিতে পারলো না। আমি আর কতক্ষণ জাহাজ আটকে রাখতে পারি? বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হলো। দিন কতক ছেলেটা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ালো, তারপরে আগের মতোই কাজে মেতে গেল। আমি যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে ডেকে আরও খোঁজখবর নিতে লাগলাম। কেউ কোনো হদিশ দিতে পারলো না। বউটা কি বেঘোরে মারা গেল, না কোনো শয়তানের খপ্পরে পড়লো কিছুই বুঝতে পারলাম না। সাহেব, এইভাবে পুরো বরষ কেটে গেল। এর মধ্যে দু-দুবার টিউটিকোরিনে গেছি, আমি নিজে খোঁজখবর নিয়েছি, কিন্তু কোনো হদিশ পাইনি। ছেলেটা নিজেও কি খুঁজেছে কম? শেষপর্যন্ত আমি ওকে বললাম,—বেটা, যা হবার তা হয়ে গেছে, তুই আর একটা শাদী কর, আমি মেয়ে জোগাড় করছি। কিন্তু ছেলে বেঁকে বসলো, কিছুতেই শাদী করলো না। পীড়াপীড়ি করতে বললে,—আমরা দরিয়ার মানুষ, মাটির মানুষ কি আমাদের কাছে বাঁধা পড়তে চায়, না বাঁধা পড়তে পারে? তুমি আর ওসব চেষ্টা করো না। না সাহেব, আর আমি সত্যিই ওসব চেষ্টা করিনি।

দিন কাটতে লাগলো। দরিয়ার বুকে সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়। ছেলেটার কাছে ততদিনে আমাদের এই জাহাজটা যেন প্রাণের থেকেও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। কাজের লোক ছিল, কাজ করতো প্রাণমন দিয়ে। কিন্তু এরপর জাহাজটা যেন ওঁর দিল হয়ে দাঁড়ালো। বুড়ো মানুষ, প্রথমটায় বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলাম। মেয়েটার স্মৃতি জাহাজটার সারা গায়ে ছড়ানো সেইজন্যই জাহাজটা ওর দিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলতে বলতে বৃদ্ধের গলা এই সময় ধরে এলো। রুদ্ধ আবেগ তার কণ্ঠরোধ করলো। আমি বললাম, পোলাইয়া আমি বুঝতে পারছি, কতো ভালোবাসো তুমি পোত্তরাজুকে। কিন্তু—

বৃদ্ধ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগলো,—বাবুজী, আমাদের ভালোবাসার আর দাম কতটুকু ? আমি জানি, কেন ও এই জাহাজেই আসতে চায় ? এই জাহাজে যে ওর সেই বউটির স্মৃতি জড়ানো ! তাকে হারালেও তার স্মৃতি নিয়ে ও বেঁচেছিল এই জাহাজে। এরপর থেকে জাহাজ যখনই কোনো বন্দরে ভিড়তো, সবাই নামতো, ও কখনো নামতো না।

—একেবারেই না ?

বৃদ্ধ বললে,—একেবারেই না বলা ভুল। ওর বন্ধু-বান্ধবরা জোর করে কখনো-সখনো টেনে নামাতো, আর তাছাড়া আমিও বলতাম। এভাবে মনমরা হয়ে একটা মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে ? কিন্তু সাহেব, ওর মন চাইতো না, ওর মন এই জাহাজটা ঘিরেই ঘুর ঘুর করতো। আমি বুঝি সাহেব, স্মৃতি এমনই জিনিষ !

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আমি বললাম,—তবুও ওকে তুমি তাড়িয়ে দিলে ?

বৃদ্ধ বললো,—হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিলাম। ওর কষ্ট হবে, তবু ও তা সহ্য করুক, সহ্য করতে করতে একদিন যদি ও স্মৃতির বাঁধন কাটাতে পারে, ত আমি বলছি সাহেব, নতুন করে ও আবার বেঁচে উঠবে, আবার হয়ত ঘর-সংসার করবে।

বললাম—তাহলে এইটাই আসল কারণ ? বে-আইনী ব্যাপার-ট্যাপার যা বলেছিলে, সেটা কিছু নয় ?

বৃদ্ধ জোর দিয়ে বললে, কারণ দুটোই সমান। বেআইনী ব্যাপারটাও তুচ্ছ করবার বিষয় নয়।

বললাম,—আচ্ছা পোলাইয়া, এইবার বলো ত এই বে-আইনী ব্যাপারটা কী ? কী ও করেছিল ? কোনো নারীঘটিত—

পোলাইয়া বাধা দিয়ে উঠলো, তাহলে ত বাঁচতাম সাহেব ! আমি চাইছিলাম যেমন করে ওর জীবন থেকে ওর 'দিল'কে কেউ কেড়ে নিয়ে গেছে, ও-ও তেমনি অন্য কারুর 'দিল'কে নিয়ে আসুক, আমি যেমন করে পারি জাহাজেই তাকে লুকিয়ে রাখবো।

আমি কৌতূহলে উদ্বেল হয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, তাহলে তোমার ধারণা, ওর বউকে কেউ ছিনিয়েই নিয়ে গেছে। বেঘোরে মারা পড়েনি ?

—হ্যাঁ বাবুজী, আমার তাই-ই বিশ্বাস—বৃদ্ধ বললে, এর কোনো প্রমাণ পাইনি, তবু আমার মন বলে, এটাই সম্ভব। টিউটিকোরিনে কেউ ওর বউকে ভুলিয়ে বা জোর করে নিয়ে চলে গেছে। বেঘোরে সে মরে নি, তাহলে সে খোঁজটা কেউ না কেউ পেতোই।

একটুক্ষণ থমকে থেমে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জাহাজে কে এক মাল্লা কার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে। জলের ওপর দিয়ে সেই ডাক কেঁপে কেঁপে তীরের দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো সাড়া ভেসে আসছে না।

বললাম,—পোলাইয়া তোমার কথা বুঝলাম। এবার বলো ত, কী ওর অপরাধ, যার জন্য তুমি ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছো?

পোলাইয়া উত্তর দিলে,—ছেলে-চুরি। আমাদের আগের পোর্ট ছিল মাদ্রাজ। সেখান থেকে জাহাজ ছাড়বার পর দেখি একটা বছর দেড়েকের ছেলেকে ও চুরি করে এনে জাহাজে লুকিয়ে রেখেছে। ছেলেটা কাঁদে, কিছু বলতে পারে না। ওকেও জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না। আমি রেগে ওকে চড় মেরেছিলাম সাহেব, তবুও বলছে না, এ কার ছেলে, কেমন করে ও নিয়ে এসেছে ছেলেটাকে?

অবাক হয়েই ওর কথা শুনছিলাম। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারি নি। তারপরে সম্বিত ফিরে আসতে বললাম, এর বেশি আর কিছু তুমি জানো না বোধহয়?

—না।

বলা বাহুল্য, আর আমি বেশিক্ষণ জাহাজে থাকি নি। আমার তখন যাওয়ার কথা ছিল মিঃ রামলুর অফিসে, কিন্তু সেখানে যাওয়া হলো না। আমি জাহাজ থেকে নেমে সেই নাবাল জমি দিয়ে হেঁটে সেই ঝুপড়িগুলির দিকে চলতে লাগলাম দ্রুত পায়ে। রাস্তায় তখন মেয়েদের ভিড় বেশি। বোধহয় মাছের নৌকো অনেকগুলি এসে পেঁাছেছে। মেয়েরা ঝাঁকায় মাছ নিয়ে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলেছে। আমি তাদের পার হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগলাম।

বোধহয় একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম। কে পোলাইয়া, কে পোতরাজু, কে তার বউ, আর কেই বা আমি! অথচ সেই মুহূর্তে আমার মন জুড়ে ওদের কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। জরুরী অফিসের কাজ মুলতুবী রেখে আমি 'অকাজ'-এর অভিমুখে চলেছি, এটা জানতে পারলে আমার মনিবরা খুশি হবেন না, কিন্তু আমিও নাচার। জীবন সম্বন্ধে আমার এই উদগ্র কৌতূহল সারাজীবনই আমার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে এনেছে, তবু আমি নিজেকে কখনো নিবৃত্ত করতে পারি নি, আজও পারছি না। কিন্তু থাক আমার এই আত্মবিশ্লেষণের কথা। কিছুদূর এগিয়ে আসবার পর আবার হঠাৎ কানে এলো সেই ডাক,—সাব?

চমকে তাকিয়ে দেখি, পোতরাজু।

বললাম, তুমি! কোথায় ছিলে?

—আপনারই সঙ্গে সাব। আপনারই পিছু পিছু আমি এসেছিলাম। জাহাজে ত আমাকে উঠতে দেবে না, নইলে জাহাজেও আপনার পাশে পাশে থাকতাম।

একটু থেমে তারপরে বললে,—আপনার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি বাবুজী। আপনি বাঙালী।

—বাঙালী ত কী হয়েছে?

উত্তর দিলে,—বাঙালীদের দিল আছে। তারা লোকের দুঃখ বুঝতে পারে।

একটু হাসলাম, বললাম,—এ খবর তোমায় কে দিলে ?

—শুনেছি সাব।

চলতে লাগলাম ওর সঙ্গে। চলতে চলতে বললাম, তোমার সেই ঝুপড়িতে তুমি কী দেখাতে চেয়েছিলে, পোতরাজু ?

—আসুন বাবুজী, দেখুন। আমি কি সত্যিই কোনো কসুর করেছি ? আপনিই বিচার করুন।

ওর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের ঝুপড়ি অঞ্চলে এলাম। এদিক-ওদিক কয়েকটি স্ত্রীলোক নজরে পড়লো, কেউ কাপড় শুকোতে দিচ্ছে, কেউ অন্য টুকিটাকি কাজ করছে। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে তারা আবার যে যার কাজে মন দিলো।

পোতরাজু একটা ঝুপড়ির আগড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে আমাকে বললে, আসুন সাব।

মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ছোট্ট একটা ঝুপড়ি ; একটা বেড়ার কাছে মাথা রেখে টান টান হয়ে শুলে পা গিয়ে আর এক বেড়ার গায়ে ঠেকবে। জানালা বলে কোনো পদার্থ নেই। একপাশে হাঁড়িকুড়ি, অন্য পাশে একটা চাটাই আর ময়লা কাঁথা পাতা। তার মধ্যে একটি বছর দেড়েকের রোগা ছেলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সারা শরীরে কাঁথা চাপা দেওয়া, মুখখানি শুধু বেরিয়ে আছে। মাথায় চুল খুব কম। এক কথায় ছেলেটাকে দেখতে আদৌ সুন্দর নয়।

বললাম,—তোমার সব কথা আমি শুনেছি পোতরাজু, ছেলেটিকে মাদ্রাজ থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছো ?

পোতরাজু আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপরে মুখ নিচু করলে। থমথমে মুখ।

বললাম—উত্তর দিচ্ছ না যে ?

পোতরাজু মুখ তুললো। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই আগড় ঠেলে আরেকজন কে যেন ঢুকলো। মুখ ফেরাতেই দেখলাম একটি স্ত্রীলোক। বাইরে যারা কাজ-টাজ করছিল, তাদেরই একজন। আমাকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়েই একপাশ ঘেঁষে ছেলেটার কাছে গিয়ে কোনক্রমে বসলো। হাতে একটা বাটি, বার্লিটার্লি কিছু হবে বোধহয়।

মেয়েটির পরণে একটা আধ ময়লা সবুজ শাড়ি, গায়ে বিবর্ণ হয়ে আসা কালো রঙের জামা, হাতে কয়েক গাছি করে কালো রঙের কাঁচের চুড়ি। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল এলোমেলো ক'রে বাঁধা। গায়ের রঙ কালো, মুখে একটা কমনীয় ভাব আছে। মাঝারী চেহারা। চোখের নিচে যেন কাজলের একটা সুক্ষ্ম রেখা চোখে পড়লো।

আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। হঠাৎ কানে এলো ওদের ভাষায় মেয়েটি পোতরাজুকে মৃদু গলায় কী যেন বললে।

পোতরাজু তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে একটা ছোট চৌপায়া এগিয়ে এনে আমাকে বললে—বসুন সাব।

বললাম,—না পোতরাজু। বরং বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলে আর দাঁড়ালাম না, আগড় ঠেলে নিজেই আগেভাগে চলে এলাম বাইরে। আমি জানি, পোতরাজু আমার পিছন পিছন বেরিয়ে আসবে। আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, আমার উদ্দেশ্য ওদের ঝুপড়ি এলাকা ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় উঠে পড়া। কিন্তু রাস্তায় পড়বার আগেই পোতরাজু ডেকে উঠলো,—সাব?

মুখ ফিরিয়ে বললাম,—ওপরে উঠে এসো, বলছি।

ও আর কথা বললো না, আমার পিছনে নিশ্চুপে আসতে লাগলো।

বড় রাস্তায় উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি ছোট্ট 'কালভার্ট" বা সেতুর উপরিভাগ চোখে পড়লো। বললাম, এসো পোতরাজু, এখানে বসা যাক, বলে ওকে নিয়ে সেই কালভার্টের ওপরে বসলাম। পাশেই গোটা তিনেক তালগাছ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জটলার ভঙ্গিতে। রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেল, রিক্সা, মাঝে মাঝে দুটো-একটা মটোরও ছুটে যাচ্ছে। পথচারীর ভিড়ও আছে, তবে তারা যে-যার উদ্দেশে চলেছে, আমাদের দিকে তাকাবার অবকাশ তাদের নেই! পোতরাজু বসেনি, আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিনীত ভঙ্গিতে।

বললাম,—পোতরাজু, ও ছেলেটাকে তুমি চুরি করে নিয়ে এসছো কেন? ঐ মেয়েলোকটিই বা কে?

পোতরাজু বললে,—আমার কথা আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? পোলাইয়া?

—হ্যাঁ।

পোতরাজু ভ্রূদুটো কুঞ্চিত করে বললে—কিন্তু ও তো কাউকে কোনো কথা বলে না।

বললাম,—বলবেই বা কী? কতটুকুই বা জানে? ছেলেটাকে মাদ্রাজ থেকে এনেছো, কে ঐ ছেলেটা, কার ছেলে, তুমি চুরি করলে কেন, এসব ত কিছুই তাকে বলোনি।

পোতরাজু বললে, বলবার উপায় ছিল না।

বললাম—বেশ। কিন্তু আমাকে না বললে আমি সব বুঝবো কী করে?

ও একটু চুপ করে রইলো। মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলো।

বললাম, পোতরাজু, ঐ মেয়েটি কে? তোমার সেই বউ?

ও একটু চমকে উঠলো, তারপরে তাড়াতাড়ি বললো,—না বাবু—না।

—তবে?

পোতরাজু বললো, সাব, আপনাকে আমি বলতে পারি, কিন্তু আর কাউকে বলবেন না, পোলাইয়াকেও না। ওরা জানে, আমি ছেলে চুরি করেছি, ব্যস, সেটুকুই জানুক।

বললাম,- তাতে ত তোমারই ক্ষতি। ও তোমাকে জাহাজে নেবে কেন, সব কথা না জানলে না বুঝলে?

ওর মুখে একটা ক্লিষ্ট ভাব ফুটে উঠলো, কাঁপা গলায় কোনক্রমে বললে—সাব, ব্যাপারটা এমন যে আমি কিছুতেই ওকে বলতে পারবো না। বললে বুড়োর বুকের এমন একটা জায়গায় গিয়ে ব্যথাটা বাজবে যে, বুড়ো হয়ত আর বাঁচবেই না!

ওর চোখের দিকে তাকালাম। এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর বললাম—আচ্ছা, আগে বলো ত ঐ ঝুপড়ির মধ্যে যাকে দেখলাম সে মানুষটি কে? তোমার কেউ হয়?

—না সাব—পোতরাজু বললে,—আমার কেউ হয় না। বাচ্চাটার জ্বর হয়েছে বলে অত সেবাযত্ন করছে। তবে ঝুপড়িটা ওর নিজের।

বললাম,—তুমি কি ওরই সঙ্গে ঘর বেঁধেছো, জাহাজ ছাড়বার পর?

ও যেন মুহূর্তে শিউরে উঠলো কথাটা শুনে। বললে, না সাব, না! ঘর বাঁধা আমার নসীবে নেই।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তাহলে মেয়েটি কে?

পোতরাজু বললে, ঐ যে ঝুপড়িগুলো দেখছেন, ও পাড়াটা ভালো না। ওখানে যারা থাকে, দিনের বেলায় কেউ কেউ নানান কাজটাজ করলেও রাতে ওদের চেহারা হয়ে যায় এক। ওরা—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, থাক, বুঝেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় হলো কী করে?

বললে,—আমার সঙ্গে পরিচয় কখনো ছিল না। বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘুরছি, কোথায় ওকে রাখা যায়। এই মেয়েটির সঙ্গে হঠাৎ আলাপ—এই রাস্তাতেই। দিনের বেলা—কোথা থেকে কী যেন সওদা করে ফিরছিল, আমি সেদিন জাহাজ থেকে নামছি ঐ বাচ্চাটাকে কোলে করে। বাচ্চাটা সেই সময় কাঁদছিল, কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না। মেয়েটার বোধ হয় মায়া হলো, কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো, ছেলেটা কাঁদছে কেন, কী হয়েছে, ইত্যাদি। এরই জের টেনে সে আমাকে শুদ্ধু টেনে নিয়ে গেল তার ডেরায়। শেষ পর্যন্ত তাকে সব বললাম, সে ছেলেটার সব ভার নিয়েছে, আমার আর ভাবনা নেই। এখন আমি আবার জাহাজে ফিরে যেতে যাই।

বললাম, পোতরাজু, তবুও সব কথা বলা হলো না। বাচ্চাটাকে যদি এভাবে বিলিয়েই দেবে, তাহলে মাদ্রাজ থেকে ওকে চুরি করে আনলে কেন?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পোতরাজু বললো, পোলাইয়াকে আপনি বলবেন না, বা ওদের কাউকেই বলবেন না, এই সর্তেই আপনাকে বলবো।

বললাম, বড়ো শক্ত সর্ত পোতরাজু! সব কথা পোলাইয়াকে খুলে বলতে না পারলে ও তোমাকে জাহাজে নেবে কেন?

পোতরাজু বললো, সে আপনি একটু জোর করে বললেই হবে সাব।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, মনে ত হয় না। তবু দেখা যাক, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

বললাম, যদি খুব তাড়া না থাকে ত চলো আমার ঘরে। রাস্তায় বসে কত বকবক করা যায় ? এসো।

বলে, ওকে নিয়ে সোজা চলে এলাম আমার হোটেলে। আমার ঘরটি খুলে দুজনে বসলাম। কফি আনিয়ে দুজনে খেতে লাগলাম। বললাম—এরপর বলো ত পোতরাজু, সত্যিকার ব্যাপারটা কী ?

পোতরাজুর মুখখানা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, যা সে কিছুকাল ধরে একা একা বহন করে আসছে। ওর বউ যখন বেরিয়ে যায়, তখন সে দুঃখ বহন করবার জন্য সহযোগী ছিল, সমব্যথী ছিল ওর হাহাকারকে অনুভব করার জন্য। কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে মাদ্রাজে জাহাজে ওঠবার পর থেকে ওর যা সহ্য করবার তা একা একাই করে গেছে, কারুর কাছে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি।

ওর মনের ভাব দেখে আমার এসব কথা মনে জাগছিল।

পোতরাজু বলতে লাগলো,—আমার বউয়ের কথা কতটুকু আপনি শুনেছেন জানি না। সে ছিল নেগাপট্টমের মেয়ে। তার আসল নাম বললে আপনার কানে খটোমটো লাগতে পারে, তাই আমি তাকে সখ করে যে নামে ডাকতাম, সে নামটাই বলবো! আশা। আশা নেগাপট্টমের নামও নয়, আমাদের দিককারও নাম নয়। আমার এক জাহাজী সাহাব বন্ধু কোথায় এক হিন্দী সিনেমা দেখেছিল, নায়িকার নাম ছিল,—আশা। তার মুখে সিনেমার 'কাহিনীটা' শুনতে গিয়ে ঐ নামটা খুব নতুন লেগেছিল। তাই আমি ভুলিনি নামটা। সেই নাম ধরেই শেষ পর্যন্ত বউকে আমি ডাকতে শুরু করেছিলাম। ভালো মেয়ে ছিল আশা, আমাদের জাহাজের সবাই ওকে পছন্দ করতো। ওর ছেলেমানুষীটা, ওর হাসির ধরণ, ওর কথা বলার ভঙ্গি শুধু আমার কেন, জাহাজের সবারই ভালো লাগতো। কিন্তু একবার টিউটিকোরিনে এসে ও হারিয়ে গেল। ওকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পোতরাজু এখানে একটু থামলো। তারপরে উদ্‌গত আবেগটাকে কোনক্রমে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলো, সাব, তাকে হারিয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। কী করে সে হারালো, কেমন করে হারালো, তা আমি কিছুই জানতে পারলাম না। আমাকে সে ভালবাসতো খুব, আমাকে ছেড়ে যে সে অমন করে একদিন চলে যাবে, আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। কিছুদিন পরে মনটা স্থির হতে ভাবতে লাগলাম,—কিন্তু গেল কার সঙ্গে ? জাহাজের মাল্লা যতজন ছিল ততজনই আছে, কেউ নেমে যায়নি। তাহলে ? সাব, এর পরে সবকিছু নসীবের খেলা বলে ছেড়ে আমি নিজের মনটাকে বাঁধলাম, কিন্তু বুড়ো পোলাইয়ার অবস্থা দেখে আমার আরও কষ্ট হতো। বুড়ো পোলাইয়া বউকে খুব স্নেহ করতো। ও-ই ত নিজের পছন্দ করা মেয়ে এনে আমার বিয়ে দিয়েছিল, সবার অমতে আমার বউকে ও জোর করে জাহাজে রেখে দিয়েছিল।

পোতরাজু থামলো। ওর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম, বললাম,—তারপর ?

পোতরাজু বললো,—তারপরেই অবাক কাণ্ড সব। বউকে হারানোর পর দু বছর কেটে গেছে, হঠাৎ আমরা গেলাম মাদ্রাজে। আমি জাহাজ থেকে কখনো নামতাম না, মাল্লাবন্ধুদের টানাটানিতে সেবার নামলাম মাটির ওপর। কী খেয়াল হলো কে জানে, ওদের সঙ্গে গেলাম হৈ হৈ করতে। সাব, এ ও নসীবের খেলা। একটা খুপরির মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আশার সঙ্গে। কঙ্কালসার চেহারা, চোখের নিচে কালি, কোলে একটা বাচ্চা। আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড সাব, আমার চোখে জল এলো না। আমার মনটা তখন কেমন অসাড় হয়ে গেছে। কোন রকমে একবার মাত্র পুছ করেছিলাম, শেষকালে তুই এই খারাপ জীবন বেছে নিলি আশা ?

আশার কান্না আরও বেড়ে গেল। তারপরে একটু শান্ত হবার পর বললে, আমি আর বাঁচবো না। রোজ রাত্রে আমার জ্বর হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে। একজন হাসপাতাল থেকে দাওয়াই এনে দেয়, দু একদিন কাশি কম পড়ে, তারপরে আবার যেই কে সেই।

বললাম, তুই আমার সঙ্গে চল আশা।

—কোথায়, জাহাজে ? আশা বললে, জাহাজে ফেরার উপায় থাকলে জাহাজ থেকে অমন করে পালিয়ে আসি সবার চোখ এড়িয়ে ?

—লেকিন, কেন ?

আশা বললে, তোমার সব কথা জানার দরকার নেই। আমি যখন টিউটিকোরিনে জাহাজ থেকে পালাই, তখন আমার পেটের ঐ বাচ্চাটা চার মাসের।

বাচ্চাটাকে ঘরের কোণে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেছিল, সেইদিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠলো, বললাম, তবে ত ও আমার ছেলে ?

আশা আমার চোখের দিকে তাকালো, তারপরে বললে,—না। তোমার ছেলে ও নয়।

মানে !

আশা বললে, সব জানতে চেয়ো না, দুনিয়ার সব কিছু জানা ঠিক নয়, কিছু কিছু আঁধারে থাকাই ভালো। আমি তোমাকে ছেড়ে জাহাজ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম কি সাধে ? অথচ বিশ্বাস করো, তোমাকে ভালবাসতাম সারা মন দিয়ে। কিন্তু শেষের দিকে এক মাস কী যে যন্ত্রণা পেয়েছি ! আমিও যন্ত্রণা পেয়েছি, সে লোকটাও যন্ত্রণা পেয়েছে। তবুও সে জানতো না যে, তারই সন্তান আমার পেটে।

—বলছো কী !

আশা বললে, টিউটিকোরিনে একাই পালিয়েছিলাম। তারপর পড়লাম

বদমাসের হাতে। তারা আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এলো মাদ্রাজে। এখানে দরিয়ার দিকে তাকাই, আর তোমার কথা ভাবি। আমি আর বাঁচবো-না।

বলে আবার সে কাঁদতে লাগলো। আমি তার চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। বললাম, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবোই। তুমি ভেবো না। আমার জমানো টাকা আছে।

সাব, আমি পরদিনই গিয়ে তাকে অনেক করে এক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলাম। গরীবদের হাসপাতাল। সেখানে আপনার মতো একজন বাঙালী বাবুর দয়া পেয়েছিলাম। তিনি আপনারই মতো জাহাজে আসতেন। আপনারই মতো 'সাব' বলে আমি তাঁকে ডাকতাম। তিনি কোশিশ না করলে ওকে হাসপাতালে দিতে পারতাম না। গরীবদের হাসপাতাল, পয়সা লাগে না। তবু আমার জমানো টাকা আমি ওঁর আঁচলে বেঁধে দিয়ে এসে-ছিলাম।

পোতরাজু থামলো।

বললাম,—ওর সেই বাচ্চাটাকে বুঝি তুমি নিয়ে এসেছিলে?

—হ্যাঁ।

বললাম,—তাহলে চুরি করেছো বলে রটলো কেন? সব খুলে বললেই পারতে পোলাইয়াকে।

—না সাব, পোতরাজু বললে—ছেলেটা পোলাইয়ার। আশা আমাকে শেষ পর্যন্ত সবই বলেছিল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি পোলাইয়াকে।

আমি চমকে উঠলাম, বলছো কী?

তেমনি শান্ত কণ্ঠে পোতরাজু বলতে লাগলো—হ্যাঁ সাব। কিন্তু এটা যে আমি টের পেয়েছি, জানলে বুড়ো নিজেকে আর জ্যান্ত রাখবে না, বিষ খেয়ে মরবে! তাই মার খেয়েও টুঁ শব্দ করি নি, তাড়িয়ে দিলেও মুখ ফুটে কিছু বলি নি, ছেলে কোলে রাস্তায় নেমে এসেছি।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

পোতরাজু বলতে লাগলো,—সাব বুড়োর দোষ নেই। সারা জাহাজে যতগুলো মরদ; ও একা মেয়েছেলে। আর তাছাড়া বুড়োর কাছে যেতো, বুড়োর সেবাযত্ন করতে আমিই বলেছিলাম। বুড়ো ওকে স্নেহ করতো, কিন্তু দরিয়ার বুকে জাহাজ, কোন সময় কী হয়ে যায় বলা যায় না। পোলাইয়া সারা জীবন শাদী করেনি—জাহাজ-জাহাজ করেই কাটিয়েছে, মাটিতে নেমে স্ফূর্তি করতে ওকে কখনো দেখিনি। লেকিন, নসীবের খেলা কে বলতে পারে? বুকের ভিতরটা পুড়ে গেলেও পোলাইয়ার ওপর আমি রাগ করিনি—তাকে দোষও দেই নি। আমি তার মনটাকে বুঝতে পারি সাব। বেশ বুঝতে পারি, আমার সঙ্গে ঐ ঘটনা ঘটবার পর পোলাইয়া মনে মনে কী যন্ত্রণাই না পেয়েছে! সে ত সাব শয়তান ছিল না, সে ছিল সাচ্চা মানুষ; কাউকে কিছু বলতেও পারতো না, নিজের কাজের অনুতাপে নিজেই পুড়ে মরতো। চার-চারটা মাস

তার এইভাবে কেটেছে। আশা তাকে টিউটিকোরিনে মুক্তি না দিলে এ যন্ত্রণা সে আর কতদিন সহ্য করতে পারতো কে জানে।

ও থামলো। বললাম,—বুড়োর ছেলেকে বুড়োর হাতে তুলে দিলেই তো পারতে।

পোতরাজু আমার চোখের দিকে তাকালো, বললো,—না সাব, তা হয় না। আমি জানতে পেরেছি বুঝলেই ও বিষ খাবে। আর তাছাড়া ছেলেকে নিয়ে ও রাখবে কোথায়? কে আছে ওর?

পোতরাজু ম্লান একটু হেসে বললে,—নসীবের খেলা দেখুন, নিজের ছেলেকে নিজের জাহাজে ও রাখতে পারলো না।

বললাম,—তাহলে আমি গিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলবো?

আমার হাত দুটো চেপে ধরলো পোতরাজু, বললো,—না সাব না, আমাকে আপনি কথা দিয়েছেন। আমাকে শুধু ওর জাহাজে নিতে বলুন।

বললাম,—আচ্ছা পোতরাজু, আশার যখন খোঁজ পেয়েছো তখন জাহাজে যেতে চাইছো কেন?

পোতরাজুর মুখখানা থমথমে হয়ে উঠলো, চোখের পাতা বুঝি ভিজে উঠলো। কাঁপা গলায় বললে,—সাব আশা আর নেই। হাসপাতাল থেকে খৎ এসেছে। সে যখন নেই, তখন জাহাজ ছাড়া আমার আর জায়গা কোথায় বলুন? ছেলের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। ঐ মেয়েটির দারুণ ছেলের শখ, ও ছেলেটাকে ঠিক ভালবাসবে। যত্ন করবে, মানুষ করে তুলবে। যখন কাকিনাদায় আসবো তখন ওকে দেখে যাবো, টাকা দিয়ে যাবো।

বলা বাহুল্য, পোতরাজুর শর্ত অনুযায়ী পোলাইয়াকে আমি সবকিছু খুলে বলতে পারি নি। আমার প্রস্তাবে সে কিছুতেই রাজী হয় না, অনেক বলা-কওয়ার পর জাহাজ ছাড়ার আগের দিন সে রাজী হলো। পোতরাজু উঠলো গিয়ে তার জাহাজে।

পরদিন মিঃ রামলুর অফিসে আমাকে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা দুজন জেটিতে যখন গিয়ে পেঁছিলাম, তখন দেখি জাহাজটা তীর ছেড়ে অনেকদূর চলে গেছে। দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে একটি পালতোলা কাঠের জাহাজ চলেছে।

মিঃ রামলু বললো—ঐ দেখুন পোলাইয়ার জাহাজ।

বললাম,—হ্যাঁ। পোলাইয়া আর পোতরাজুর জাহাজ।

মিঃ রামলু আমার কথাটা খেয়াল করেনি! করলেও আমি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না। ওর মতো নিঃসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শুধু ঐ সারস পাখীর মতো পালতোলা জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার আর করবার বা বলবারই বা ছিল কী?

জাহাজটা তখন ছুটে চলেছে সিংহল বা শ্রীলঙ্কার দিকে, আমি জানতাম

ওদের জাহাজ গিয়ে ভিড়বে 'ত্রিন্-কো-মাল্যো'তে—যার নাম সাহেবদের আমলে ছিল 'টিন্রকো মাল্লি !'

॥ ৮ ॥

আমার মূল কেন্দ্র ছিল বিশাখাপত্তন বা ওয়ালটেয়ার। সমুদ্রতীরে একটি সুন্দর বাড়ির ততোধিক সুন্দর ঘরে তখন ছিল আমার আস্তানা। পাঁচটি বড়ো বড়ো জানালা। সমুদ্রশিয়রী জানালার দিকে যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে দৃকপাত করতাম, দেখে মনে হতো জানালায় বুঝি নীল পর্দা ঝুলছে।

অর্থাৎ শুয়ে শুয়েই হতো আমার সমুদ্র দর্শন। সমুদ্র দেখতে দেখতে সমুদ্র ভ্রমণের ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক, তার ওপর যখন এক জাহাজী ঠিকাদার কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার হয়ে কাজকর্ম করছি।

বলা বাহুল্য, আর একটি সুযোগ বছরখানেকের মধ্যেই এসে গেল। এবার রওনা হলাম বোম্বাই বন্দর থেকে। বিশাখাপত্তনে তখন অন্তত মাস দুয়েক আমাদের কাজের জাহাজ আসার সম্ভাবনা ছিল না, তাই 'গোয়াতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি,' এই ধুয়ো তুলে বোম্বের বন্দরে একটি মালবাহী জাহাজে উঠে বসলাম কনিষ্ঠ কেরানীর সাময়িক চাকরি স্বীকার করে। জাহাজটি ছোট এবং একটি পরিচিত ইংরেজ কোম্পানীর।

জাহাজ ছিল বিলেতগামী। তা না হলে এরকম করে হেডঅফিসে প্রকৃত কথা না জানিয়ে ছুটে আসি ? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিলেত বা ইয়োরোপ যাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। সেক্সপিয়রের স্টাটফোর্ড-অন-অ্যাভন দেখার স্বপ্ন নিয়ে যখনই দেশের বন্দর থেকে নোঙর তুলেছি, তখনি শুনতে পেয়েছি জাহাজটি গতিপথ বদল করে কোন এক অখ্যাত দ্বীপের দিকে যাত্রার আদেশ পেয়েছে। জাহাজের যেবার বেলজিয়াম যাবার কথা, সেবার সে বড়ো জোর আলেকজান্দ্রিয়া, কি পোর্ট সৈদ, অথবা এডেন পর্যন্ত গিয়ে তার যাত্রা শেষ করতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে হতাশ হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু আজ মনে কোনো খেদ নেই। আজ জীবন সায়াহ্নের তটরেখায় দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি, যা পেয়েছি তা-ই কি কম ? যে যে-টুকু দিয়েছে, তা-ই আমার কাছে বিপুল সম্পদ !

যেমন ধরা যাক এডেনের কথা। এডেনের সেই ফুলওয়ালী মেয়েটিকেই কি ভুলতে পেরেছি ? এডেন বলতেই প্রথমে যার মুখ ভেসে ওঠে, সে হচ্ছে সেই ফুলওয়ালী মেয়েটি ! আমার কাছে সে এডেনের অন্যতম প্রতীক, রুক্ষ পর্বত আর মরুর বুকে অবিশ্বাস্যরূপে ফুটে ওঠা একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল !

এডেন যাবার পথে আরব সাগরে জাহাজের দোলানি ছিল সাংঘাতিক। প্রথম দিন অস্থির অস্থির করলেও পরে শরীর আমার ঠিকই ছিল। এডেনের খাড়ি বা 'গাল্‌ফ অফ এডেনে'র মুখের কাছে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা

'সকোত্রা'-দ্বীপের 'হাদিবা' বন্দরকে পাশে রেখে যখন এডেনের কাছাকাছি এসেছিলাম, সমুদ্র তখন শান্ত রূপ ধারণ করেছিল।

এই এডেনের সঙ্গে দুঃখময় একটি স্মৃতি বিজড়িত যা ভারতবাসী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত। ১৮৫৭-র সিপাহী-জাগরণের পরের কথা। মহারাষ্ট্রের এক তরুণের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা দুর্বার হয়ে জেগে উঠেছিল। পাহাড়ীদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে সেই তরুণ এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে ইংরেজ শাসকবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। এঁর নাম বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। লোকে বলতো দ্বিতীয় শিবাজী। ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসে এঁকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করলে ব্রিটিশ সরকার। বিচারে লাভ করলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। নির্ভীক বীর দ্বিতীয় শিবাজীকে হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে এই এডেনেই নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল কারাগারের কোনো নিভৃত কক্ষে। সেখানেই শেষ নয়, অমানুষিক নির্যাতন চলতো তাঁর উপর। অমন অটুট শরীর তাঁর ভেঙে পড়লো, কোনো চিকিৎসাও হলো না। তাঁর দেশবাসী, আত্মীয় স্বজন কেউ জানতে পারলে না তাঁর কথা, ১৮৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি দেহত্যাগ করলেন দ্বিতীয় শিবাজী।

আমাদের জাহাজ এসে বয়ার সঙ্গে বাঁধা পড়ে রইলো নীল জলরাশির ওপর। দূরে রুক্ষ পর্বতশ্রেণী দেখা যায়, তার পায়ের কাছে কোথাও কোথাও বালিয়াড়ির স্তূপ চোখে পড়ে। এই মরুসদৃশ বালুবেলারই ওপর গড়ে উঠেছে এডেন বন্দর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে জাহাজে এডেন পৌঁছেছিলেন ভোরবেলায়। তাই তিনি দেখেছিলেন, 'পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।'

অবসন্ন আমরাও হয়ে পড়েছিলাম। আমরা পৌঁছেছিলাম বেলা দশটা নাগাদ। কিন্তু আমার কাজকর্ম যখন চুকলো, তখন একটা বেজে গিয়েছিল।

ততক্ষণে চলে গেছে এজেন্টের প্রতিনিধি, পুলিশ ও কাস্টমস্। ওদের লঞ্চে করে আমাদের চীফ স্টুয়ার্ড আর কে কে যেন শহরে চলে গেছে।

সাদা সাদা সী-গাল পাখীগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল, আর একটি ছোট্ট মোটর-বোট নীল জলের মধ্য দিয়ে শুভ্ররেখা কেটে কেটে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলেছে। রেলিং ধরে সেই দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ চমক ভাঙলো একটা তীক্ষ্ম শিস দেওয়ার শব্দে। লক্ষ্য করে দেখলাম, পাঁচ নম্বর 'ফল্‌কা'র ( জাহাজের গহ্বর, যাতে মাল থাকে ) কাছ থেকে একটি লস্কর সমুদ্রের বুকে কী দেখে সজোরে শিস দিয়ে উঠলো। তার দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, জাহাজের পিছন দিক থেকে একটি ছোট পানসি করে জাহাজের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটি মেয়ে। দিনের পড়ন্ত আলোয় দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগছিল। পরণে নীল ওড়নার নিচে গোলাপী লম্বা জামা, টকটকে লাল রঙের সালোয়ার-জাতীয় পায়জামা। পানসিটার পিছন দিকে

দাঁড়িয়ে সে হাল চালনা করছিল দু'হাতে ধরে। পানসিটা গতিবেগ পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, আর সেই এগিয়ে চলার ছন্দে তার শরীরটা দুলছে।

দেখতে দেখতে সেই শিস দেওয়া লস্করটির কাছে জুটে গেল আরও লস্কর। সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো মেয়েটিকে। কারণ, অভিজ্ঞরা পরে আমাকে বলেছিল, এডেনে এ-রকম 'মেয়ে' দেখা একেবারে অভাবিত এবং বিস্ময়কর!

যাই হোক, পাঁচ নম্বর ফল্কাটা হচ্ছে পিছন দিককার সর্বশেষ ফল্কা। সুতরাং ওখান থেকে লস্কররা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটিকে। ওদের সঙ্গে একটি সমান্তরাল রেখায় মেয়েটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, আমরা দোতলায় জাহাজের ষ্টারবোর্ড সাইডের রেলিং-ধরে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, তার নিচে।

বলা বাহুল্য, রেলিং-এ আমি ততক্ষণে আর একা নই, আরও দু-চারজন অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে তরুণ ফোর্থ অফিসারটিও ছিল। সে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে একসময় অস্ফুট জড়িত গলায় বলে উঠলো, নাইস ষ্টাফ!

আমি তখন ফুল দেখছিলাম। কয়েকটা চুবড়ি বোঝাই ফুল। এখান থেকে গোলাপ বলে মনে হচ্ছে। ভারী সুন্দর ফুলগুলি, বেশ বড়ো। ঘোর লালও আছে, অপেক্ষাকৃত হালকা লালও আছে।

ফুল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেয়েটির মুখের ওপর রাখলাম। মেয়েটি অবশ্যই তরুণী, মুখখানিতে প্রসাধনের প্রলেপ হয়ত একটু আছে, কিন্তু আরক্তিম দেহ-বর্ণ, তীক্ষ্ম নাসিকা, আর বড়ো বড়ো দুটি চোখের দৃষ্টি, সব মিলিয়ে সেই গোধূলি লগ্নে মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দরীই মনে হয়েছিল!

কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মেয়েটি জাহাজে আসছে কেন? জাহাজের সাধারণ সিঁড়ি অর্থাৎ গ্যাঙ-ওয়ে ফেলা ছিল না, ফেলা ছিল পাইলট্স ল্যাডার বা দড়ির সিঁড়ি।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম, মেয়েটি দড়ির সিঁড়ির সঙ্গে তার পানসিটা বেঁধে দু-হাতে দড়ির প্রান্ত ধরে ঝুলতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে ওপরে উঠতে লাগলো।

জাহাজশুদ্ধ তখন রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। এমন কি ইঞ্জিন-রুম আর ষ্টোক-হোল্ডে যারা ডিউটিতে ছিল, তারাও খবর পেয়ে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় একে একে ওপরে উঠে আসতে লাগলো। কারুর মুখে কোনো কথা নেই, সবাই এদিক ওদিক থেকে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগলো বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে।

মেয়েটি আমাদের অদূরেই তিন নম্বর হ্যাচ বা ফলকার নিকটবর্তী জাহাজের রেলিং বা বুলওয়ার্কের কাছে সিঁড়ির সাহায্যে উঠে এলো। ওখানকার ডেকে দাঁড়িয়ে বোধহয় একটু দম নিলো। তারপরে আমাদের দিকে ফিরে অল্প একটু হাসলো, বললো, —হ্যালো!

আশ্চর্য! গলার স্বরটিও অদ্ভুত মিষ্টি! ফোর্থ প্রত্যুত্তরে 'হ্যালো' বলে

হাসতে গিয়েও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তার পরে একটু সময় নিয়ে গলার স্বর গম্ভীর করে বললো,—হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট ? কী চাও ?

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করে বললে,—ফ্লাওয়ার। ডোণ্ট লাইক ফ্লাওয়ার ?

ফোর্থ এবার হেসে ফেললো। সেই হাসিতে প্রশ্রয় পেয়ে মেয়েটি তার ঠোঁটের হাসিকে আরও বিস্তৃত করলো। ফোর্থ আবার গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। বললে,—কই, কোথায় তোমার ফুল !

মেয়েটি তির্যক দৃষ্টিপাতে ওকে যেন বিদ্ধ করতে চাইছিল। বললে,—নৌকা করে যখন আসছিলাম, তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখোনি ?

ফোর্থ ওর কাছে যায়নি, একটু দূরে থেকেই কথা বলছিল। একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলো ক্যাপ্টেনকে দেখা যাচ্ছে কি না। ক্যাপ্টেন ব্রিজে বা ডেকে কোথাও নেই, নিশ্চয় তাঁর ঘরের কোটরে বসে আছেন।

ফোর্থ তার পরে তাকালো জাহাজটির সামনে, পিছনে। এখানে ওখানে জটলা, যেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেছে লস্কররা। কেউ কোনো কথা বলছে না, কিন্তু সবারই লক্ষ্য ওই তরুণী ফুলওয়ালীর উপর। ফোর্থ সবার দিকেই একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তার পরে আবার তাকালো মেয়েটির দিকে। একটা হাত কোমরে রেখে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি।

আমাদের কাছে ততক্ষণে আরও কয়েকজন অফিসার এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তারা দর্শক মাত্র, ফোর্থ অফিসারের মতো এগিয়ে গিয়ে কথা বলার উৎসাহ তাদের মনে তখনো সঞ্চারিত হয় নি।

মেয়েটি বললে, আমাকে একটু সাহায্য করবে ?

ফোর্থ বললে, কী সাহায্য ?

—একটা দড়ি দেবে ?

—দড়ি ? দড়ি দিয়ে কী করবে ?

মুচকি হাসলো মেয়েটি, বললে, দেখো না কী করি !

বলতে বলতে মেয়েটি আবার রেলিং ধরে 'রোপ ল্যাডার' বেয়ে নিচে নামবার উপক্রম করলো। নিজের দেহটাকে রেলিং-এর উপর ন্যস্ত করে মুখ বাড়িয়ে আবার তাকালো ফোর্থ অফিসারের দিকে। বললে, আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। তুমি একটি লম্বা দড়ি নিয়ে তার একটি প্রান্ত নিচে—আমার কাছে নামিয়ে দাও, আর অন্য প্রান্তটা শক্ত করে ধরে থাকো। কেমন ?

মেয়েটি কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করলো না, তর তর করে নিচে নেমে গেল। আর একজন অফিসারের উৎসাহ ততক্ষণে বেড়ে গেছে। ফোর্থ অফিসারকে জাহাজে সবাই 'জনি' বলে ডাকে। একটু লম্বাটে চেহারা, গালের পাশ দিয়ে বড়ো জুলপি রেখেছে, তার সঙ্গে মানানসই গোঁফ। একটু বেপরোয়া ধরনের হৈ-হৈ করা মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। মাথার চুল, গোঁফ, সবই একটু লালচে ধরনের। চাপা গলায় সে ডেকে উঠলো, —বসুন ! ( *লসকরদের সর্দারকে বলে, বসুন* )

ঈষৎ স্থূলকায় সে ব্যক্তি অদূরেই দাঁড়িয়েছিল কোমরে হাত দিয়ে। গায়ে হাত কাটা সাদা গেঞ্জি, পরনে আঁটোসাঁটো নীল প্যাণ্ট। জনির ডাকে সাড়া দিয়ে সে বললে, বুঝতে পেরেছি, আনছি।

জাহাজে বসুন্-এর কাছে সরু অথচ খুব শক্ত একরকম দড়ি থাকে, গুটিয়ে গুটিয়ে গুলি করে রাখা। সেরকম একটা গুলি-করা দড়ি এনে বসুন্ জনির হাতে দিতে গিয়েও দিলো না, নিজে রেলিং-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে দড়ির একটা প্রান্ত নিজের কাছে রেখে গুলিটা ছুঁড়ে দিলো নৌকোর দিকে।

মেয়েটি প্রায় লুফেই নিলো গুলিটা। তারপরে ক্ষিপ্র হাতে একটা ফুলের চুবড়ির হাতলে সেটা বেঁধে আমাদের দিকে ইশারা করলো সেটা উঠিয়ে নিতে।

উৎসাহ আমাদের কারুরই মনে কম ছিল না, কিন্তু বসুন্ কারুর হাতেই দিল না দড়ির প্রান্ত, নিজে টেনে টেনে উঠিয়ে নিলো চুবড়িটা।

ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বড়ো বড়ো গোলাপ, টকটকে লাল আছে, ফিকে লালও আছে। যাকে বলে, 'বস্‌রাই গোলাপ।' এছাড়া টিউলিপ, হলিহক, ক্রিসেনথিমাম বা ঐ ধরনের ফুলও ছিল। আমরা কজন ঝুঁকে পড়ে ফুলগুলি দেখছিলাম।

ইতিমধ্যে বসুন্ দড়ির সাহায্যে আরও তিন ঝুড়ি ফুল তুলে আনলো। শেষ ঝুড়িটি তোলা হয়ে গেছে, মেয়েটিও দড়ির মই বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে দুলতে ওপরে উঠে সবে রেলিং টপকেছে, এমন সময় ওপর থেকে একটা গম্ভীর অথচ ধারালো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হোয়াট্‌স আপ ?

চাপা স্বরে জনি বলে উঠলো, এই রে, সর্বনাশ হয়েছে ! ওল্ডম্যান !

ক্যাপ্টেনের নামে সব মুখগুলোই একে একে অন্তরালে অপসৃত হতে লাগলো। শুধু বসুন্ একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে দু-নম্বর হ্যাচের কাছে তাড়াতাড়ি সরে গেল। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে হেঁকে বললে, স্যার, ফুল। ভারী সুন্দর সুন্দর ফুল।

বসুন্-এর কাছেই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সেই মেয়েটা। ওপর থেকে ক্যাপ্টেন ভারী গলায় কী যেন বললে আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বুঝলো বসুন্, সে উত্তরে 'যে আজ্ঞে' গোছের কী একটা কথা উচ্চারণ করে মেয়েটিকে কী যেন নিচু গলায় বললো। মেয়েটি মুখ কালো করে ফুলের ঝুড়িটি হাতে নিয়ে আমাদের থেকে আরও দূরে,—এক নম্বর হ্যাচ ছাড়িয়ে জাহাজের প্রায় মুখের কাছে ডেক্-এর উপরে গিয়ে বসলো।

বসুন্ আমাদের কাছে ছুটে এসে অন্য ঝুড়িগুলো হাতে নিলো। বললে, ফুলের দোকান ওখানে বসবে, যার দরকার, ওখানে হেঁটে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে, কর্তার হুকুম।

জাহাজের ক্যাপ্টেন বড়ো কড়া লোক, তার ভয়ে সবাই অস্থির। তবু যে তিনি দোকান বসাবার হুকুম দিয়েছেন, এতেই যেন একটু স্বস্তি পেল সবাই।

দেখা গেল বসুন্ নিজেই একটি ঝুড়ির ক্রেতা। দর-দস্তুর করে একটি ঝুড়ি

সে নিয়ে উঠে এলো আমাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কী হে, কিনলে নাকি ?

বস্‌ন্‌ একটু হেসে বললে, আমি না, কর্তা।

বলেই ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে।

আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্বয়ং কর্তা অর্থাৎ ক্যাপ্টেন যখন এক ঝুড়ি কিনেছে, তখন আর আমাদের পায় কে ?

বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যে ফুল-ওয়ালীর সব ফুল বিক্রি হয়ে গেল। ওর খোঁপায় ছিল একটি ফুলের কুঁড়ি। ফিকে লাল গোলাপের কুঁড়ি। সেটিকে বার করে আনলো অবশেষে। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, জাহাজের সব আলো জ্বলে গেছে। কোথায় কে যেন কোথাকার ষ্টেশন ধরেছে রেডিওতে, গীটারের বিলম্বিত মৃদু ঝংকার ভেসে ভেসে আসছে বিরহীর বিলাপের মতো।

মেয়েটির মুখের ওপর মাস্তুলের আলোর রেখা এসে পড়েছে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। চোখে বিদ্যুতের বহ্নি, আমাদের দিকে কুঁড়িটি মেলে ধরলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতো দাম ?

সে এমন একটা দাম বললে, যা চার ঝুড়ি ফুলের দামের চেয়েও বেশি। আমি অবাক হয়ে বললাম, সামান্য কুঁড়ির এত দাম কেন ?

সে মুচকি ·হাসলো, আর কিছু বললো না। জনির বুকখানা উত্তেজনায় ওঠানামা করছে, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে, বুঝলে না ? মেয়েটা নিজেকেই দিতে চাইছে। কুঁড়িটা তার নিজের দেহের প্রতীক।

দেখতে দেখতে সারা জাহাজে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। আবার এদিকে ওদিকে সবার মুখগুলোকে উঁকি দিতে দেখা গেল। টাকা অনেকের কাছেই আছে, কুঁড়িও সহজলভ্য, কিন্তু কিনবে কে ? ক্যাপ্টেন এসব বিষয়ে বড়ো কড়া লোক, কারুর এতটুকু বে-চাল সহ্য করবেন না। বিশেষ করে জাহাজের ওপরে ? সর্বনাশ ! তাছাড়া, ওল্ডম্যানকে লুকিয়ে ?

জনি মুখ ফিরিয়ে বললো, ব্রীজের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখো, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা একে একে যে যার জায়গায় ফিরে এলাম। জনিই ছটফট করতে লাগলো বেশি। মেয়েটি কিন্তু চুপ করে বসে রয়েছে ডেকে। বস্‌ন্‌ একসময় এসে ওর শূন্য ঝুড়িগুলো দড়িতে বেঁধে নিচে নৌকোয় নামিয়ে দিলো। এখন নৌকোয় নেমে দড়ির গিঁট ঝুড়ি থেকে খুলে নিলেই হয়। কিন্তু মেয়েটি তখনো নড়ে না, ঠায় বসে রইলো গোলাপের কুঁড়িটি হাতে করে।

আমি গিয়ে বস্‌নকে সব বললাম। বস্‌ন্‌ বললে, আমি জানি। কর্তাও জানে। ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটিকে আনা অসম্ভব। এটা যদি না জানতাম, তাহলে আমিই কি ছেড়ে দিতাম নাকি ?

বললাম, তোমার কথা ছেড়ে দাও, জনি যে ওদিকে পাগল হয়ে উঠলো !

বস্‌্ন্‌ বললে, পাগল হয়ে আত্মহত্যা করলেও কর্তাকে টলাতে পারবে না।

বস্‌্ন্‌ চলে গেল। আমি, জনি এবং আরও দ্‌্জন অফিসার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখনো সে বসে আছে, হাতে তার সেই ফুলের কুঁড়ি।

শেষ পর্যন্ত জনি আর থাকতে পারলো না, বললে,—যা থাকে কপালে, ঐ 'কুঁড়ি' আমি কিনবোই!

বলে, পাগলের মতো ছ্‌্টে গেল মেয়েটির দিকে।

বলা বাহ্‌্ল্য, জনির দোষ নেই, পাগল-করা র্‌্পই বটে মেয়েটির! কিন্তু সে ছ্‌্টে মেয়েটির কাছে পেঁছিবার আগেই ওপর থেকে ধারালো কণ্ঠ ভেসে এলো, জ-নি!

জনির গতি র্‌্দ্ধ হয়ে গেছে, সে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ইয়েস স্যর?

ওপর থেকে ক্যাপ্টেন হেঁকে বললেন, শ্‌্নে যাও?

অগত্যা কী আর করা যায়, জনি ভালো ছেলেটির মতো ধীর পায়ে হেঁটে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। কী কথা হয়, না হয়, জানবার জন্য নিচে আমরা ক'জন উম্ম্‌্খ হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। একটি করে সেকেণ্ডের কাঁটা সরে যাচ্ছে ঘড়িতে, আর আমরা তত অধৈর্য হয়ে উঠছি!

অবশেষে, একসময় সেই মহা-প্রতীক্ষিত ম্‌্হ্‌্র্তটি এসে উপস্থিত হলো। কপালে বিন্দ্‌্ বিন্দ্‌্ ঘাম, জনি উত্তেজিত পদক্ষেপে নেমে এলো। আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হলো?

জনি একটু দম নিয়ে বললে, ওল্ডম্যানের সঙ্গে চটাচটি হয়ে গেল। আমি বললাম, যদি ওকে আমি বিয়ে করি?

—বিয়ে!—আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠলাম।

জনি বললে, কেন নয়? দেশে, আমার কে আছে? ছন্নছাড়া আমার জীবন। আমি বিয়ে করে যদি এখানেই থেকে যাই, ত, কার কী ক্ষতি? একে ত প্রথম বিস্ময়, এডেনে মেয়ে! তার ওপরে এমন স্বন্দরী মেয়ে খ্‌্ব কমই দেখেছি! ইয়োরোপিয়ান ফিগার আর ওরিয়েণ্টাল কালো চোখের তারা আর রেশমি নরম কালো মাথার চুল! আমি এখ্‌্নি যাচ্ছি মেয়েটির কাছে প্রপোজ করতে!

—মেয়েটি না হয় আকাশের চাঁদ পাবে হাতে,—আমি বললাম,—কিন্তু ওল্ডম্যান কি এতে রাজি হয়েছে?

—রাজী!—চোখদ্‌্টো কপালে তুলে জনি বললে,—ক্যাপ্টেন বলেছে, ওসব পাগলামী যদি করতে চাও, এখ্‌্নি জাহাজ থেকে নেমে যাও। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি এখখ্‌্নি যাচ্ছি।

বলে আমার হাত ধরে ফেললো জনি, তুমি মেয়েটিকে বলো আমার কথা। আমি আমার স্টুটকেশটা গ্‌্ছিয়ে নিচ্ছি এক মিনিটের মধ্যে।

আর দাঁড়ালো না, গট গট করে চলে গেল নিজের কেবিনের দিকে। আমরা সবিস্ময়ে একে অপরের ম্‌্খ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কে একজন

বললো, চলো মেয়েটির কাছে আমরা সবাই যাই। একা গেলে ক্যাপ্টেন ধমকাবে, দল বেঁধে গেলে কিছু বলবে না।

—তাই চলো।

মেয়েটা তেমনি ব'সে আছে ফুলের কুঁড়ি হাতে, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা, তুমি কি বিবাহিতা?

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, কেন বলো ত?

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

মুচকি হাসলো সে। বললো—তাহলে খোঁপায় এই কুঁড়িটি রাখতাম না, রাখতাম ফোটা ফুল।

—বিয়ে করবে?

সে সবিস্ময়ে বললে, কাকে!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। আমাদের মধ্যেকার একজন একটু দম নিয়ে বললে, আমরা কেউ নই। সে আসছে তার জিনিষপত্র আর টাকাকড়ি নিয়ে। তোমাকে বিয়ে করবে বলে পাগল হয়ে গেছে।

মেয়েটির মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো। মুখ নিচু করলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে সে-ই দেখতে সব থেকে সুন্দর। তোমার পছন্দ হবে।

মেয়েটি মুখ তুললো, বললে, সরো, আমি যাই।

—সে কী! যাবে কেন?

মেয়েটি আর কিছু বললো না, এগিয়ে গেল রেলিং-এর কাছে। বললাম, বিয়েতে তোমার মত নেই?

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গোলাপের কুঁড়িটি তার খোঁপায় গুঁজে রাখলো, তারপর রেলিং টপকে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামবার উপক্রম করতে করতে বলে উঠলো, তাকে বোলো, আমি তাকে বলেছি, ইডিয়ট্। আহম্মক। বোকা।

আর তাকে দেখা গেল না। সে জাহাজের গা বেয়ে তর তর করে নামতে লাগলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ব্রীজের উপর ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন চুপ চাপ।

আমি তখন ছুটে গেলাম জনির কেবিনে। জনি সত্যি সত্যি ক্ষিপ্র হাতে সুটকেশ গোছাচ্ছিল। আমরা তাকে 'দেখে যাও' বলে টেনে আনলাম রেলিং-এর ধারে।

ছোট পানসি-নৌকোয় ছোট একটি হারিকেন জ্বলছে। সমুদ্রের বুকে সে একা নৌকো চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায় না, শুধু আলোটাকে লক্ষ্য করা যায়, একটি বিন্দুর মতো সরে সরে যাচ্ছে বন্দরের দিকে। জনি প্রায় চিৎকার করে উঠলো, ওকে তাড়ালো কে?

আমরা বললাম, কেউ ওকে তাড়ায়নি। একাই ও চলে গেল।

—তোমরা আমার কথা বলেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কী উত্তর দিলে ?

আমরা চুপ করে রইলাম। জনি আবার তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, বলেছিলে কী, আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম ? মুহূর্তের বিলাস-সঙ্গিনী নয়, চিরদিনের জীবন-সঙ্গিনী করতে চেয়েছিলাম ?

—বলেছিলাম।

—তবু চলে গেল !

—হ্যাঁ।

জনি লোহার রেলিং দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো, ইডিয়ট্ ! আহাম্মক ! বোকা !

আলোর বিন্দুটি তখন তীরে গিয়ে পেঁাছেছে।

শুধু জনি বা সেই ফুলওয়ালীই বা কেন, এডেনের সঙ্গে আরও একটি মানুষের স্মৃতি বিজড়িত। সে-রাত্রে আমাদের কারুরই তীরে যাবার হুকুম ছিল না। ভোরে জাহাজ জেটিতে গিয়ে ভিড়লো কয়লা নেবার জন্য। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ আমাকে জাহাজের কাজেই এজেন্টের অফিসে যেতে হবে, ফেরবার সময় একটু ঘুরে ঘুরে শহর দেখে ফিরবো, এই ইচ্ছে। চীফ কুক্‌কে বললাম, আজ দুপুরে আমি জাহাজে খাবো না, বাইরে লাঞ্চ সেরে নেবো।

কুক্ মুচকি হেসে বললে, লাকি ডগ !

—কেন ?

কুক্ বললে, তুমি যেতে পারলে, আমরা যেতে পারছি না, আমাদের ছুটি নেই ! তার মানে শহর দেখা আর হবে না, কাল ভোরেই তো জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে।

বললাম, একা একা শহরে যাবো ? জনিকে সঙ্গে নেই, কেমন ?

কুক ঠোঁট উল্টে বললে, তোমার খুশি !

কিন্তু জনিকে তার কেবিন থেকে বার করা গেল না। রেডিও খুলে কোন্ দূর দেশের যন্ত্রসঙ্গীত শুনছিল সে। বললাম, চলোই না, সেই ফুলওয়ালীর সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে !

জনি বিরক্ত হয়ে বললে, কী হবে দেখা হয়ে ?

একটু হেসে বললাম, আবার বলা-কওয়া করে দেখো না, তোমার প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত সে রাজী হয়েও যেতে পারে।

জনি এবার আমাকে বলে উঠলো, ইডিয়ট্।

অগত্যা একাই ছোট লঞ্চটায় উঠে বসলাম। এডেন শহরটা ছোট, কিন্তু অদ্ভুত দেখতে ! দুই পাহাড়ের মাঝখানে শহর। মাঝখানে শহরটাকে রেখে

দুপাশে ঠেলে উঠেছে পাহাড়। পাহাড়গুলো ন্যাড়া, গাছপালা নেই বললেই হয়। আমি যতো তীরের দিকে যাচ্ছি, ততই দেখছি সবুজের চিহ্ন মাত্র কোথাও নেই। হলদে, গেরুয়া আর কালো, এই তিনটি রঙ দিয়ে খেয়ালী শিল্পী যেন এক বিচিত্র ছবি এঁকে রেখেছে। সেই ছবির রেখাগুলিতে কোনো মাপ-জোখ নেই। অসমান, ছোট বড়ো, এলোমেলো।

কিন্তু শহরে নামবার পর খুব একটা তাড়া অনুভব করছিলাম না। হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগটা নিয়ে আস্তে আস্তেই হেঁটে চলছিলাম। আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আচ্ছা, যদি দেখা হয়ে যায় সেই ফুলওয়ালীর সঙ্গে ?

কিন্তু দুটি চোখ উন্মুখ হয়ে এধারে ওধারে দৃষ্টিপাত করলেও তার দেখা মিললো না। শহরের মূল রাস্তাটা পাথর বাঁধানো, এমন কিছু চওড়া নয়, দুপাশে দোকানের সারি। আমি দু-একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এজেন্টের অফিস খুঁজে বার করলাম। বড়ো রাস্তা দিয়ে কিছুটা হেঁটে যাবার পর একটা ছোট গলি। গলিটা আবার একটু উঁচু হয়ে গেছে শেষের দিকে।

এজেন্টের অফিসে আমার কাজকর্ম মিটে গেল মিনিট কুড়ির মধ্যেই। এখন আমি মুক্ত। শহরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারি। বড়ো রাস্তাটা ধরে অলস গতিতে এগিয়ে চলেছি, আর দুপাশের দোকান থেকে আহ্বান আসতে লাগলো, কাম স্যর। হ্যাভ এ লুক।

আমাকে শাঁসালো খদ্দের বলে ঠাউরেছে আর কী ! আমি মাথা নেড়ে 'না' বলতে বলতে চলতে লাগলাম, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম হিন্দুস্থানী কথা শুনে। একটি দোকান থেকে ভেসে এলো, আইয়ে ?

আমি বাঙালী, কিন্তু হিন্দীওতো আমার দেশের ভাষা, বিদেশে সেটাই কানে মধু বর্ষণ করলো। আমি সে ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না, দোকানের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

বেশ সাজানো গোছানো দোকান। যাকে বলে 'কিউরিও শপ'। হেন জিনিস নেই যে সেখানে পাওয়া যাবে না। কাশ্মীরী কার্পেট থেকে শুরু করে তিব্বতী চামর পর্যন্ত সবই সাজানো রয়েছে।

ক্রেতা তখন দোকানে ছিল মাত্র একটি। মানুষটি আরব দেশেরই হবে। বেশ লম্বা চেহারা, খাড়া নাক। তামাটে দেহের বর্ণ। মাথার ওপরে কাপড় বাঁধা। কপালের ওপর দিয়ে লাল মোটা সুতো দিয়ে টান করা ! সুতো না বলে দড়ি বলাই ভালো।

লোকটি কী একটা কাপড়ের টুকরো দেখছিল, আমার দিকে একবার ফিরে, তাকালো মাত্র। দাড়ি গোঁফ কামানো, চেহারায় রুক্ষতা থাকলেও বয়স বেশি বলে মনে হয় না। সম্ভবত তিরিশের নিচে অর্থাৎ আমারই বয়সী। আমি এগিয়ে গিয়ে একজন দোকানীর সামনে দাঁড়ালাম, বললাম, আপনারা ইণ্ডিয়ান ?

লোকটির মুখখানা খুশিতে ভরে গেল। বললে, আপনিও নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান। আমরা দেখেই বুঝতে পারি।

বললাম, আপনারা কোন্ প্রদেশের ?

—আমরা সিন্ধী। আপনি ?

—বাঙালী।

কথাটায় ওদের বিস্মিত হবার কিছু নেই, কিন্তু বিস্মিত হয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো সেই উন্নত নাসা আরব তরুণটি।

আমি দোকানীদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম, আর লোকটি কী একটা কাপড়ের টুকরো কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। দোকানে আমি ছাড়া আর ক্রেতা রইলো না তখন। ওরাও যে আমাকে কোনো কিছু বিক্রি করবার জন্য ব্যস্ত, তা নয়। ওরা দেশের কথা নিয়েই গল্প করতে লাগলো। অথচ, কোথায় সিন্ধু প্রদেশ, আর কোথায় বাংলা !

জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন দেশে যান না আপনারা ?

ও'দের মধ্যে যে ভদ্রলোক বর্ষীয়ান, বয়স হবে চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ, একটু ম্লান হেসে বললেন, দেশ আর কোথায় বাবুজী ? আমাদের দেশ চলে গেছে পাকিস্থানে। বোম্বাইতে আমাদের কিছু জ্ঞাতি আছে, আমরা ছোট থেকেই এই দেশে আছি। ম্যাপে দেশের চেহারা দেখি এই পর্যন্ত।

আর একজন, ভদ্রলোকের ছোটভাই, বললেন,—আমার বাবা এ দেশে এসেছিলেন ব্যবসা করতে তাঁর যৌবন কালে। আমার দাদা তখন মায়ের কোলে, আট-ন-মাস বয়স, আমরা তখনো জন্মাই নি। বুঝুন বাবুজী, সেই থেকে এদেশে রয়ে গেছি। মা এখনো বেঁচে আছেন, বাবা নেই।

এই ধরনের সুখদুঃখের গল্প কিছুক্ষণ করবার পর বেরিয়ে আসছি, বর্ষীয়ান ভদ্রলোক ডেকে বললো, শহর দেখতে বেরিয়েছেন ? দেখবেন বাবুজী, হুঁশিয়ার ! ঠগের পাল্লায় পড়বেন না যেন !

—না-না-সাবধানেই থাকবো,—বলে বেরিয়ে এসে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, হঠাৎ একসময় খেয়াল হলো, কখন থেকে একটি লোক ঠিক আমার পিছন পিছন হেঁটে আসছে ভারী জুতোর শব্দ তুলে। আমি থামছি, তো, সেও থামছে।

দু-তিনবার এই থেমে পড়ার ব্যাপারটা চলবার পর আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি সিন্ধীদের দোকানে দেখা সেই আরব মানুষটি। আমি তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে একটু হাসলো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে কী আশ্চর্য, বাংলা ভাষায় বললে, হামি আপনার জন্যই ডাঁড়িয়ে ছিলম। চলেন।

পরিস্কার বাংলা নয়, থেমে থেমে উচ্চারণ করা, তাও একটু জড়িতস্বরে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে বললে, হামি বাংলা বলতে পারে। আপনে বাঙালী, এ-কথা শোনা অবধি আমার দিলটা থির হচ্ছে না, আপনের সাথে বাৎচিৎ ইয়ানে কথাবার্তা বলতেই হবে। চলেন। ঠিক যাচ্ছেন, হামিও ওইদিকে যাবে।

সত্যি বলতে কী, কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো সে, বললে, কী হলো, চলেন ?

যন্ত্রবৎ চলতে আরম্ভ করলাম। তখনো পর্যন্ত আমি কোনো কথা বলতে পারি নি। আশ্চর্য, মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে আমার পাশে এলো, বললে, বহুত অবাক হয়ে গেছেন, না ?

আমি আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি। মনের উত্তেজনা তখনো শান্ত হয়নি। কোনো রকমে তাই বলে উঠলাম, বাংলা শিখলেন কী করে! আমাদের দেশে গিয়েছিলেন নাকি ?

সে বললে, না মশা, এই দেশ ছেড়ে আওর কিধরভি যাই নি। তবভি আপনের ভাষা শিখেছি। আসেন হামার সাথ, আপনেকে সব বলবো।

বলে, মূল রাস্তাটা ছেড়ে সে আমাকে নিয়ে একটা গলিপথে ঢুকলো। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। একটু দূরে পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে দেখা যাচ্ছে। আর তার পাশ দিয়ে ঘোরানো রাস্তা, জীপ-টিপ উঠতে পারে। ওপরের দিকে, তাকিয়ে দেখা যায়, পাহাড় কেটে গুহা বানানো হয়েছে। এ-দৃশ্য ·জাহাজ থেকেই অবশ্য চোখে পড়ে। পাহাড়ের গুহা সারি সারি। এর কাছ থেকে জানলাম, ওটা নাকি ফৌজী ব্যারাক, সৈন্যদের ছাউনি।

সিঁড়ির নিচে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে কয়েকটা উট বসে আর দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে বড়ো বড়ো ছাগল, যাকে ওরা দুম্বা বলে, তারই হাট বোধ হয়। কপালে অনুরূপ দড়ি বাঁধা অনেক লোক, কেউ বিক্রি করছে, কেউ কিনছে। তবে ছাগল যারা বিক্রি করছে, তাদের পোশাক একটু অন্যরকম। তাদের মাথায় গোল মিশরি টুপি।

আমরা দুম্বা-হাট ছাড়িয়ে অন্যদিকে এগোলাম। ওদিকে কিছু দোকান-পাট আছে, সরাইখানা আছে। এরই একটি সরাইখানায় আমাকে নিয়ে ঢুকলো আমার সঙ্গী।

লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার সঙ্গীকে অল্পবিস্তর সবাই চেনে এবং বেশ সমীহ করে। তার সঙ্গে আমার মতো ভিনদেশীকে দেখে সরাইয়ের লোকেরা একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাকাতে লাগলো।

আমি কিন্তু মোহগ্রস্তের মতো লোকটিকে অনুসরণ করে চলেছি। সেই সিন্ধী দোকানদারটি বলেছিল, ঠগ থেকে সাবধানে থাকবেন।

অথচ আমার সে-কথা মনেই ছিল না।

সরাইখানার ছাদটা নিচু। আমার বন্ধুটি যদি মাথা উঁচু করে, তাহলে তার মাথা ঠেকে যাবে ছাদে। আর দেওয়ালগুলো পাথরের। আমার বন্ধুটি আমাকে নিয়ে বসালো একটা কোণে। বললে, আপনে আমার মেহমান। কী খাবেন, বলেন।

বললাম, কিছু খাবো না এখন। আপাতত একটু চা, কী কফি।

—ঠিক আছে, বলে সে কফির অর্ডার দিলো।

আমরা বসেছিলাম একটা ছোট টেবিলের মুখোমুখি। ও বললে, আপনে তো জাহাজী, না?

—হাঁ।

—দোস্ত, হামার বাড়ি আপনেকে নিয়ে যেতে চাই, যাবেন কী?

—তা যেতে পারি, কিন্তু বেলা চারটের বেশি যেন না হয় জাহাজে ফিরতে।

খুশি হয়ে সে বললে, ঠিক আছে। ঠিক সময়ে আপনেকে ফিরিয়ে দেবে।

—কতো দূরে আপনার বাসা?

—সে একটু দূর আছে, করীব আট-মিল।

বললাম, অনেক দূরে। তার থেকে এখানেই গল্প করা যাক না! বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছেন কেন?

বন্ধুটি আমার চোখের দিকে তাকালো, বললে, দুসরা কিছু না, আপনেকে একটো কবরের কাছে নিয়ে যাবে, এক বাঙালী মেয়ের কবর।

অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম। রুক্ষ মুখখানা থমথমে হয়ে এলো, আর আশ্চর্য, চোখদুটি ভরে উঠলো জলে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিলো নিজেকে। ইতিমধ্যে দুটি পাথরের গেলাসে কফি দিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চুমুক দিলাম।

এ জীবনে বহু বন্দরে বহু ঘাটেই ঘুরতে হয়েছে, বহু মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, কিন্তু কজনের কথা মনে রাখতে পেরেছি? মাঝে মাঝে দেখি, কেউ হারায়নি, ঠিক তারা রয়ে গেছে স্মৃতির ভাণ্ডারে।

আমার এই আরবী বন্ধুটির নাম মেহমুদ। মেহমুদ তার গ্রামের মধ্যে বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি। সরাইখানার বাইরে এসে তার উটের উপর আমাকে চড়ালো। তার নিজস্ব উট। উটের পিঠে ছোট হাওদার মতো আছে, তার ওপরে আমরা দুজনে উঠে পাহাড়ের পিছন দিককার বাজারে এলাম। এখানে লোক আরও বেশি, তাদের নানা বর্ণের পোষাকে এক বিচিত্র পরিবেশেরই সৃষ্টি হয়েছে বটে!

এইখানে নেমে সে একটা মোটর গাড়ি ভাড়া করলো। ধূলিধূসরিত একটা কালো রঙের সেকেলে মোটর।

কিসের মোহে যে সেদিন তার সঙ্গে আট মাইল মরুভুমির মতো অঞ্চল পার হয়েছিলাম কে জানে। শহর পার হতে গিয়ে নাতিবৃহৎ একটি কারখানার মতো বস্তু আমার চোখে পড়েছিল। উঁচু ট্যাঙ্ক, মোটা মোটা পাইপ, পাশ দিয়ে যেতে যেতেই একটা এলাহি ব্যাপার বলে বোধ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি মেহমুদ ভাই?

সে বললে, পানি, ইয়ানে জলের ট্যাঙ্ক। তামাম এডেন শহরে পানি যায় এখান থেকে।

বলে, সে যা ব্যাখ্যা করলো, তাতে অবাক হলাম এই পানীয় আহরণের

উপায় শুনে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পাইপে টেনে পাম্প করে ফেলা হয়, সেই জলের বাষ্প থেকে সংগ্রহ করা হয় মিঠে জল। মরুভূমি অঞ্চলে জলের কষ্ট সহজেই অনুমান করা যায়। এই মহার্ঘ উপায়ে অন্তত ধনী সম্প্রদায়কে জল যোগাবার ব্যবস্থা করা গেছে, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের জন্য? মেহমুদ দেখালো সে ব্যবস্থাও, আর খানিকক্ষণ পরে। এই যে পাহাড়ের শ্রেণীর পাশ দিয়ে চলেছি, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালো মেহমুদ। বললে, আপনে ইখান থেকে ঠিক সমঝতে পারবেন না, ওর ভিতরে সব বড়ো বড়ো গর্ত কাটা আছে। আর কোথাও আছে বাঁধানো ক্যানাল। তাতে বর্ষার পানি জমে থাকে। সেইখান থেকে পাইপে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উপর ইঁদারা আছে খোড়া বহুৎ।

কথা বলতে বলতেই চলছিলাম। বললাম, এডেন ছেড়ে আর কোথাও আপনি যাননি?

—তা গেছি,—মেহমুদ বললে,—কায়রোতে কলেজে পড়তে গেছি। লেকিন মন বসলো না, বরষ দু' পরেই পালিয়ে এলাম।

একটু সম্ভ্রমের স্বরেই বলে উঠলাম,—তাহলে আপনি তো লেখাপড়া জানা লোক!

—দূর দূর! লেখাপড়া আর শিখলাম কোথায়?

—কলেজে কী পড়তেন?

—হিন্দুস্থানী ভাষা আর ইতিহাস। এই ছিল স্পেশাল সাবজেক্ট!

—ইংরেজী জানেন তাহলে!

—দূরে দূর! থোড়া বহুৎ জানি শুধু। আমাদের দেশে ইংরেজী নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। ফ্রেঞ্চ শিখলে, কি রাশিয়ান শিখলে কদর পাওয়া যায়।

পাহাড়গুলো তখনো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে যায় নি। পাহাড়ের কোনো এক জায়গায় কতগুলি খেজুর গাছের জটলা, কয়েকটা মাটির বাড়িও দেখতে পেলাম। দূর থেকে ভারি ভালো লাগলো দেখতে। মেহমুদকে জিজ্ঞাসা করতেই বললে,—ও একটা ছোট গাঁও। ওর কাছেই পাহাড়ের বড়ো গর্তটা, ওখানেই বৃষ্টির জল জমে সব থেকে বেশি। আরবী ভাষায় ও গাঁয়ের যে নাম, তাকে হিন্দুস্থানীতে বলতে গেলে বলতে হবে ঠাণ্ডী তলাও।

বললাম, আচ্ছা, ওসব বিরাট বিরাট গর্ত করেছে পাথর কেটে তো?

—জী হাঁ।

—খুব খরচ পড়েছে নিশ্চয়?

মেহমুদ হেসে বললে,—কে তার হিসাব রাখে? ওকি আজকের? ইরাণের 'সামানিড' বাদশারা করে দিয়েছিলেন ঐ সব গর্ত। কয়েকটা সেঞ্চুরী কেটে গেছে তারপর।

—এডেন কি খুব প্রাচীন জায়গা?

মেহমুদ বললে,—খুব প্রাচীন। 'ইরিপ্লাস অফ দি ইথিরীয়ান সী' কতাবটার নাম শুনেছেন?

একটু ভেবে বললাম, শুনেছি বলেই তো মনে হয়।

মেহমুদ বললে, আসলে ওটা লেখা হয়েছিল গ্রীক ভাষায়। সেই আলেক-াণ্ডার দি গ্রেট? তাঁর এক সেনাপতি লিখেছিলেন। শুনেছি সেই কেতাবে াই এডেনের কথা আছে। এখন সমঝতে পারছেন, কত পুরোনো এই এডেন?

আজ কথাগুলো মনে করে করে বলছি, কিন্তু হলফ করে বলতে পারবো না, য, হুবহু কথাগুলো এই ভাষাতেই বলেছিল মেহমুদ। সে বাংলা, হিন্দি, মার কিছু ইংরেজী,—এইসব মিশিয়েই আমাকে বলেছিল কথাগুলো। মোট থা আমি বুঝতে পারছিলাম, তার কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি।

সে বলেছিল, প্রাচীন রোম সম্রাট কনস্ট্যান্টিউস এডেনে প্রথম ক্রীশ্চান র্ম প্রচার করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। এই ক্রীশ্চান পাদ্রীরা পরে তখনকার মারবদের হাতে মারা পড়ে। মানে, আরবরা খেপে গিয়ে তাদের মেরে ফেলেছিল মার কী! এ খবর শুনে সম্রাট কনস্ট্যান্টিউস ভীষণ চটে যান। রেড সী তা শুরু হলো এডেনের পর থেকে? রেড সীর অন্য তীরে ছিল হাবসী রাজ্য। াই হাবসীদের এক বড়ো অংশ ছিল ক্রীশ্চান। রোম সম্রাট তাদের সুলতানকে চিঠিতে নির্দেশ দেন আরব-হত্যাকারীদের শায়েস্তা করতে। সুলতান সেইমত ফৌজ পাঠালেন এডেনে। লাগলো আবার মারামারি, কাটাকাটি। তার ফলে ত আরবী যে মারা পড়লো তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে আবার পালিয়েও গেল। যাই হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠা হবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। রপরে এডেন এলো ইরানের সামানিড সুলতানদের হাতে। এরপর যখন সলাম ধর্ম এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এডেন আবার ফিরে আসে আরবদের াতে। তারপর কত ঝড়—কতো ঝাপটা! পর্তুগীজরা বারবার এসে আক্রমণ রেছে। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের সুলতান এখানে বন্দর তৈরি করলেন পর্তুগীজদের ইণ্ডিয়ান ওসান-এরিয়া' থেকে তাড়াবার জন্য। তারপর আবার ওটা ফিরে াসে আরবদের হাতে। তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল ইংরেজরা। খন ইংরেজরাও চলে যাচ্ছে, ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে, শীগগির দলে যাবে এখানকার চেহারা। বিশেষ করে যুদ্ধের ঝরতি-পরতি 'পাপ' আর কছুই থাকবে না। এডেন এবং আরও সব জায়গা জুড়ে তৈরি হবে একটি লিত রাষ্ট্র: আপনি দেখে নেবেন, আমার কথা মিথ্যে হবার নয়!

প্রচণ্ড দাবদাহের কথা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু ওদের সেই দুর্গের মতো বাড়ির কার্পেট বিছানো একটি ঘরে গিয়ে যখন বসলাম, তখন মনে হল শরীর জুড়িয়ে গেল।

আজ এতদিন পর সব খুঁটিনাটির বর্ণনা দিতে পারছি না। কিন্তু একজন শুভ্রকেশ ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তিনি মেহমুদের ঠাকুর্দা। তাঁর চেহারা কখনো ভুলতে পারবো না। যেন ছবি থেকে একেবারে সশরীরে নেমে এসেছেন কোন স্থবির অথচ মহিমাময় মোগল সম্রাট।

বলা বাহুল্য, মধ্যাহ্ন ভোজন ওদের ওখানেই সেরেছিলাম। কার্পেটের ওপর টানটান করে পাতা চাদর। তার ওপর বড় সানকিতে করে দিয়ে গেল ধূমায়িত গরম বিরিয়ানি, দুম্বার মাংসে প্রস্তুত।

অবশ্য, আরবদের আতিথেয়তা জগৎ বিখ্যাত। ওসব পর্ব মেটবার পরে ঘরের আর সবাই চলে গেল, রইলাম মেহমুদ আর আমি। একটা নরম তাকিয়ায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করছি, হঠাৎ চোখ গেল ঘরের কোণের দিকে। দেখি ঝুড়ির ওপর ঝুড়ি বসানো। সবার ওপরে যেটি রয়েছে, সেটির মাথায় চটের থলি চাপা দেওয়া। ও-গুলো আগেই চোখে পড়েছিল, এখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ওর মধ্যে থেকে যেন ফুল উঁকি দিচ্ছে, টকটকে লাল ফুল।

ফুল নিয়ে যে অভিজ্ঞতা গতকাল জাহাজে হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় আমার এ অনুমানের ক্রিয়াটা তরান্বিত হলো বলা চলে। ওকে প্রশ্ন করলাম, ঝুড়িতে কী ভাই, ফুল? গোলাপ?

ও ঝুড়ির দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, জী হ্যাঁ, আমার এক চাচার ফুলের ব্যবসা আছে, বিকেলেই শহরে চলে যাবে ও ফুলগুলো।

—তারপর?

—শহরে বিক্রি হয়ে যাবে।

—কারা কেনে?

ও একটু হেসে বললে, এই আপনের মতো জাহাজীরাই কেনে থোড়া বহুৎ।

সোজা হয়ে উঠে বসলাম, বললাম, জাহাজে বিক্রি করতে যায় কারা? আপনাদের লোক?

মেহমুদ বললে না, ঠিক আমাদের লোক নয়। ওগুলো আমাদের কাছ থেকে কিনে নেয় ব্যাপারীরা। তারা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসে।

আমি বললাম, মেহমুদ, কাল আমাদের জাহাজে গিয়েছিল একটি মেয়ে মানুষ।

মেহমুদ কথাটার ওপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললে, তা হবে।

—ওই মেয়ে মানুষ গুলো কারা?

—শহরে থাকে, ওদেরও ফুল বেচা ব্যবসা।

—শুধু কি ফুল বেচে ?

মেহমুদ হেসে বলল, সে তো বুঝতেই পারছেন। লেকিন, আপনে দোস্ত কারো মহব্বতীতে পড়েছেন নাকি ?

বললাম,—না, আমি নই, আমাদের জাহাজের একটা লোক ওকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, ওকে একেবারে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

মেহমুদ বললে, তাজ্জব হবার কী আছে ? অনেক জাহাজীরাই অনেক মেয়েকে অমন বলেছে, লেকিন মেয়েরা কভী রাজী হয়েছে বলে শুনি নি !

—কেন বলুন তো ? রাজী হয় না কেন ?

মেহমুদও একটা তাকিয়া আশ্রয় করেছিল। এবার সেও সোজা হয়ে বসে বললো, ওরা এডেনের মেয়ে নয়, এমন কী, মুসলিমও নয়। গত যুদ্ধের সময় নানা দেশ থেকে ঐ সব মেয়েরা আমদানী হয়েছিল। এখন তাদের অনেকেই চলে গেছে, কিছু রয়ে গেছে। ওরা আসলে ভিনদেশী, কিন্তু এদেশকে পেয়ার করে এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। ওরা নিজেদের গোষ্ঠীর মানুষকে, আর এখানকার স্থানীয় লোকদের এত পছন্দ করে যে, বিদেশী কাউকে কভী শাদী করতে চায় না। ওরা চায় এখানকার লোকের মহব্বত। আর তার জন্য জান পর্যন্ত কোরবানি দিতে পারে। আশ্চর্য নয় ?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম নিশ্চুপে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ও-ও বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চমক ভেঙে বলে উঠলো,—চলেন দোস্ত, দুটো প্রায় বাজে। এখন না উঠলে দেরি হয়ে যাবে আপনার।

—চলুন।

আমাকে মোটরে চাপিয়ে মাইল খানেক দূরে নিয়ে গেল মেহমুদ। একটি ভাঙাচোরা মসজিদ। কয়েকটা খেজুর গাছ, আর একটি ছোটখাটো বাবলা গাছের বন। তারই এককোণে একটি কবর। ও সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে রইলো। তারপর বললে, ইনি জিন্দা থাকলে আপনে বহুৎ খাতির টাতির পেতেন। ওঁর সময়ে একটি বাঙালী আদমীরও দেখা পাইনি, কী আফশোষ বলেন তো ?

—কে ইনি ?

মেহমুদ বললে, একটি বাঙালী মেয়ে। কোথায় বাড়ি কোথায় তার বাপ-মা কোনদিন কিছু বাতায় নি। আপনেদের দেশের গুণ্ডারা ধরে এনে বেচে দিয়েছিল করাচি, না কোথায়, সেখান থেকে হামার এক দাদা সাদী করে এনেছিল। যখন সে হামাদের বাড়িতে আসে, তখন হামার উমর করীব দশ বরষ। আমাকে খুব ভালোবাসতো ! আপনেকে বলবো কী, ভাবীজী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতো না, আমিও পারতাম না তাকে ছেড়ে থাকতে। ওঁরই জন্য আমি কায়রোয় বেশিদিন থাকতে পারিনি।

—কী নাম ছিল ?

এক মুহূর্ত থেমে থেকে তার পরে মেহমুদ বললে, এরা নাম দিয়েছিল ফরিদা। লেকিন তার আসল নাম ছিল, লক্ষ্মী। লছমী নয়, লখকী আমাকে এই ভাবীজীই কষ্ট করে বাংলা শিখিয়েছিল।

—কোনো ছেলে পিলে ছিল না ?

মেহমুদ হঠাৎ দুটি হাত জড়ো করে তাতে ওর মুখ ঢাকলো। তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না। হামিই ছিলাম তার ছেলের মতো। হামার ঐ দাদার সাথ্ হামার উমরের ছিল বহুত বহুত ফারাক !

বলতে বলতে আবার ওর চোখ ভরে উঠলো জলে। জোব্বার পকেট থেকে একটি পাতাশুদ্ধ লাল টকটকে গোলাপ বার করে ও সেই সমাধির উপরে রাখলো। বাবলার পাতায় পাতায় হাওয়া তখন কাঁপছিল হাহাকারের মতো

ফিরে এসেছিলাম যথাসময়ে। মেহমুদ বললে, আজ আমি যে কী শান্তি পেলাম, আপনে জানেন না দোস্ত ! চলেন, আপনার দেরি হয়ে যাবে।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হেঁটে আসছি, সেই সিন্ধী দোকানদারদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। তাদের দোকানের সামনে দিয়েই তখন আসছিলাম। একজন বললে, এই ফিরছেন বুঝি ? কোথায় গিয়েছিলেন ?

ওদের দোকানে একটু বসলাম, মেহমুদের কথা বললাম।

ওরা একেবারে চমকে উঠলো। বললে, আপনার টাকাপয়সা কিছু খোয়া যায় নি তো ?

অবাক হয়ে বললাম, কেন !

দোকানী বললে, লোকটি ডাকাত, ঠগ, লোক ঠকিয়ে বেড়ানোই ওর ব্যবসা। এ অঞ্চলের সবাই ওকে চেনে। জেল টেলও বুঝি খেটে এসেছে এর মধ্যে।

কিছু বলিনি। নীরবেই ফিরে এসেছিলাম জাহাজে।

পরদিন জাহাজ চলা শুরু করলো। বিদায় এডেন ! বিদায় সেই দুর্গের মতো বাড়ি। বিদায় সেই নির্জন সমাধি ! লক্ষ্মী দেবীকে কখনও দেখি নি, চিনি না। মনে মনে প্রণাম জানালাম তাঁর উদ্দেশে। মেহমুদ তাঁরই সৃষ্টি ! সে কাকে ঠকিয়েছে, কোথায় ডাকাতি করেছে জানিনা, কিন্তু আমাকে সে ঠকায় নি, আমাকে দিয়ে গেছে এমন এক স্মৃতি, যা কখনো ভুলতে পারা যায় না।

॥ ৯ ॥

জলপথে এডেনকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপের প্রথম প্রহরী বলা যেতে পারে। শহরকে কজন জেনেছেন, দেখেছেন জানিনা, তবে নাম শুনেছেন অনেকেই। আর জলপথে যেতে আসতে এডেনের চেহারাও অনেকে প্রত্যক্ষ করে-

ছেন। কিন্তু সচরাচর চোখে পড়েনা এমন অখ্যাত অজ্ঞাত বন্দরও আছে, যার বিবরণ কোথাও লিপিবন্ধ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমার অভিজ্ঞতা সীমাবন্ধ। সেবার বিলেত যাবো বলে বেরিয়ে বিলেত যাওয়া হয়নি, যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটায় জাহাজ সুয়েজ, ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সৈদ পেরিয়ে গিয়েও ফিরে এসে মুখ ঘুরিয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এবং এর মালপত্র অন্য জাহাজ নিজের গহ্বরে তুলে নিয়ে এর বদলে বিলেত রওনা হয়েছিল। আমি ছুটি পেয়েছিলাম। অন্য এক ভারতগামী জাহাজে ঘটনাচক্রে কাজ পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল।

তোমার কাছে এসব কথা বলা বাহুল্য মাত্র, তবু বলছি,—আমি নিউ ইয়র্ক বা ইংল্যাণ্ডের কোনো বন্দরের বিবরণ দিতে পারবো না, দিতে পারবো না জাপান, ফিলিপাইনের বন্দরের খবর। আমার জল-জীবনের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল ঘরের আশপাশ ঘিরেই। পৃথিবীর মানচিত্রটি যদি একবার স্মরণ করি, যদি স্মরণ করি বর্তমানের বায়ুযানগুলির ঊর্ধ্বশ্বাস গতির কথা, যার কল্যাণে সুদূর নিকট হয়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই, তাহলে আফ্রিকার উপকূল কিংবা ভূমধ্যসাগরের একটি-দুটি বন্দর, এবং ওদিকে আন্দামান কিংবা মরিসাস ইত্যাদি, এই সবই এসে যায় ঘরের আশেপাশে।

আমার সেই বন্ধু ইংরেজ ক্যাপ্টেনের কথা মনে পড়ে? তারায় ভরা রাত্রির আকাশের নিচে জাহাজের 'ডাঙ্কি ডেক'-এর ক্ষুদ্র পরিসরে দাঁড়িয়ে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ-ই মুখ তুলে আকাশের উপর দিয়ে শব্দের তরঙ্গ তুলে ছুটে-যাওয়া একটি বায়ুযানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন, তারপরে তীব্র অথচ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, দি ডেভিল!

এই ক্যাপটেনের কথা ভোলা যাবে না। এঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হয়েছিল, অর্থাৎ উনি আমাকে একটু পছন্দ করতেন, কেন তা জানি না। হয়ত ওঁর জাহাজের অন্য কেউ আমার সঙ্গে তেমন মিশতো না লক্ষ্য করেই আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। নিশুতি রাত্রে যখন কর্মরত জনকয়েক ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সর্বোচ্চতলার উঁচু কেবিনের ওপরে রেলিং ঘেরা ছোট্ট ডাঙ্কি ডেক-এ আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন। আবছা আবছা আলো যেন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছিল সেদিন। একটি ক্যামপ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন উনি, ক্যাপ্টেন কেনেডি। আর আমি বসেছিলাম ওঁর কাছাকাছি একটি মোড়ায়। হঠাৎ এক সময় যেন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বললেন, ইয়ংম্যান তুমি কি বিবাহিত?

—না-না।

সোজা হয়ে বসে আমার দিকে তাকালেন, গলা একটু নামিয়ে যেন বিশ্ব-চরাচরের কেউ শুনতে না পায়, এমনি ভাবে বলতে লাগলেন,—কোনো মেয়েকে হঠাৎ দেখে তোমার কি কোনোদিন দারুণ ভালো লেগে গিয়েছিল, মানে দেখা মাত্রই তোমার রক্তে প্রবল ঝড় ঢেউ তুলে দিয়েছিল?

আমি একটু অবাক হয়েই কথাগুলো শুনছিলাম, মাথা নেড়ে নীরবে জানালাম,—না।

—আমার জীবনে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল,—বৃদ্ধ বলতে লাগলেন,—কোথায় জানো? যে আলেকজান্দ্রিয়ায় তুমি গিয়েছিলে বলেছিলে, সেই আলেকজান্দ্রিয়ায়। ওরা মিশরী, নারীর দিক থেকে ওরা প্রচণ্ড রক্ষণশীল, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়া বলতে গেলে একটি কসমোপলিটান শহর, ওখানে সব জাতের সব লোকই আছে। ওদের সেই 'হাফ লেগুনের মতো' সী-বিচটা দেখেছিলে? একটা গোল চক্রকে আধাআধি করলে পরিধিরেখাকে যেমন দেখতে হয়, ওদের সমুদ্র তীরের ঐ খ্যাতনামা বিচটি ঐ রকমই দেখতে। সেইখানে ছুটির দিনে গেলে দেখতে পাবে সুইমিং কস্টিয়্যুম পরে হরেক জাতের হরেক রকম মেয়েদের স্নান করার দৃশ্য।

ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন, এতদিনে নিশ্চয় এটুকু বুঝেছো, সাধারণ নাবিকরা দেহবাদী। অভ্যাসে দেহ আর দেহের চাহিদাটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, মন নয়। যখনকার কথা বলছি, তখন আমি থার্ড অফিসার। থার্ড অফিসার জানো ত? যার ওপর থাকে জাহাজের নেভিগেশনের গুরুভার। চার্টরুম থেকে হুইল, হুইল থেকে চার্টরুম, এ-দুয়ের মধ্যে আমার তখন গতিবিধি, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতে হতো আমাকে। এভাবে থাকতে থাকতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রীতিমত ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। খুব অন্তরঙ্গ গল্প হতো আমাদের মধ্যে। এই রকম অবস্থায় আমাদের সেই জাহাজ এসে ভিড়লো আলেকজান্দ্রিয়ায়। শহরটাকে তো দেখেছো, পুরানো আর নতুনের বিচিত্র সমাহার। এখানে বোরখা-পরা রমণীও আছে, আবার নাইট-ক্লাবের বেলি-ডান্সারও আছে। এখানে এসে সেই জাহাজের নাবিকদের মধ্যে যেন উৎসবের ঘটা পড়ে গেল। সন্ধ্যা হতে-না হতেই ডিউটিবিহীন সব নাবিকই সেজেগুজে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো। প্রথম দিনে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন সব লক্ষ্য করলো, দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যা হতে না হতেই আমাকে ডেকে পাঠালো কেবিনে, বললে, আই সে কেনেডি, এই আলেকজান্দ্রিয়ায় তুমি আগে কখনো এসেছো?

—এসেছি।

বললে, বটে? আমার এই প্রথম আসা।

তারপরে ক্যাপ্টেন বেরুলো আমাকে নিয়ে, গেটের কাছে এসে দেখি, জাহাজের কাপড়চোপড় যে কাচে, সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে একটু অন্ধকার অন্তরাল খুঁজে নিয়ে, বোকা মুখখানার মধ্যে দুটি ধূর্ত চোখ। বুঝলাম এটিই আমাদের আপাতত পথপ্রদর্শক।

বলতে বলতে কেনেডি এখানে একটু থামলেন, তার পরে বললেন, না, ক্যাপ্টেন সেই লোকটির সঙ্গে আধুনিক শহর-অঞ্চলের যে গলিতে ঢুকলো, আমি সে পথে গেলাম না। তাদের বিদায় দিয়ে আমি অন্যদিকে চলে এলাম। একটা

সিগারেট ধরিয়ে ছোট একটা ফোয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে সেটা শেষ করে একটা বড়ো রাস্তা ধ'রে সোজা চলতে লাগলাম।

আসল কথা,—কেনেডি বলতে লাগলেন,—আলেকজান্দ্রিয়ায় সত্যিই আমি নতুন নই। একবার একটি কাফেতে একটি তরুণ বন্ধু লাভ হয়েছিল আমার। আমার মধ্যে সে কী দেখেছিল জানি না, আলাপ-পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনেই আমাকে একেবারে তার বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলো। প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যতদূর জানতাম ওখানকার লোকেরা বিদেশীদের যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখে। তরুণ বন্ধুটি বললো, দ্যাখো, আমি গল্প লিখিয়ে, আমি তোমাদের কথা শুনতে চাই। তোমাদের নিয়ে গল্প লিখবো।

হেসে বলেছিলাম, বেশ, চলো, তোমার বাসায়, গল্পের ঝুলি খুলে বসবো, যত খুশি তুলে নিয়ো।

একটা অপরিষ্কার গলি, আধুনিক এলাকার মধ্যেই। তার প্রান্তে ওদের বাসা। পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস আছে ঘরে, কিন্তু দারিদ্র্যের ছাপ তাতে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বসবার ঘরের এক কোণে চকচকে পিতলের একটি ক্রশ ঝুলছে, তার নিচে কুলুঙ্গিতে গোটাকয়েক জ্বলন্ত মোমবাতি ক্ষীণ শিখা বিস্তার করেছে। বুঝলাম, ছেলেটি মুসলিম নয়। নামও তার প্রমাণ,—আর্থার।

বললে, বন্ধু এসেছেন গরিবের বাড়ি, যোগ্য অভ্যর্থনা হবে না।

হেসে বলেছিলাম, ভনিতা করলে বন্ধুত্ব জমবে না, ওসব ছাড়ো।

একটু পরেই একটি ক্ষুদে চাকর নিয়ে এলো চায়ের ট্রে, আর তার পিছনে পিছনে এসে ঢুকলো সেই মেয়েটি, যার কথা বলবো বলে আজ তোমাকে কাছে ডেকে এনেছি। ঘন নীল ফ্রক পরা, অসাধারণ সুগঠিত দেহ, মুহূর্তে রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি আর কেউ নয়, আর্থারের বোন।

যথারীতি শিষ্টাচার বিনিময়ের পর আবহাওয়া ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করে বিদায় নিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু জাহাজে ফিরে এসে চোখে আর ঘুম নেই। মেয়ে অনেক দেখেছি, সুন্দরী তরুণীও কম দেখিনি, তবে এ মেয়েটি আমাকে এমন করে পাগল করে তুললো কী করে? জাহাজ যে ক'দিন বন্দরে থাকবে, সেই ক'দিন আলেকজান্দ্রিয়ায় আছি, কিন্তু তারপরে? তোমাকে বলতে বাধা নেই, পরদিনও বেরিয়েছিলাম কামুক অফিসারদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে বিশেষ অন্ধকার গলিতে না ঢুকলেও সংস্পর্শ দোষে মনটা লোভাতুর ছিল, তাই ফেরার পথে মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে লোভ দাঁড়ালো চরমে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, যত টাকা লাগে লাগুক ওকে আমার চাই-ই! গিয়ে দেখি মেয়েটি একাই বসে আছে ড্রইংরুমে, পরনে হলদে জ্যাকেট, আর গাঢ় খয়েরি স্কার্ট। বললে, আসুন, আর্থার বাইরে গেছে একটি কাজের চেষ্টায়, এখুনি ফিরবে।

আমি উত্তরে কোনো কথা বলতে পারছিলাম না, অথচ ভিতরটা উত্তেজনায়

চুরমার হয়ে যাচ্ছিল ! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে মুখের ওপর এক ভদ্র ব্যক্তির মুখোস টেনে এনে বললাম, এলাম আপনাদের বিরক্ত করতে।

মেয়েটি একটু হেসে বললে, মোটেই না। আপনি আসেন, মনে হয় সাত সমুদ্র তেরো নদীর স্পর্শ আপনার গায়ে। সত্যি ! কতো বেড়ান আপনারা !

উত্তরে বললাম, তা বেড়াই। চিরকালের ছন্নছাড়া আমরা। চাল নেই, চুলো নেই, ঘর নেই।

মেয়েটি মুখ ফেরালো আমার দিকে, বললে, বিয়ে করেন নি ?

বললাম,—না। আমাদের বিয়ে করবে কে বলুন ? সামুদ্রিক যাযাবর : পোঁছে কে !

মেয়েটি উত্তরে কিছু বললো না, মুখ নিচু করে কী যেন ভাবলো। সেই সময় ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। কেমন একটা লজ্জানম্র ভাব, কেমন একটা মাধুর্যের বিকিরণ। একটুক্ষণ থেমে থেকে আমি বললাম, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমরা একটু খোলাখুলি প্রকৃতির লোক, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে এমন সব কথা বেরিয়ে যায়, যা হয়ত ঠিক শিষ্টাচার সম্মত নয়।

মেয়েটি বললে, তা নয়, আমি ভাবছিলাম আপনার কালকের কথাগুলো। ঐ যে আপনি অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলছিলেন ? সারা পৃথিবী জুড়েই বোধ হয় এই অবস্থা এখন। পণ্য আছে, বাজার নেই, কারখানা আছে, কাজ নেই। হু হু করে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। আর একটা ব্যাপার কী, জানেন ? আজকাল সবার সহানুভূতি সাধারণ শ্রমিকদের ওপর গিয়ে পড়েছে। ফলে ধনীরা আর শ্রমিকরা কাল কাটাচ্ছে একরকম। কিন্তু মধ্যবিত্তের অবস্থা শোচনীয়, বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এদের দিকে কেউ তাকায় না !

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বললাম, দারুণ চিন্তা ভাবনা করেন তো ? নিশ্চয়ই পড়াশুনা অনেক করেছেন—হয়ত গ্রাজুয়েট,—কিম্বা তারও বেশি—!

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি বললে, না বেশি নয়। কিন্তু গ্রাজুয়েট হয়েও তো কিছু হলো না, বসে আছি।

বলতে পারিনা, হয়ত এই সময়েই এসেছিল শুভ লগ্ন আমার মনের কথা বলার, কিন্তু প্রসঙ্গটি এমন, নিজেকে ভদ্র এবং শিক্ষিত বলে জাহির করবার জন্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দারুণ সুষ্ঠু এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। ফলে মেয়েটি আমাকে ঝানু অর্থনীতিবিদই ঠাউরে বসলো বোধহয়।

ইতিমধ্যে এলো আর্থার। বেচারা কাজের জন্য ঘুরছে, কিন্তু পাচ্ছে না। অবশ্য তাতে সে কি দমে ? তার ধারণা, শিগগিরই নামজাদা লেখক হয়ে উঠবে সে, অচিরেই পত্রিকা প্রসাদাৎ তার ঘরে ইজিপ্সিসিয়ান পাউণ্ডের এমন বৃষ্টি হবে যে, অভাবের উত্তাপ আর একটুও থাকবে না। মেয়েটি ভাইয়ের কথা শুনে বলে উঠলো—দয়াময় যীশু যেন তাই করেন।

আমি হাত-ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন অনেক। এর পরে কোনো ভদ্র বাড়িতে থাকা উচিত নয়। সুতরাং সভা ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু জাহাজে ফিরে আবার সেই মনোযন্ত্রণা! মেয়েটির চোখের দৃষ্টি, কথা বলার ভঙ্গিমা, যতো ভাবতে লাগলাম, ততই যেন পাগল হয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু পরের দিন আবার যখন গেলাম, তখন জামার ওপর ভদ্রতা আর শালীনতার সুদৃশ্য 'টাই' পরেই যেতে হয়েছিল। টাকা সেদিনও পকেটে। সেদিনও আর্থার বাড়ি ছিল না, এবং সেদিনও সে বসবার ঘরে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকে অভিবাদনের পালা শেষ করে বললাম, আজ কীরকম ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখছেন?

—হ্যাঁ।

বললাম, দেখুন একটা কথা।

মেয়েটি হাতের বইটি মুড়ে হাসিমুখখানা আমার দিকে তুলে বললে, কী?

হয়ত জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম তার নামটা কী, কিন্তু তা আর হলো না, তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল, বলে ফেললাম, কী বই পড়ছেন ওটা?

সে হেসে বইটি আবার খুললো, একটা অর্থনীতির বই।

বললাম, বাঃ! বাঃ! পড়াশুনো এখনো বেশ বজায় রেখেছেন আপনি! দেখুন আসলে দুনিয়ার অর্থবণ্টন-ব্যবস্থাই বড়ো জটিল। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে ঠিক পাউণ্ডগুলো জমে যায়, আর তাদের আরামে রাখতে গিয়ে মরে সব সাধারণ লোক!

এইভাবে অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বক্তৃতা অনর্গল চলতে লাগলো, ফিরে এলো আর্থার, বলা বাহুল্য সেদিনও বিরস মুখে। সেদিনও হয়ে গেল অনেক রাত, পকেটের টাকা পকেটে নিয়ে ফিরে এলাম জাহাজে। বলতে বাধা নেই, জাহাজে শুয়ে আবার সেই জ্বালায় জ্বলেছি, এবং তারও পরে যে দুদিন জাহাজ ছিল, গেছি ওদের বাড়িতে, একদিনও সে-সময় আর্থার ছিল না, আমি মেয়েটিকে মনের কথা কিছুই বলতে পারিনি, তার সান্নিধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ভদ্র থেকে ভদ্রতর হয়ে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেছি! পরে চমক ভেঙেছে, যখন আর্থার এসেছে অনেক রাত্রে শুকনো মুখে সারা শরীরে দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির বোঝা নিয়ে।

তার পরে জাহাজ ছেড়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়া পূর্ব নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই। নইলে দুই ভাই-বোনকে ঠিক দেখতে পেতাম তীরভূমিতে। এবং আশ্চর্য! চেষ্টা করেও ভুলতে পারছিলাম না তাকে। বোধ হয় চেষ্টা করলে তার অনবদ্য দেহ সৌষ্ঠব আর লাবণ্যময় মুখখানির ছবি এখুনি এঁকে দিতে পারি।

এই সময়ে ক্যাপ্টেন কেনেডি একটু থামলেন। একটুক্ষণ পরে আমিই নীরবতা ভঙ্গ করলাম, বললাম,—তারপর?

ক্যাপ্টেন বললেন, তারপর? এতক্ষণ বললাম পুরানো কথা, এবার সেদিনকার কথা শোনো। আলেকজান্দ্রিয়ার পথ হেঁটে আমি খুঁজে খুঁজে তাদেরই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বছর তিন পরের ঘটনা মাত্র, দেখলে কি আমাকে ওরা চিনতে পারবে না? ঐ ত সেই বসবার ঘরখানি! আলো জ্বলছে। সিঁড়ির ধাপে পায়ের শব্দ বেজে উঠতেই খোলা দরজা দিয়ে একটা কুকুর ছুটে এলো। পিছনে পিছনে এক বৃদ্ধা মহিলা। নমস্কার জানিয়ে আর্থারের নামটা বললাম, সৌভাগ্যক্রমে আর্থারের পুরো নামই জানতাম আমি। মহিলা একটু চিন্তা করে তাকে চিনতে পারলেন মনে হলো। বললেন, ওরা তো এখানে থাকে না!

—কোথায় থাকে?

—তা জানি না, তবে আর্থার মারা গেছে এই মাস ছয়েক হলো।

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ! গ্যালপিং টি-বি। অপারেশান করেও কিছু করা গেল না,—বৃদ্ধা বললেন,—আসলে ভেতরে ভেতরে সারা শরীরটা ক্ষয়ে গিয়েছিল, জীবনী শক্তি বলে কিছু ছিল না।

—আর, ওর বোন?

বৃদ্ধা বললেন, না। সে কোথায় আছে জানি না।

পথে নামলাম। এবং বেশ রাত করেই ফিরলাম জাহাজে। জাহাজে তখন চাপা একটা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে! ক্যাপ্টেন ফিরে এসেছে মাতাল এবং আহত অবস্থায়। আমাদেরই একজন সাধারণ নাবিক মেরেছে ক্যাপ্টেনকে। তার যুক্তি, ক্যাপ্টেন তার গার্লকে ছিনিয়ে নেবে কেন? মত্ততা ও উত্তেজনাভরে সে তার গার্ল-এর একখানা ছবিও পকেট থেকে বার করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলো। ছবিটা দেখে আমি চমকে উঠলাম। দু-একজন ছবিটি দেখে বলে উঠলেন, বাঃ! বাঃ! খাসা!

কিন্তু আমি জানি, ছবিতে যা উঠেছে সে তার কঙ্কাল, তার সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দেহসৌষ্ঠব, না, কিছুই ফোটেনি ওতে!

আবার শুরু হলো অনেকদিন পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই বৃশ্চিক যন্ত্রণা! সকাল হতে-না-হতেই সেই নাবিকটিকে অনেক জপিয়ে সেই অন্ধকার গলিতে ঢুকলাম। করাঘাত করলাম দরজায়। একটু পরেই দরজা খুলে সে আমাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন কেনেডি থামলেন। বললাম, তারপর?

ক্যাপ্টেন কেনেডি বললেন,—তারপর অনেক কথা। এমন সব ঘটনা ঘটলো যার ফলে আমি তিন বছরের জন্য সাসপেণ্ডেড হলাম। আমার সিনিয়রিটি পিছিয়ে গিয়েছিল তিন বছরের জন্য। নইলে আরও অনেক আগেই ক্যাপ্টেন হতে পারতাম।

—কিন্তু কী সে ঘটনা?

ক্যাপ্টেন বললেন, ভোর হয়ে আসছে। যা বলার তোমাকে সংক্ষেপে বলবো। তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার ইতিহাস জানো? আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরির সংবাদ শুনেছো? শুনেছো টলেমির কথা? আলেকজান্দ্রিয়া একসময় বিবিধ বিদ্যা-অনুশীলনে সত্যিকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো? কতগুলো মূর্খের হাতে পড়ে এই আলেকজান্দ্রিয়া সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরি পুড়িয়ে ছারখার করে সেদিন সে এক দানবীয় নৃত্যই হয়েছিল বটে! তখনকার বিদুষী মহিলা তরুণী হাইপেশিয়াকে তারা নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলে তার উলঙ্গ দেহটাকে রাস্তায় রাস্তায় টেনে বেড়িয়ে চূড়ান্ত অপমানের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিল। আমি যে তিন বছর আলেকজান্দ্রিয়ায় আসতে পারিনি, সেই তিন বছর আলেকজান্দ্রিয়া ও মিশর নিয়ে পড়াশুনা করেছি, আমার সেই স্বপ্নের রাণীকে আমি বিদুষী হাইপেশিয়া বলে মনে মনে ধ্যান করেছি! আর সেদিন, সেই কুখ্যাত গলির কুখ্যাত বাড়ির একটি ঘরে তাকে দেখে মনে হলো আমার হাইপেশিয়াকে নিয়ে এই মূর্খের দল বিবস্ত্র করে, হত্যা করে, চরম অপমান করেছে! তোমাকে বলবো কী, আমি জাহাজ ছাড়লাম, দুনিয়া ভুললাম, আমার হাইপেশিয়াকে অপমান থেকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্য জীবনপণ করলাম! হাতে তখন অনেক পাউন্ডই ছিল, ওকে ভর্তি করে দিলাম এক নার্সিং হোমে, কারণ শরীরে আর ওর কিছু ছিল না! আমি পাগলের মতো ওকে বলেছিলাম, তোমার দেহ তোমার লাবণ্য সব আবার আমি ফিরিয়ে দেবো! তুমি বলো, সেদিন তুমি আমার হবে! আমার হাইপেশিয়া কেঁদে উঠে বলেছিল, যেদিন প্রথম তুমি ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে দাঁড়ালে, সেদিন তোমার চোখ মুখের ভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করেছিলাম তুমি কী চাও! আমি ভাইকে বাইরে পাঠিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় বসবার ঘরে এসে বসে থাকতাম তোমার জন্য। আমার কি কিছু অদেয় ছিল সেদিন তোমার কাছে?

বলতে বলতে কী আশ্চর্য, ক্যাপ্টেনের নিজেরই গলা কেঁপে উঠলো, বললেন,—দিনের আলো ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিক চিক করে উঠছে, আর কথা বলার সময় নেই, সবাই উঠে পড়বে। শুধু এটুকু শুনে রাখো, আমার জমানো পাউন্ড শেষ হয়ে গেল, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লাম, তবু লড়াই করতে ছাড়িনি, গতর খাটিয়ে শারীরিক পরিশ্রম করে টাকা এনেছি, কিন্তু তবু আমার হাইপেশিয়াকে বাঁচাতে পারলাম না, অদৃশ্য পাখির মতো সে উড়ে চলে গেল আকাশ পথে, তার নাগাল আর পেলাম না!

চুপ করলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজের সবাই একে একে জাগতে আরম্ভ করেছে।

আমি বললাম, আজও ভুলতে পারেননি তো, তাকে?

—কী করে ভুলবো,—উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, বললেন,—তার জন্য আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি, মিশিনিও কারও সঙ্গে।

—বিয়ে করেন নি ?

—না—বলে, ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

এই ক্যাপ্টেনের কথার জের আর একটু টেনে বলতে হবে, ও'র জাতক্রোধ ছিল এরোপ্লেনের ওপর। মাথার ওপর উড়ে যেতে দেখলে এদেরই তিনি বলতেন, 'দি ডেভিল'! বলতেন—দেশ-দেশান্তরে যাওয়ার একমাত্র বাহন ছিল এই জাহাজ। আজ ঐ ডেভিলগুলো উড়ে বেড়ানোর জন্য জাহাজের প্রয়োজনও কমে গেছে, আকর্ষণও আর নেই বললে হয়! ইউলিসিস আর কলম্বাসেরা এখন আকাশ-পথে ছুটবে, জলের পথে নয়!

তবু জাহাজ আছে, আর জাহাজ থাকবেও। কী বলো ? অন্তত অখ্যাত বন্দর গুলিতে মাল বওয়ার কাজ করার জন্য জাহাজের দরকার পড়বেই। কিন্তু এই কথাটা ক্যাপ্টেন কেনেডিকে বলতে গিয়ে সেদিন ধমক খেয়েছিলাম মনে আছে। আমার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিলেন, শিপস্ হ্যাভ্ গন টু ডগস্!

॥ ১০ ॥

ক্যাপ্টেন খাঁটি সমুদ্র-মানব, ওঁর পক্ষে এ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু আমি এমন সমুদ্র-মানব না হলেও অন্তত একজন মানবের খবর জানি, যে এসব প্রতিযোগিতার কথা মনেও আনে নি। সে জাহাজী নয়, বাষ্পচালিত ওই সব বড়ো জাহাজের সঙ্গে তার কোনো সংযোগই নেই। তার সঙ্গে যে জাহাজের সংযোগ, সে হচ্ছে ছোট্ট কাঠের তৈরি সাবেকী পাল-তোলা জাহাজ। এই জাহাজের ঝাঁক আমি কোকনদ-বন্দরে দেখেছিলাম। যার একটির কথা আগেই বলেছি। এখন যার কথা বলবো, তার নাম ইয়ুসুফ। আমি তাকে ভারতের মূল মাটিতে দেখিনি, দেখেছিলাম এক অজ্ঞাত দ্বীপের অখ্যাত বন্দরে।

ভারতের ম্যাপটি সামনে মেলে ধরলে একেবারে নিচের দিকে পড়বে কেপ কমোরিন বা কন্যাকুমারী। সেখান থেকে মনে মনে সোজা একটি রেখা টানতে হবে বাঁ-দিকে। সব ম্যাপে দ্বীপটির উল্লেখ নেই, কোনো কোনো ম্যাপে আছে। ছোট্ট একটি বিন্দুর মতো দ্বীপ। কন্যাকুমারী থেকে একই অক্ষাংশে অবস্থান করছে আরব সাগরের বুকে, মালাবার উপকূল থেকে এর দূরত্ব প্রায় দুশো তিরিশ মাইল। ম্যাপে বিন্দু চিহ্নিত থাকলেও দ্বীপটা দেখতে চন্দ্রকলার মতো। ঈদের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, আবার ঘরোয়া উপমাকে টেনে আনতে পারা যায়, কুমড়োর ফালি। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ছয় মাইল হলেও এর সব থেকে চওড়া অংশটাও আধ মাইলের বেশি চওড়া নয়।

এহেন কুমড়োর ফালির মাঝামাঝি অংশকে লক্ষ্য করে জাহাজ খানিকটা এগিয়ে লঙ্গর করলো তটরেখা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। সময় তখন বিকেল বেলা। আমরা জানতাম কোচিন বন্দর থেকে আফ্রিকার উপকূলের একটি

নামকরা বন্দর 'মোম্বাসা'য় যাচ্ছি, কিন্তু পথের মধ্যে হঠাৎ গতি একটু বদল করে জাহাজ এসে পেঁছিলো এই চন্দ্রকলাটির কোলে। শুনলাম এখান থেকে কোপরা বা নারকেল খন্ডের কিছু বস্তা জাহাজ তুলে নেবে। অর্থাৎ জাহাজ ত্রে আর নড়বে না, নড়বে পরদিন। সারা রাত ধরে হয়ত কোপরা উঠবে াহাজের কোলে, ঘড়র ঘড়র শব্দে 'ডেরিক' চলবে, তার মানে ঘুমের দফা গয়া। াফ ষ্টুয়ার্ড সাহেব ত বিড়বিড় করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে চিৎপাত হয়ে ়েই পড়লো। অন্যান্য নাবিকেরা মাটি দেখলেই জাহাজের পোর্ট-সাইডে ়ে রেলিং এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কিন্তু এবার তা হলো না, যে যার াজে চলে গেল, অথবা, যাদের ছুটি হয়েছে, তারা যার যার ঘরে গিয়ে বসলো।

অর্থাৎ বোঝা গেল, বন্দরে নামবার তাড়া কারোরই নেই। অথচ আমার পায় নেই, আমাকে নামতেই হবে। আমি জাহাজের কেরানী (অবশ্য স্থায়ী), এজেন্টের অফিসে যাতায়াত, কাগজপত্রে সই, এসব আমাকেই রতে হয়। ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে বললেন,—নামবে নাকি? না নামলেও ারো, ওদের লোক একটু পরেই আসবে।

—কিন্তু কেন স্যার, এখানে দেখছি কেউই নামতে চাইছে না?

ক্যাপ্টেন একটু হেসে বললেন,—সেলাররা ইন্টারেস্ট পেতে পারে এমন কিছু খানে নেই যে! এই দ্বীপে শহর বলে কিছু নেই। গ্রাম বলতে যা বোঝায়, া-ও আছে মাত্র একটা। ভালো করে তীরের দিকে তাকিয়ে দেখো, বন্দর লতে ঐ একটা পুরানো বাতিঘর। আর অজস্র 'জ্যাঙ্ক' অর্থাৎ কাঠের জাহাজ।

—আমার কিন্তু যাবারই ইচ্ছে,—বললাম,—কিন্তু কী করে যাবো স্যার?

ক্যাপ্টেন বললেন—ওদের লঞ্চ এখনই আসবে। ওদের সঙ্গে যেয়ো।

জিজ্ঞাসা করলাম,—দ্বীপটার নাম কী?

—মিনিকয়।

মিনিকয় বলে যে কোনো দ্বীপ আছে ভারতের আশেপাশে, এ আমি জানতাম া। কারা এ দ্বীপে থাকে, কী ধরনের লোক, সে সম্বন্ধে কোনো ধারনাই ামার ছিল না।

ওদের লঞ্চ অবশ্য এলো একটু পরেই, জন তিনেক লোক ছিল লঞ্চে, তার ধ্যে যিনি আমাদের জাহাজের প্রতিনিধি, আমার কাজকর্ম তাঁরই সঙ্গে। তিনি প্রবীণ, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, এবং প্রায়শই সাদা হয়ে গেছে। াত্মপরিচয় দিলেন মিঃ রাও বলে। দরকারী কাগজপত্র সবই সঙ্গে এনেছিলেন, ার ফলে আমার আর তীরে নামবার দরকার করে না। ক্যাপ্টেন তবু আমাকে েখিয়ে ওঁকে বললেন, ইনি তীরে নামবার জন্য উৎসুক, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।

ভদ্রলোকের চোখে ছিল পুরু চশমা, তার মধ্য দিয়ে চোখটা আরও বিস্ফারিত দেখালো, বললেন, কী আশ্চর্য! দ্বীপে নামতে চান, আছে কী দ্বীপে দেখবার?

বললাম, আপনার যদি অসুবিধে হয় তো—

বাধা দিয়ে মিঃ রাও বলে উঠলেন, না-না অসুবিধে আমার আর কী! অসুবিধে আপনার! আচ্ছা, ঠিক আছে, চলুন।

ক্যাপ্টেন অল্প একটু হেসে বললেন, রাত বারোটার মধ্যে ও যাতে ফিরতে পারে সেই ব্যবস্থাই করবেন যেন!

মিঃ রাও উত্তর দিলেন,—রাত বারোটা! ঘণ্টা দু-তিন উনি ওখানে থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ! বোরিং-বোরিং! এমন একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এখানে থাকা যে কী বলবো! আমার আর বছর খানেক আছে রিটায়ার করবার, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করতে পারলে বাঁচি।

ক্যাপ্টেন আগ্রহ ভরেই ওর কথাগুলো শুনছিলেন, বললেন, এখানে ক-বছর কাটলো মিঃ রাও?

রাও বললেন, স্যার, বারো বছর—টুয়েলভ্ ইয়ারস্—ভাবতে পারেন!

—দেশে যান নি একবারও?

মিঃ রাও বললেন,—মাত্র তিনবার। প্রতি ক্ষেপে মাস খানেক কাটিয়ে এসেছি। টাকা বেশি পাবো বলে ট্রান্সফার নিয়ে এখানে এসেছিলাম, কিন্তু একঘেয়েমির শাস্তি যে এত প্রচণ্ড হতে পারে, তা কি তখন জানতাম?

ক্যাপ্টেন বললেন,—এখানে ফ্যামিলি নিয়েই আছেন আশা করি?

—ফ্যামিলি? মিঃ রাও বললেন, অবশ্য এখানে একটা বিয়ে করেছি, কিন্তু মন তো পড়ে আছে দেশের আনাচে কানাচে। দেশে আমার তিন-তিনটে সন্তান, দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। মেয়ে দুটিরই বিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, নাতি-নাতনীও হয়ে গেছে। যদিও তাদের মুখ দেখিনি এখনো। আমার ছেলে ম্যাড্রাসে চাকরি পেয়েছে একটা ফার্মে। একাউণ্টেণ্টের চাকরি। ভালোই আছে তারা। চিঠিপত্র নিয়মিত লেখে। স্ত্রী আছে দেশের বাড়িতে।

ক্যাপ্টেন বললেন, আর এখানকার ফ্যামিলি?

—ওনলি ওয়ান সন,—মিঃ রাও বললেন,—বছর ছয়েক হলো এখানকার সংসার করেছি। ছেলেটা বছর চারেকের মাত্র। আমার একটি স্টেপ সনও আছে। বিলেতে পড়ছে।

—ভেরি গুড।

রাও বললেন,—তার খরচ-খরচা সব ওর মায়ের। ওর মা এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির একজন সক্রিয় সভ্যা। মহিলা সমিতির প্রেসিডেণ্ট। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।

বলে আমার দিকে ফিরলেন, তারপরে বললেন—চলুন মিস্টার, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

লঞ্চে করে আমরা এগিয়ে চলছিলাম, স্থির জলরাশির বুকে শুভ্র রেখা এঁকে এঁকে। বিশেষ কোনো কথা হয় নি লঞ্চে বসে। ভদ্রলোকের মন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হয়ত দেশের মাটিতে ফিরে গেছে। হয়ত প্রৌঢ়া স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। হয়ত চোখের সামনে ভাসছে নাতি-নাতনীদের কল্পিত মুখগুলো।

ভাবছিলাম আমিও। ভারতের মানুষ এই দ্বীপে এসে দ্বিতীয় সংসার করছে। ছেলেও হয়েছে বছর চারেক হলো। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, স্ত্রীর আছে আগের পক্ষের সন্তান, সে গেছে বিলেতে পড়তে।

মাটিতে পা দেওয়া মাত্র আমার কিন্তু চোখ পড়েছিল তীরের কাছ ঘেঁষা নোঙর ফেলা কাঠের জাহাজগুলোর দিকে। মাল ওঠানো নামানোর পালা চলছে। রীতিমত লোকের ভিড়। আমাদের দিকে কয়েকজন মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিদেশী বলে বুঝতে পেরে কৌতূহলে তারা ফেটে পড়ছে, কিন্তু কোনো কথা বলছে না। তাদের মধ্যে একটি মানুষকেই বিশেষ করে নজরে পড়ে। খালি গা, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, বয়স আমারই মতো। রীতিমত স্বাস্থ্যবান, নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল, রঙ কালো হলেও শরীরে একটা ঝকঝকে ভাব আছে। মুখখানি পরিষ্কার কামানো, একটা ছেলেমানুষি ধরণ আছে, যা অনতিদূর থেকেও আমি অনুভব করতে পারছিলাম। চোখ দুটি বড়ো বড়ো, এবং সেই বড়ো চোখে বিস্ময় নেই, আছে অদ্ভুত একটা কৌতুকের দ্যুতি।

রাও তার দিকে তাকিয়ে এই এতক্ষণ পরে কথা বললেন, ইয়ুসুফ, একবার আমার বাড়িতে এসো, কথা আছে।

একটু জড়িত হিন্দীতে কথাগুলো বললেন রাও, সুস্পষ্ট না হলেও আমি ওঁর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুভব করলাম। লোকটি মাথা হেলিয়ে তার কথার উত্তর দিলো এবং একটা খাতায় কী লিখছিল, বোধহয় মালের হিসাব—সঙ্গে সঙ্গে তাতে মন লাগালো, যাতে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আমাদের কাছে আসতে পারে।

খুব একটা কৌতুহল যে হয়েছিল এমন নয়। আমার মন তখন আচ্ছন্ন করেছিল দ্বীপের রূপ। চন্দ্রকলার মতো এই দ্বীপ। কোলে তার সুনীল জলরাশি ছোট ছোট শুভ্রমুখ-ঢেউয়ে বিভক্ত হয়ে তীরভূমিকে গিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আর তীরের কাছাকাছি নোঙর করে আছে বহু ছোট ছোট কাঠের জাহাজ। এছাড়া আছে সোনালী বালুবেলার ওপরে-ওঠানো অসংখ্য জেলে-ডিঙি। কিন্তু এর থেকে যে চিত্র আমাকে আকর্ষণ করছিল বেশি, সেটি হচ্ছে দ্বীপের নিজস্ব রূপ। লঞ্চে করে যত এর কাছাকাছি হচ্ছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোনো গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ একটু উঁচু, তার ওপর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নারিকেল বীথি, তার পিছনে ঝাঁকড়ামাথা আরও বনস্পতি। ফাঁকে ফাঁকে কিছু কুটির, কিছু লাল টালি-ছাওয়া বাংলোবাড়ি নজরে পড়লেও অরণ্য যেন সবাইকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে মনে হচ্ছিল। অরণ্য-মেখলা ঘেরা দ্বীপও বহু দেখেছি, কিন্তু এ দ্বীপের আরণ্যক বিস্তৃতির এক বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মনে হচ্ছিল দ্বীপটি যেন একক, যেন এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার পাশে ছিলেন মিঃ রাও। কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল আমি নিঃসঙ্গ। দ্বীপের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে যেন একটা নিঃসঙ্গতার ভাব মিশে আছে।

বেশি দূর হাঁটতে হয়নি। বাংলো ধরনের মাথায় লাল টালি বসানো বাড়ি, সামনের দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। গৃহকর্ত্রী বোধহয় দূর থেকেই আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। আমরা বাড়ির খুব কাছাকাছি হবার আগেই তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছনে আরও দুটি স্ত্রীলোক, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। গৃহকর্ত্রীর পরনে সবুজ একটি লুঙ্গি, গায়ে পাতলা অর্গাণ্ডির সাদা ব্লাউজ, তার নিচে বক্ষ-বন্ধনীটা পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করা যায়। মাথার চুলে কোন বিশেষ কারুকার্য নেই, টান করে পিছন দিকে খোঁপা বাঁধা। দেখলে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স বলে মনে হয়, নাতিস্থূল এবং নাতিদীর্ঘ চেহারা, গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল না হলেও রঙটা ফর্সার দিকে। এক নজরে হলেও মনে হলো, পিছনের তরুণী দুজনের গায়ের রঙও অনুরূপ।

মিঃ রাও এগিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা আমাদের মতো করজোরে নমস্কার জানালেন, তারপরে বললেন, প্লীজ কাম ইন।

আমরা বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভদ্রমহিলা ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি, আমাদের একটু কফি পানে আপ্যায়িত করেই চলে গেলেন। কথা-বার্তা বললেন পরিষ্কার ইংরেজীতে। যা বললেন তার অর্থ হলো, মিউনিসি-প্যালিটির বৈঠক বা মিটিং আছে, উনি কাউন্সিলার, ওঁকে যেতেই হবে, আমি যেন কিছু মনে না করি, ঘরে ওঁর এক বোনকে রেখে গেলেন আমাদের 'সঙ্গ' দেবার জন্য।

বুঝলাম, সেই তরুণী দুটি ওঁর বোন। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়োটিকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন, ছোটটির বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়, কালো লুঙ্গির ওপরে চিকনের কাজ করা, সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরা, কেশ-বন্ধনে কিছু পারিপাট্য আছে, নিঃসংকোচে এসে আমাদের সামনে বসলেন আর তিনি বসামাত্রই মিঃ রাও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—আমি একটু পোষাক-আশাক বদলে আসছি, কিছু মনে করবেন না।

এই ভদ্রমহিলাও ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। বললাম, আপনারা সবাই বেশ ভালো ইংরেজী বলেন তো ?

উত্তরে অল্প একটু হাসলেন, বললেন, আমাদের এখানে মেয়েদের একটি কনভেণ্ট আছে, সেখানে আগে একজন ইংরেজ সন্ন্যাসিনী থাকতেন, সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করায় এখানকারই একটি মহিলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ চালাচ্ছেন।

বললাম, মাপ করবেন, আপনারা কি ক্রিশ্চান ?

মহিলাটি আবার একটু হেসে বললেন, না, না, ক্রিশ্চান নই। ধর্মের কোনো গোঁড়ামি আমাদের নেই। তবে ধর্মের কথা যদি বলতে হয়, ত, আমাদের মুসলিম বলতে পারেন।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম ওঁর মুখের দিকে। ভদ্রমহিলা আমার মুখের

দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার অল্প একটু হাসলেন, বললেন, মিঃ রাও অবশ্য হিন্দু, ধর্ম নিয়ে আমাদের এখানে কোনো বিরোধ নেই।

খুব নিঃসংকোচেই ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলেন। আরও কিছু সাধারণ কথাবার্তার পর তিনি বললেন, মিঃ রাও শীগগিরই রিটায়ার করবেন, দেশে ফিরে যাবেন।

বললাম, আমার কৌতুহলের জন্য মাপ করবেন। আপনার দিদি—

ভদ্রমহিলা আভাষেই আমার প্রশ্ন বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো, বললেন, আমার দিদি যাবে না, বাচ্চাটাকেও ছাড়বে না।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এতে অবাক হচ্ছেন কেন? এরকম তো হয়! আপনাদের দেশ থেকে দু'চারজন আসেন চাকরি-বাকরির ব্যাপারে। পছন দিকে যে লাইট হাউসটি আছে, যদি খানিকটা হাঁটেন তো দেখতে পাবেন, সেখানেও এক ভদ্রলোক আছেন আপনাদের দেশের। তিনিও এখানে বিয়ে করেছেন। তিনি যখন আবার বদলি হবেন বা রিটায়ার করবেন, তাঁর স্ত্রী এখানেই থেকে যাবেন।

বললাম, কিন্তু মহিলারা জেনেশুনেই তো—

—নিশ্চয়ই,—বাধা দিয়ে উনি বলে উঠলেন, জেনেশুনেই মেয়েরা বিয়ে করে।

—স্বামী দেশে ফিরে গেলে ওঁদের কী অবস্থা হবে?

—কী আবার হবে? —ভদ্রমহিলা বললেন, দরকার হলে আর একটি বিয়ে করবে। এসবে কোনো দোষ নেই।

আমি একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বলে উঠলাম, আপনারা আমাদের দেশের লোকদের খুব খারাপ মনে করেন তো? এইভাবে দেশে স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে এসে আবার বিবাহ?

ভদ্রমহিলা স্পষ্টতই হেসে ফেললেন, বললেন, কে জানে আপনাদের দেশের লোকেরা কী রকম! যেই আসে সেই এখানে দুদিন কাটাতে না কাটাতেই বদলির জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, অথবা এত একা একা অনুভব করে যে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। অবশ্য সবাই যে স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে এমন নয়। এখানে বিয়ে হয় মেয়েদের পছন্দে, ছেলেদের নয়।

আমার আরও অবাক হবার পালা। বললাম, তাহলে আপনার দিদি—

হ্যাঁ,—উনি উত্তর দিলেন—মিঃ রাওকে আমার দিদিই পছন্দ করে বিয়ে করেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল। উনিই ভঙ্গ করলেন সেই নীরবতা। বললেন, আপনাদের দেশের খবর আমরা পাই রেডিওর মারফৎ। দৈনিক পত্র-টত্রও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, তা থেকে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে যা বুঝতে পারি, তাতে আমরা অবাকই হই। অথচ, রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের দ্বীপ কিন্তু ভারতেরই অন্তর্গত।

বললাম, এখানে মনে হয় মেয়েদেরই প্রাধান্য বেশি।

উত্তর পেলাম,—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। মেয়েরাই মিউনিসিপ্যালিটি চালায়, মেয়েরাই লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করে বেশি।

আর ছেলেরা ?

মেয়েটি বললে,—ছেলেরা অধিকাংশই তো বাইরে, জাহাজে জাহাজে নাবিক হয়ে বেড়ায়। আর যারা একটু ধনী, তারা ইংল্যাণ্ড কিম্বা ফ্রান্সে পড়তে যায়। পড়াশেষের পর অনেকে ওসব জায়গাতেই চাকরি-বাকরি নিয়ে বসে যায়, দেশে আর ফেরে না।

—আর যারা এখানে থাকে ?

মেয়েটি বললে,—এখানে যারা থাকে তারাও ঐ জাহাজ সংক্রান্ত কাজেই নিযুক্ত। হয় কলের জাহাজ, নয় কাঠের জাহাজ। দেখলেন না কতো কাঠের জাহাজ তীরের কাছে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ?

—হ্যাঁ, তা দেখেছি বটে।

আমরা এই ধরনেরই আলাপে মগ্ন হয়ে আছি,—এমন সময় ভিতর থেকে এলেন মিঃ রাও। দেখেই মনে হয় স্নান-টান সেরে এলেন একেবারে। বললেন —এক্স্‌কিউজ মি, একটু দেরি হয়ে গেল। কিন্তু সে ছোকরাই বা গেল কোথায় ! তাকে যে আসতে বললাম—

হঠাই-ই এই সময় বাইরের বারান্দা থেকে আওয়াজ ভেসে এলো,—এই যে আমি এখানে।

তার উত্তরের ভাষা অবশ্যই ভাঙা ভাঙা হিন্দী।

মিঃ রাও একটু অবাক হয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, ওখানে কেন ? কতক্ষণ এসেছো ?

সে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। বললে,—অনেকক্ষণ। ওঁরা কথা বলছিলেন, তাই—

আমি ততক্ষণে মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম চোখদুটি পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে মেয়েটি তাকিয়ে আছে ছেলেটির দিকে, অদ্ভুত খুশিতে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে !

মিঃ রাও বললেন,—ঠিক আছে, আর দেরি করো না, ভদ্রলোককে নিয়ে একটু ঘুরে-টুরে দেখাও, তারপরে লঞ্চে করে ওঁকে জাহাজে পেঁছে দিয়ে এসো। বুঝলে ?

সে মাথা হেলিয়ে জানালো,—আচ্ছা।

তারপরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—আইয়ে জী।

আমি উঠলাম। আনুষ্ঠানিক ভাবে মিঃ রাও ও মেয়েটির কাছে বিদায় নিতে গেছি, মেয়েটি বললে,—চলুন আমিও সঙ্গে যাই। ও আপনাকে কী বোঝাতে কী বোঝাবে কে জানে ! যেমন জানে হিন্দী, তেমন ইংরেজী আসুন।

আমরা বাংলো বাড়িটার গেট খুলে পথে এলাম। চলতে-চলতে মেয়েটিকে ইংরেজীতেই প্রশ্ন করলাম,—এ ছেলেটি কে? তখন দেখেছিলাম কাঠের জাহাজের মাল খালাসের হিসাব কষছে। মিঃ রাওয়ের কোনো কর্মচারী হবে, তাই না? যেভাবে মিঃ রাও ওকে হুকুম করছিলেন!

মেয়েটি আমার কথা শুনে হেসে ফেললো। বললে,—না না, মিঃ রাওয়ের কোনো কর্মচারী ও নয়, ও নিজের ইচ্ছেমত কাজ-কর্ম করে। যেদিন ইচ্ছে যায়, মালের হিসাব শুধু নয়, নিজের পিঠে পর্যন্ত মাল বয়ে খালাস করে, আর নয়ত কারুর নারকেল বাগানে ফরমাশ মতো নারকেল পাড়ার ঠিকা নেয়। মিঃ রাও যে ওকে হুকুম করেন, আর ও যে তাকে সমীহ করে চলে, তার কারণ অন্য।

ছেলেটি আগে আগে চলছিল, আমরা পিছনে পিছনে, কিন্তু পাশাপাশি। একটি নারকেল বাগানের মধ্য দিয়ে আমরা চলছিলাম। লোকজন ছিল। এক জায়গায় দেখি খানিকটা অংশ ফাঁকা, আর মাটি লেপে ঝকঝকে তকতকে করা। একটি বাংলো বাড়ির বিস্তৃত উঠোন। গ্রামের ভিতরে রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। আমাদেরই গ্রাম-অঞ্চলের মতো এক বাড়ির উঠোনের ধার দিয়ে কিংবা বাগান পেরিয়ে সরু পায়ে চলা পথ এঁকে-বেঁকে গেছে। কোনো বাড়ির চৌহদ্দি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে চিহ্নিত করা, আবার কোনো বাড়ির তা-ও নেই।

যাই হোক, সেই উঠোনে পুরু নারকেলখণ্ড টুকরো টুকরো করে কেটে রোদ্দুরে শুকুতে দিয়েছিল। এখন বিকেল পড়ে আসছে বলে বড়ো বড়ো টুকরিতে তোলা হচ্ছে। এ-ব্যাপারটা আমি আগেও দেখেছি অন্য দ্বীপে। নিশ্চয় লাভের ব্যবসা। এক পলকের জন্য ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু মনে না করেন, কারণটা জানতে পারি কী?

মেয়েটি বললো, স্বচ্ছন্দে! ও এখন ট্রায়ালে আছে কি না, তাই আমাদের বাড়ির বড়োদের সবাইকেই ও সমীহ করে চলে। নইলে সমীহ করে চলবার মানুষ ও নয়। ভীষণ বেপরোয়া স্বভাবের লোক ও। বাবা-মার সঙ্গে পর্যন্ত বনে না, তাই একা থাকে। যাবেন ওর বাড়িতে?

—তা যেতে পারি।

পেছন থেকে হেঁকে মেয়েটি ওকে সেই নির্দেশই দিলো। ছেলেটি একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে সোজা পা বাড়িয়ে দিয়ে ডান দিকের একটা পথ ধরলো, একটু উঁচুতে উঠতে হয়, তবে এও নারকেলের বাগান। বললাম, ট্রায়াল কথাটা বুঝলাম না কিন্তু। কিসের ট্রায়াল?

মেয়েটির মুখখানা চাপা হাসিতে আবার ভরে গেল। বললে, সে সব শুনতে গেলে আপনার মিউনিসিপ্যালিটির সভা, হাসপাতাল, স্কুল এসব কিছুই দেখা হবে না।

বললাম, সে সব কে দেখতে চায়? আপনি বলুন।

মেয়েটি বললে, আমরা লাইট হাউসের দিকে চলেছি, জানেন? লাইট হাউসের কাছেই ওর বাড়ি।

তা হোক, বলুন।

মেয়েটি বললে, লোকটা কী করেছে জানেন ? আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি ততক্ষণে। মেয়েটি বললে, দাঁড়ালেন কেন, চলুন ? চলতে চলতেই কথা হোক। বেশি দূর নয়, এখুনি পেঁছে যাবো।

তারপর চলা শুরু করে পাশাপাশি চলতে চলতে বললে, আমি 'না' করিনি, আবার 'হ্যাঁ'ও করিনি, তাই ও ট্রায়ালে আছে। যদি বুঝি ওকে বিয়ে করা চলে, তাহলেই করবো, নইলে নয়।

কিন্তু একটা কথা—

বলুন ?

বললাম, আপনি শিক্ষিতা, ইংরেজীতে বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন, আর ও হচ্ছে একজন সাধারণ মজদুর, তাই—

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। আমাদের পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে দূরত্ব কিন্তু ততক্ষণে বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। সে লোকটিও আশ্চর্য, পিছনে মুখ না ফিরিয়ে নিজের মনেই হেঁটে চলেছে।

মেয়েটি বললে—সাধারণ শ্রমিক বা মজদুর বলে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। আসল কথা কী জানেন ? আমি আমার এই ছোট্ট দ্বীপটিকে ভীষণ ভালবাসি। কেউ যখন বলে, এখানে তেমন ক্লাব নেই, সিনেমা নেই, অমুক নেই, তমুক নেই, আমার খুব আশ্চর্য লাগে ! তেমনি, কেউ যখন বলে, জায়গাটা খুব বোরিং—একঘেঁয়ে, তখনও খুব অবাক হয়ে যাই। তারা কি সমুদ্রের ঐ ছোট ছোট ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না ? সারাদিনের পর যখন জেলেরা ডিঙিগুলোকে নিয়ে ঝাঁক বেঁধে ফিরে আসে, তখন কি খারাপ লাগে দেখতে ? সন্ধ্যের পর লাইট হাউসের আলোক-রেখা যখন নিঃসীম অন্ধকারের বুক চিরে কাউকে খুঁজে বেড়ায়, তখন আমার যে কী ভীষণ ভাল লাগে, তা আপনাকে আর কী বলবো ?

এসব কথা হাঁটতে হাঁটতেই হচ্ছিল। আমরা উঁচুতে উঠছিলাম, একথা আগেই বলেছি। কথা বলতে বলতে ঠিক এই সময় আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম, যেখান থেকে জায়গাটা আবার নিচে নেমে গেছে এবং নারকেল-বাগানের আড়াল দিয়ে সমুদ্রকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা দ্বীপের আর একটি দিক। জেলেডিঙিগুলো পাল তুলে হাঁসের মতো ঝাঁক বেঁধে তীরের দিকে ফিরে আসছে। সমুদ্রের বুকে এখন ঘোর বেগুনী রঙ লেগেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলোর মাথায় হীরের মতো শুভ্র ফেনাপুঞ্জ ঝিকমিক করছে ! দিগন্তে সার বেঁধে দাঁড়ানো সাদা মেঘের ওপরে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা ! আমি থমকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মেয়েটি বললে,—একটু বাঁদিকে তাকান, ঐ দেখুন লাইট-হাউস !

সত্যি, লাইট হাউসটিও দেখবার মতো। ছোট খাটো একটা দুর্গ যেন !

পাথর গেঁথে তৈরি। সোজা গম্বুজের মতো না উঠে অনেকটা পিরামিডের মতো আকার নিয়ে উঠেছে। ঠিক মাথার ওপরে কাঁচ-ঘেরা আলো-ঘর।

লাইট হাউসের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি ঘর পাওয়া গেল। শুনলাম, এটাই হচ্ছে ইয়ুসুফের ঘর। ইয়ুসুফ তালা খুলে আমাদের ভিতরে বসতে দিলো দুটি মোড়ায়। মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, সে নিজেও এই প্রথম এলো ওর ঘরে!

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। ইয়ুসুফ ঘরের জানালাগুলো খুলছে, আমি সেই অবকাশে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম,—আমার কথার উত্তর কিন্তু এখনো পাইনি।

মেয়েটি একটু অবাক হয়েই ঘরের চারদিক দেখছিল। সাধারণ শ্রমিক, আসবাবপত্র বলতে একটা তক্তোপোষ ছাড়া আর কিছু নেই। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে মেয়েটি বললে,—এখানকার লেখাপড়া-জানা মেয়েরা শিক্ষিত ছেলেদেরই বিয়ে করতে চায়। বিদেশী যারা চাকরি করতে আসে, তাদের দিকেও মাঝে মাঝে এই কারণেই ঝোঁকে। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন। আমাদের শিক্ষিত ছেলেরা বাইরে যেতে চায়, নিদেন পক্ষে জাহাজে। আমার এটা ভালো লাগে না। কিন্তু ঐ ওকে দেখুন, মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও যেতে দেখি না।

—তাহলে আর ট্রায়াল কেন? ওকেই বিয়ে ক'রে ফেলুন না!

মেয়েটি ততক্ষণে দেওয়ালের কুলুঙ্গির দিকে তাকিয়ে কী দেখে যেন নিদারুণ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে! ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দেখলাম। কুলুঙ্গিতে ছোট একটি বিষ্ণুমূর্তি। নিকষ কালো কষ্টিপাথরের। কী অপূর্ব সুষমা!

—এটা কী?—মেয়েটি কাছে গিয়ে ওকে প্রশ্ন করলো।

ছেলেটি উত্তর দিলো হিন্দীতে। তার অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়ঃ বহুকাল থেকে এটি ওদের বাড়িতে আছে। ওর বাবাও বলতে পারেন না কবে থেকে আছে। পুরুষানুক্রমে এটি রয়ে গেছে ওদের ঘরে। মূর্তিটি ভালো লাগায় ইয়ুসুফ মা-বাবার কাছ থেকে জোর করে এটি নিয়ে এসেছে নিজের ঘরে। ওর মুখ দেখে রোজ বাইরে বেরোয়, তাই কোনো বিপদ হয় না!

বললাম,—এটা কিন্তু হিন্দুদের মূর্তি।

—না, মেয়েটি বললে,—এটি এই দ্বীপের মূর্তি। এ-রকম মূর্তি আরও দু-একজন পেয়েছে। যাঁরা এই মূর্তি পুজো করতেন, হয়ত তাঁদেরই বংশধর আমরা।

বলতে বলতে উজ্জ্বল দুটি চোখে আমার দিকে তাকালো। বললে,—বুঝতে পেরেছেন? এর জন্যই ও মাটি ছেড়ে যেতে পারে না। মূর্তিটাকে ও ভালোবেসে ফেলেছে!

বলে, ইয়ুসুফের দিকে এগিয়ে এলো, গায়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো,—যাও, সাহেবকে সঙ্গে করে জাহাজে পেঁছে দিয়ে এসো। আজ থেকে আমি এ-ঘরেই থাকবো, কোথাও যাবো না।

ফিরে এলাম যথারীতি জাহাজে। ছেলেটি সর্বক্ষণ নির্বাক ছিল লঞ্চের মধ্যে বসে। আমিও কোনো কথা বলি নি। জাহাজে ওঠবার ঠিক আগে ওকে বলেছিলাম,—তোমরা মুসলিম না?

ও বলেছিল,—হ্যাঁ। কিন্তু তার থেকে বড়ো কথা, আমরা দ্বীপের লোক, দ্বীপ আমাদের মা-বাপ, এ-ছাড়া আর কিছু আমাদের বিশেষ করে ভাববার নেই।

বললাম,—এটা তোমার নিজের কথা? না, ঐ মেয়েটির কথা?

উত্তর দিয়েছিল,—আমাদের দুজনেরই কথা।

## ॥ ১১ ॥

হাল আর মাস্তুল ভাঙা বিধ্বস্ত জাহাজটা সেদিন বন্দরের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সমুদ্রে আসল ঘূর্ণিঝড় যে কী সাংঘাতিক বস্তু, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন। 'সেদিন' বলে আজও মনে হয়। মনে হয় একেবারে কালকের ঘটনা, চোখের সামনে যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। অথচ ঘটনাটা ঘটেছিল বহু বছর আগে। বহুদিনকার সেই জাহাজও আর নেই বলে শুনেছি, সেই বন্দরের চেহারাও গেছে বদল হয়ে, হয়ত বা পোশাক-আশাক-চরিত্রে সেই মানুষগুলিকেও আজ আর চেনা যাবে না।

জাহাজের কেরানী বলে ছোট থেকে বড়ো সবার সঙ্গেই আমার মোটামুটি যোগাযোগ ছিল। আমরা মিনিকয় দ্বীপ ছেড়ে আফ্রিকার উপকূলের দিকে চলছিলাম। অবশ্যই পূর্ব উপকূল। আমার জানা ছিল, জাহাজ পর পর দুটি বন্দরে গিয়ে থামবে, একটি জাঞ্জিবার, অপরটি মোম্বাসা। প্রথমে কোথায় যাবো আগে, তা জানা নেই। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর রেডিও অফিসার মোম্বাসাকে বেতারে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে, কথা ছিল।

আমার মনটা আচ্ছন্ন ছিল মিনিকয়ের স্মৃতিতে, বারবার আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল মিনিকয়ের সেই লাইট হাউস আর সেই মেয়েটির মুখ। জাহাজের মধ্য অংশের বাঁ দিককার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর ইঞ্জিন বিভাগের এক খালাসী। বেলা তখন ঠিক দুপুর। দিগন্তে সাদা মেঘেরা বলাকার মতো দল বেঁধে চললেও সারা আকাশটা একেবারে প্রগাঢ় নীলিমায় ঝকঝক করছে! বাতাসে জোর ছিল, আমাদের মাথায় এসে চুলগুলি এলোমেলো করে দিচ্ছিল, আর সমুদ্রে ভর্তি ছিল ছোট ছোট ঢেউ। সেই সংখ্যাতীত ঢেউগুলোর মাথায় জ্বলছিল ধবধবে সাদা ফেনা—হীরের টুকরোর মতো।

দুজনে দাঁড়িয়ে আছি নির্বাক, যে যার চিন্তায় নিবিষ্ট, হঠাৎ মনে হলো, দিগন্তের নিশ্চিন্ত মেঘের দলে একটা সাড়া পড়ে গেছে। কয়েকটা মেঘকে মুছে দিয়ে সমুদ্রে পর্যন্ত একটা ঝাপসা ধূসর বর্ণ সঞ্চারিত হয়ে পড়ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরেই ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। ক্রমে ক্রমে মনে হলো, দিগন্ত-রেখার কাছাকাছি প্রায় সব মেঘগুলোকেই গ্রাস করছে ঐ অদ্ভুত ধূসরতা,

হাওয়ায় তখন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, দূরে বৃষ্টি হলে যে রকম স্পর্শ পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম।

দেখতে দেখতে সেই আদিগন্ত ধূসরতা আমাদের জাহাজের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি হঠাৎ মুখ তুলে দিগন্তে ঐ নিঃশব্দ বিবর্ণতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে রেলিং ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল ভিতরে, সম্ভবত তার ইঞ্জিন বিভাগে। আমি ওর দ্রুত ত্রস্ত ভাব দেখে একটু অবাক হলাম। দিগন্ত থেকে তখন কিন্তু সমুদ্রের নীলিমা পর্যন্ত ধূসর করে দিয়ে কী একটা ছুটে আসছে আমাদের দিকে। টের পেলাম, সারা জাহাজ জুড়ে একটা ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে! ওপরে হুইল হাউসে ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে—ক্রি-রি-রিং—ক্রি-রি-রিং!

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেও ভাবতে লাগলাম, ভয় পাচ্ছে কেন ওরা? এ নিশ্চয়ই বৃষ্টি! মেঘের কাজল ধুয়ে বৃষ্টি আসছে দিগ্বিদিক ঝাপসা করে দিয়ে।

কিন্তু না, একটু পরেই আমার ভুল ভাঙলো। অফিসারদের কে একজন যেন আমার কাছে ছুটে এসে আমার বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে একেবারে ভিতরে এনে ফেললো। তারপরে তাড়াতাড়ি এঁটে দিলো লোহার দরজা। অতর্কিতে অমন করে টান দেওয়ায় রীতিমত হাঁপাচ্ছিলাম, বললাম, কী ব্যাপার!

সে বললে, তোমার কেবিনে যাও।

বলে, সে ছুটে অন্য দিককার দরজা বন্ধ করতে শুরু করলো।

জাহাজটা ততক্ষণে কিসের ধাক্কা খেয়ে যেন প্রবলবেগে নড়ে উঠলো। তারপর প্রচণ্ড দোলা খেলে জাহাজের যা অবস্থা হয়, তা-ই হলো। ভিতরকার অপরিসর গলি দিয়ে নিজের কেবিনে যে হেঁটে যাবো, তা-ও পারছিলাম না। মাতালের মতো টলতে টলতে কেবিনে এলাম। কেবিনের জিনিসপত্র সব একাকার। গোলাকার ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ডেকের উপর জল এসে প্রবলবেগে আছড়ে পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে! যেন কাঁচের টুকরো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ভয় পেয়ে ফোকরটা বন্ধ করলাম, তাও অতি কষ্টে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো জাহাজের কোনো অংশে। জাহাজটা হঠাৎ-ই কাত হয়ে জলের ওপর হুড়মুড় করে পড়বার মতো হলো। আমি বসেছিলাম চেয়ারে, মুহূর্তে ছিটকে গিয়ে আমার খাটের কিনারে পড়লাম। বুকের নিচের দিকে ভীষণ লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বমি ছিটকে বেরুলো। তারপরে আর কিছু মনে নেই।

বুকের পাঁজরটায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে যখন চোখ মেললাম, তখন দেখি শুয়ে আছি বিছানায়, পাশে স্টুয়ার্ড। বুকের বাঁ পাশে পাঁজরার নিচের দিকে প্লাস্টার করা। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ডানদিকে মুখ ফেরালাম। ফোকরটা কেউ খুলে দিয়েছে, দেখলাম, আকাশটা কালো। অসংখ্য তারা। জাহাজটা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার সেই দুরন্ত সোঁ সোঁ শব্দও আর নেই।

বুঝলাম, সেই অতর্কিতে-ওঠা ঝড়টা থেমে গেছে। স্টুয়ার্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। চল্লিশের মতো বয়স, বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা। আমার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে।

বললাম,—ঝড় থেমেছে?

—হ্যাঁ।

অনেক রকম ঝড় দেখেছি, জাহাজে ঝড়ের অভিজ্ঞতা আমার কম নয়, কিন্তু ঠিক এ রকম ঝড় তো কখনো দেখিনি!

মনে আছে 'ঝড়' বলতে ইংরেজী 'সাইক্লোন' শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম।

স্টুয়ার্ড বললে,—একে ঠিক সাইক্লোন বলে না। এ হচ্ছে অনেকটা টাইফুনের মতো ঘূর্ণি-ঝড়। আরব সাগরের বিশেষত্ব। হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। তবে বড়ো হিংস্র ধরণের, সামনে যা পড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। ভাগ্য খুব ভালো যে, জাহাজটা কাত হয়েও বেঁচে গেছে, ডুবে যায় নি।

বললাম,—একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনেছিলাম, ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের কিছু হয় নি তো?

স্টুয়ার্ড মুখ কালো করে বললে, হালটাই ভেঙে গেছে। জাহাজ আর চলতে পারবে না। চারদিকে এস-ও-এস পাঠিয়েছে রেডিও-অফিসার।

ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পাঁজরায় খচ করে লাগায় আবার কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়লাম। বললাম,—আমার পাঁজরার হাড় ভেঙে গেছে?

ও বললে, ডাক্তার না আসা পর্যন্ত বলি কী করে? আমরা ফার্স্ট-এড দিয়েছি, সে তো প্লাস্টার দেখেই বুঝতে পারছো।

মনটা দমে গেল। একটুক্ষণ থেমে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আমার বমি হয়েছিল, সে গুলো—

বাধা দিয়ে স্টুয়ার্ড বলে উঠলো, পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বমি নয়। রক্ত!

আর্তনাদ করে উঠলাম,—রক্ত!

—ভয় পাবার কিছু নেই,—স্টুয়ার্ড বললে,—বুকের নিচে আচমকা চোট পেলে ব্লাড বেরিয়ে আসতে পারে মুখ থেকে। ক্যাপ্টেনের কাছে ওর ওষুধ ছিল, তোমার ঠোঁট ফাঁক করে মুখে ফেলে দিয়েছি। কাজ হয়েছে। নইলে, এত তাড়াতাড়ি চোখ মেলতে পারতে না, বা কথাও বলতে পারতে না।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে স্টুয়ার্ড উঠে গিয়েছিল। একজন কুক এসে আমাকে গরম দুধ খাইয়ে গিয়েছিল এক গেলাস। উঠতে পারছিলাম না। আমার কেবিনের ছোট্ট গোলাকার জানালাটুকুই ছিল আমার সম্বল। সেখান থেকে যতটুকু দেখছিলাম, তার অনুভূতির সাহায্যে বলতে পারি, জাহাজটি আবার নড়তে আরম্ভ করেছিল প্রায় তের-চোদ্দ ঘণ্টা পরে। ফোকর দিয়ে দেখলাম, দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত্রি নেমে এলো। সুজি দিয়ে আমাদের দেশের পায়েসের মতো একটা কিছু তৈরি করে আমাকে দিয়ে গেল সেই কুকটি।

একবার আমাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইঞ্জিন-খালাসী। স্টুয়ার্ড এসে একটা বড়ি খাইয়ে দিয়ে গেল। ফলে রাত্রে ঘুমোলাম মৃত মানুষ-এর মতো।

সকালে ঘুম ভেঙেছিল বেশ একটু দেরিতে। আস্তে আস্তে নিজেই উঠে বাথরুম থেকে ঘুরে এলাম। এসে চেয়ারটিতে বসা মাত্রই মনে হলো, জাহাজটা নড়ছে। ফোকর দিয়ে যতটুকু দেখতে পেলাম, তাতে মনে হলো, অন্য ছোট ষ্টিমার, যাকে জাহাজী ভাষায় টাগ বলে, সেইরকম দুটি টাগ এসে লোহার শক্ত রশি আমাদের জাহাজের সঙ্গে লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মনের অবস্থা এমন হলো যে, আর বসে থাকতে পারলাম না। ধীরে ধীরে উঠে অ্যালিওয়ে বা ভিতরকার গলিপথে এসে দেওয়াল ধরে ধরে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ষ্টুয়ার্ড ওখানে দাঁড়িয়ে জলের দিকে ঝুঁকে কী যেন দেখছিল, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধমকে উঠলো,—পাগল হয়েছো নাকি, অ্যাঁ, অসুস্থ শরীরে উঠে এলে ?

বললাম, দেখতে এলাম। কোন বন্দরে যাচ্ছি জানো ?

—মোম্বাসা।

আমি তখন টাগ দেখছিলাম। এ-পাশে ও-পাশে দুটো টাগ জাহাজ-রূপ পথিককে যেন দুজনে দুদিক থেকে দু-হাতে সন্তর্পণে ধরে বন্দরের দিকে নিয়ে চলেছে।

দৃশ্যটি সেদিন বড়ো অদ্ভুত লেগেছিল আমার কাছে। যেন জাহাজকে নয়, আমারই ভাগ্যহত জীবনকে ধরে কেউ যেন তীরভূমিতে নিয়ে চলেছে। আমি রেলিং-এর ওপর একটু ঝুঁকে একটা টাগকে ভাল করে দেখতে গেছি হঠাৎ খচ্ করে বুকের প্রান্তে একটা প্রবল ব্যথা জেগে উঠলো! আর যাবে কোথায়! দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। জলে ডুবলে মানুষ যেমন একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে, আমার হলো ঠিক তেমনি অবস্থা। বাকিটা মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে, ষ্টুয়ার্ড দুটি হাত পেতে আমার অবশ দেহটাকে ধরে ফেলেছিল।

মোম্বাসার একটি ছোট হাসপাতালে চোখ মেললাম। জাহাজের ষ্টুয়ার্ড বা অন্য কেউ আমার আশে-পাশে ছিল না, একজন নার্স আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। নার্সটি নিগ্রো। সে বললে, ( কথাবার্তা অবশ্য হয়েছিল ইংরেজীতেই ) কেমন বোধ করছেন ?

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আমি কোথায় ?

—হাসপাতালে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর একটু দম নিয়ে বললাম, আমার বুকে প্লাস্টার, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—পাঁজরার হাড় ভেঙে গিয়েছিল, না ?

নার্সটি তরুণী, বললে, সেট করে দেওয়া হয়েছে। একুশ দিন হাসপাতালে থাকলেই মোটামুটি সেরে উঠবেন।

—আমার জাহাজ কোথায় জানো?

নার্স বললে, পোর্টে। মেরামত হচ্ছে।

আর কোনো কথা হয়নি তখন। নার্সটি আমাকে একটা ওষুধ খাইয়ে চলে গেল। শুনলাম 'ভিজিটিং আওয়ার্স' হচ্ছে বিকেলে। সাগ্রহে সেই বৈকালিক অবকাশটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কেউ এলো না আমাকে দেখতে। পরদিন? না, কেউ না। তারপর দিন? কেউ না। শুয়ে শুয়ে বারবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ছিল। সেই বোম্বে থেকে চিঠি দিয়েছিলাম, মাগো, বোম্বে এসেছি, এখান থেকে গোয়া যাবো। বুঝলে না? এভাবে না ঘুরলে লেখার উপকরণ সংগ্রহ করবো কেমন করে? এর উত্তর আশা করি নি, কারণ মাকে ঠিকানাই দেই নি, মা চিঠি দেবে কী করে? মাকে যদি জাহাজের কথা জানাতাম, তাহলে ঠিক জানাজানি হতো, মা-ও কান্নাকাটি করতো, কারণ, তখনকার দিনে জাহাজে যাওয়া মানে নানান বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া,—এই-ই ছিল সাধারণ মায়েদের ধারণা। অন্তত আমার মায়ের তো বটেই। আগে আগে বিশাখাপত্তন থেকে চিঠিতে যখন লিখতাম, সমুদ্রে স্নান করছি, তখন উত্তরে মায়ের আশঙ্কা প্রকাশ পেতো,—খুব সাবধান। ঢেউয়ে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়, পাড়ার বিন্দুদিদির ভাসুরের ছেলেকে পুরীতে অমনি করে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ভাগ্যিস একটি নুলিয়া ধরে ফেলেছিল, তাই রক্ষে! তোমার বাপু ও-সব চান-টান না করাই ভালো। মা তখনো আমার কর্মক্ষেত্র বিশাখাপত্তন বা ভাইজাগে আসে নি। সমুদ্রের ধারে বাসা, এটা শুনেই মার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এ-অবস্থায় যদি চিঠি দেই যে, আমি মোম্বাসার হাসপাতালে শুয়ে আছি বুকের পাঁজর ভেঙে তাহলে মা হয়ত নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেবে, আর ছুটবে আমার হেড-অফিসে। আমার কর্তারা সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই। ব্যস—তাহলে আর রক্ষে নেই—ঢাকে একেবারে কাঠি পড়বে!

অথচ মন তো চায়, অন্য সব রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের মতো আমাকেও কেউ দেখতে আসুক। কিন্তু বৃথাই তৃষ্ণার্ত চোখ মেলে দরজার দিকে তাকানো,—কেউ আসে না। এলো সেদিন সেই নার্সটি। বসলো আমার পাশে, টুলটা টেনে নিয়ে। বললো,—বানা, (ওদের ভাষায় সম্মানসূচক 'বাবু' বা 'মশাই'কে 'বানা' বলে) দেশে চিঠি লিখবেন?

—কে লিখে দেবে?

—আমি লিখছি। আপনি বলুন আমি টুকে নিচ্ছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—না।

নার্সটি আমার কপালে তার হাতখানা রাখলো। ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, আপনি তো ইণ্ডিয়ান?

হ্যাঁ।

কোথাকার লোক আপনি? বম্বে না, ক্যালকাটা?

—কলকাতা।

মেয়েটি কালো, কিন্তু মুখখানিতে অদ্ভুত কোমলতা মেশানো। যেন আমার কত দিনের আত্মীয় এমনি অন্তরঙ্গতার সুরে বললো—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তোমার খুব একা একা লাগে না?

আমার চোখ দুটো ছল ছল করে এলো ওর কথা শুনে। কোনক্রমে বললাম, না। ঠিক আছে।

বলতে বলতে মুখখানা পাশের দিকে ফিরিয়েছিলাম। ও আমার চিবুকের কাছটা ধরে মুখখানা ওর দিকে ফেরালো, বললে, আমি একজনকে পাঠিয়ে দিতে পারি। ভাব করবে?

কে?

ও একটু হাসলো, তোমার কথা সে শুনেছে। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

কে সে? অন্য কোনো নার্স?

ও বললে, না। হাসপাতালের সে কেউ নয়।

—তবে?

নার্সটি বললে,—কাল ভিজিটিং আওয়ার্সে তাকে নিয়ে আসবো।

বলা বাহুল্য, পরদিনও জাহাজের কেউ এলো না আমাকে দেখতে। হাসপাতালের সাধারণ বেডে এভাবে শুয়ে থাকা যে কী মর্মান্তিক, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারবে বলে মনে হয় না। আফ্রিকা কেমন দেশ জানা হলো না, জানা হলো না কেমন শহর—মোম্বাসা। অন্য অন্য রোগীরা (সবাই নিগ্রো) বিদেশী বলেই বোধ হয় কাছে আসতে চায় না। দ্বিতীয়ত ভাষাও অন্তরায়। ডাক্তার-নার্সরাই বা সময় কোথায় পাবেন আমার সঙ্গে গল্প করার? তারই মধ্যে সময় করে ঐ তরুণী নার্সটি যতটা সম্ভব আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যায়। আমার কাছে কেউ আসে না বলেই বোধ হয় একটু বাড়তি স্নেহযত্ন সে করে আমাকে। কিন্তু তারই বা অবসর কোথায়?

সেদিন বিকেলে অবশ্য চারটে বাজামাত্রই তরুণী নার্সটি এলো আমার কাছে অপর একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে। গাউন পরা, আমাদের কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মতো চেহারা। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু আমাদের থেকে তেমন বেশি কালো নয়। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত, একটু কোঁকড়ানো। আফ্রিকাবাসিনী হলেও সাধারণ নিগ্রো-চেহারার থেকে কিছুটা তফাত আছে। দৈহিক গঠনে তন্বী, তরুণী। হাতে একটি কাগজের প্যাকেটে কিছু ফল। নার্সটি আলাপ করিয়ে দিলো,—আমার বান্ধবী। যার কথা তোমাকে বলেছিলাম, সেই তিনি। মিস্ তামা।

নার্সটি চলে যাবার আগে টুল টেনে এনে ওকে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে

গেল। মেয়েটি সপ্রতিভ, ফলগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন —খান।

আমি সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা একটি মানুষ, আমাকে যে এভাবে কেউ দেখতে আসতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। চোখের পাতা ভিজে উঠলো, মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করতে লাগলাম। উনি তা লক্ষ্য করলেন কিনা জানি না, উনি বলতে লাগলেন ( ওর ভাষা ছিল ইংরেজী ), —আপনার কথা আমার বান্ধবীর কাছ থেকেই শুনেছিলাম। কী আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে আপনার জাহাজের কেউ দেখা করতে আসে না!

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম,—জাহাজীদের রকমই এই। যতক্ষণ জাহাজে আছি, ততক্ষণই তাদের মানুষ। বন্ধুত্বের অবধি নেই, কিন্তু চোখের বাইরে গেলেই কেউ কারুর নয়।

মেয়েটির মুখে অদ্ভুত একটা কোমল ভাব ফুটে উঠলো, আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, খুব কষ্ট হচ্ছিল তো একা একা?

আমি মেয়েটির দিকে এবার সোজাসুজি তাকালাম। বললাম—মিস তামা, আপনারা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আমাকে দেখেন নি কোন-দিনও—জানা নেই শোনা নেই—দেখা নেই—দেখা করতে এলেন কীভাবে?

অল্প একটু হাসলেন মিস তামা, বললেন—আমার প্রফেশন কী জানেন? নিঃসঙ্গকে সঙ্গ দান করা।

অবাক হয়ে বললাম—মানে!

কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললেন, রোজ বিকেলে চারটে নাগাদ আমি বেরিয়ে পড়ি। ফিরতে রাত দশটা। মোম্বাসা টাউনটা আপনি দেখেননি বোধহয়?

( কথাবার্তা সবই যে ইংরেজীতে। সুতরাং তুমি আপনির ব্যঞ্জনা এ-ভাষায় পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বলার ধরণে লক্ষ্য করছিলাম, এমন একটা সম্ভ্রমের সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন, যাতে আপনি ভাবটি এসে পড়া স্বাভাবিক। তারই সূত্র ধরে আমি এখন আপনি'র প্রয়োগ করে চলেছি। ) ওঁর কথার উত্তরে বললাম, না।

উনি বললেন,—শহরের কেন্দ্রে কতগুলি নামকরা হোটেল আর রেস্তোরাঁ আছে। একটি হোটেলের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট। অনেক অতিথিই আসেন নিঃসঙ্গ। তাঁদের সঙ্গদান অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে গল্প গুজব করাই আমার উপজীবিকা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আপনাকে সঙ্গদান করে আমি আমার ডিউটিই করছি।

খুব অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সেই দৃষ্টিতে উনি বোধহয় একটু বিব্রতই বোধ করতে লাগলেন। চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য নত করে নিজের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ তুললেন, বললেন,—অত অবাক হচ্ছেন কেন? জাহাজে জাহাজে ঘুরছেন, এসব কথা শোনেন নি কখনো?

মেয়েটি আমার চোখের দিকে তাকালেন, কোমল কণ্ঠে বললেন,—কে কে আছেন দেশে?

মা-বাবা—ভাই-বোন।

বিয়ে করেন নি ?

উত্তর দিলাম,—না।

মেয়েটি মুখ টিপে একটু হেসে বললেন, দেশে এমন কোন মেয়ে নেই, যাকে আপনি ভালবাসেন—এমন কেউ নেই যার স্মৃতি—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, না মিস তামা…না।

উনি বললেন, বিয়ে করবেন না দেশে ফিরে ?

বললাম, জানি না, বাপ-মা হয়ত—

এবার স্পষ্টতই একটু হেসে উঠলেন, বললেন, বাপ-মা দেখে শুনে কনে ঠিক করে দেন আপনাদের, তাই না ?

হ্যাঁ।

উনি বললেন, আমাদেরও তাই ছিল। এখন আমরা বড্ড ওয়েস্টার্ণাইজড হয়ে গেছি। আমি কিন্তু খৃষ্টান, আপনি নিশ্চয় হিন্দু ?

হ্যাঁ।

বললেন, ঐ যাঃ! ফলগুলো রয়েই গেল। খাবেন না ?

বললাম, নিশ্চয়ই খাবো, আপনি নিজে এনেছেন হাতে করে! কিন্তু এখন নয়, পরে। নার্স দেবে'খন। ও খুব যত্ন করে আমায়।

বললেন, হ্যাঁ, ও বড়ো ভালো মেয়ে।

উনি চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে। আমি বলে উঠলাম, মিস্ তামা ?

হ্যাঁ ?

বললাম, এই যে নিঃসঙ্গকে সঙ্গ দান করেন, এর জন্য ফি নেন তো ? না, হোটেল থেকে—

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না মশাই, হোটেলকেই উলটে কমিশন দিতে হয়। আমার উপার্জন ঐ অতিথিদের কাছ থেকেই।

বললাম, আচ্ছা, একটা কথা বলবো ? মনে কিছু করবেন না ?

মিস তামা মাথাটা একটু দুলিয়ে বলে উঠলেন, না না, বলুন না আপনি ?

বললাম, আমার টাকাকড়ি সব জাহাজে। আপনি আমাকে সঙ্গ দান করছেন—

বাধা দিয়ে তামা বলে উঠলেন, বেশ তো ভালো হয়ে উঠে পরে দেবেন।

ওর আন্তরিক আলাপনের স্পর্শে ক্রমশ আমি সহজ হয়ে এলাম। সত্যি বলতে কী, কোনো একজনের সঙ্গ আমার সত্যিই কাম্য ছিল সেই সময়।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হতেই উনি বিদায় নিলেন। যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আসি ?

সাগ্রহে বলে উঠলাম, কাল আসছেন তো ?

মুখ টিপে হেসে বললেন, আমার সঙ্গ ক্লান্তিকর লাগলো না তো ?

মোটেই না।

উনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন, বললেন, আসবো।

এবং সত্যি, পরদিনও এলেন। হাতে এক বাক্স ভালো খেজুর। বললাম, এসব আনেন কেন বলুন তো ?

তামা হেসে বললেন, বেশ তো, পরে দাম দেবেন।

সেদিন কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন, বললেন না তো ?

তামার মুখখানা একটু ম্লান দেখালো। বললেন, আমার বাবা নেই, ভাই বোন সব আছে দেশে। এখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। এখানে আমি একাই থাকি।

বিয়ে-থা করেন নি কেন ?

অল্প একটু হেসে বললেন, হয়ত পরে করবো। এখন সম্ভব নয়।

কেন ?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল মুখখানা। তারপরে একটু ইতস্তত করবার পর বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, আপনাকে আমি বলবো, কিন্তু এখন নয়, পরে। ভালো হয়ে উঠুন, তারপরে।

আমি ও'র হাতের ওপর হাতখানা রেখে বলে উঠলাম, কেন, এখন বলতে দোষ কী ?

দোষ কিছু নেই, তামা বললেন, তবে সব দিকে চোখ রেখেই গোপন কথা বলা উচিত। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু হাসপাতালের মতো পাবলিক প্লেসে এ প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। অন্য কেউ শুনলে বিপদ হতে পারে।

আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু বারবার মিনতি করা সত্ত্বেও উনি সেদিন বলেন নি। যে একুশ দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম, তামা প্রতিদিন এসেছেন, হাসি-ঠাট্টা-গল্প-গুজব করেছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ও প্রসঙ্গ তোলেন নি বা আমাকেও তুলতে দেন নি।

যেদিন ছুটি পাবো, তার আগের দিন সেই নার্সটি এসে বললে, তোমার জাহাজে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লোক মারফৎ। কাল বেলা দশটায় তোমাকে এসে নিয়ে যাবে।

বিকেলে তামা এলে বললাম আমার ছুটির কথা। বললাম, দেখা হবে কী করে ?

একটা কার্ড তাঁব ছোট্ট ব্যাগটা থেকে বার করে আমার হাতে দিলেন, তাতে একটি হোটেলের নাম লেখা ছিল। বললাম, ওখানে গেলে দেখা হবে তো ?

তামার উত্তর ঃ নিশ্চয়।

বললাম, অনেক টাকা পাবেন আপনি আমার কাছ থেকে। এবার সব দিয়ে দেবো।

ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর, বেশ। দেবেন।

পরদিন সকাল দশটায় চীফ অফিসার স্বয়ং এসেছিলেন আমাকে নিতে। অভিমান করে বললাম, এই একুশ দিনের মধ্যে আপনারা কেউ আমাকে একবার দেখতে এলেন না ?

চীফ উত্তর দিলেন,—কে আসবে ? জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে। ড্রাই-ডকিং হচ্ছে, পেণ্টিং হচ্ছে। যে যার কাজে ব্যস্ত। আট ঘণ্টার জায়গায় বারো ঘণ্টার ডিউটি সবার। তারপরে আর বাইরে বেরুনোর সামর্থ থাকে !

বললাম, জাহাজ ছাড়তে আর কতদিন ?

চীফ বললেন, সপ্তাহ খানেক। তার বেশি দেরি হবে না। কাল 'ড্রাই-ডক' থেকে জাহাজ বেরুবে।

—মোম্বাসায় ড্রাই-ডক আছে ?

চীফ বললেন, নিশ্চয়। মোম্বাসা ছোট পোর্ট নয়। ভাবো কী ? বেশ বড় শহর এই মোম্বাসা। পূর্ব আফ্রিকার এই কেনিয়া দেশের সব থেকে বড়ো এবং খ্যাতনামা শহর নাইরোবি, তারপরেই এই মোম্বাসা।

আরব আর পারস্য দেশের লোক এককালে এখানে বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। এখন এই বন্দর ইয়োরোপীয়ানদের হাতে প'ড়ে একটা আধুনিক বন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ভীষণ গরম এখানে, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কেনিয়ার পর্বতের দিকে তাকিয়ো, সারা আফ্রিকার মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী, 'সতেরো হাজার চল্লিশ ফিট'। চূড়োগুলি বরফে ঢাকা।

বললাম,—আপনি তো অনেক খবর রাখেন !

চীফ বললেন,—ওটা আমার স্বভাব, যেখানে যাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানবার চেষ্টা করি। যদি নাইরোবিতে যেতে পারতাম, তাহলে একটা দারুণ সফর করা যেতো। ওখানকার ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে জন্তুজানোয়ার দেখা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা।

—আর জাঞ্জিবার ?

চীফ বললেন,—হ্যাঁ, জাঞ্জিবারও দেখবার মতো। ওটা একটা দ্বীপ। ওখানকার লবঙ্গ বিখ্যাত। লোকে বলে, হাওয়া বইতে থাকলে, এক মাইল দূর দিয়ে জাহাজ যখন যায়, তখনও লবঙ্গের গন্ধ পাওয়া যায়।

বললাম,—বাঃ! পরে কিন্তু আরও শুনবো আপনার কাছ থেকে। জাহাজের আর সবাই কেমন আছে তাই বলুন। স্টুয়ার্ড কেমন আছে ?

চীফ বললেন,—শোনো নি ? ওকেও হাসপাতালে পাঠাবার কথা হয়েছিল। বাইরে জীপে করে বেড়াতে গিয়েছিল, কী ভাবে যেন 'জিট্‌সি ফ্লাই' কামড়ে দেয় ওকে। প্রবল জ্বর। বেশ ভুগলো বেচারী।

—'জিট্‌সি ফ্লাই' কী ?

চীফ বললেন,—মোম্বাসায় এসেছো, 'জিট্‌সি ফ্লাই'-এর নাম শোনো নি ? বিষাক্ত মাছি। কামড়ালেই হলো আর কী ! তবে হ্যাঁ, টাউনে নেই, আছে জঙ্গলের দিকে। তুমি যেন তালে পড়ে বেড়াতে যেয়ো না।

বললাম,—ওরে বাবা ! এই শরীর নিয়ে বেড়াবো কোথায় ?

চীফ বললেন,—বাজে বকোনা ! দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারাটি হয়েছে ! অসুখ আর তোমার কোথায় ?

জাহাজে ফিরে এসব গল্পই হতে লাগলো। ক্যাপ্টেন এ আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, কেনিয়ার পাশের রাজ্যই হচ্ছে ট্যাঙ্গানাইকা, স্থানীয় লোকেরা বলে, তানজানিয়া। বেড়াবার সুযোগ পেলে আমি প্রথমেই মোটর নিয়ে ঐ রাজ্যে চলে যেতাম। দেখে আসতাম আফ্রিকার সব থেকে উঁচু পাহাড়—কিলিম্যানজারো, উনিশ হাজার পাঁচশো পয়ষট্টি ফিট। কী হে চীফ, ঠিক বলেছি না ?

চীফ অফিসার বললেন, বিলকুল ঠিক। কিন্তু আমি টাঙ্গানাইকায় বেড়াতে হলে 'দার-এস-সালাম'-এ চলে যেতাম, তারপর সেখান থেকে রেলে চড়ে একেবারে টাঙ্গানাইকা হ্রদ ! সে নাকি দারুণ দৃশ্য !

ক্যাপ্টেন বললেন, তাহলে নাইরোবি হয়ে উগান্ডা রাজ্যে পৌছুতে পারলে আরও মজা হতো। ভিক্টোরিয়া হ্রদ আর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নাম কী নতুন করে তোমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে ?

এই রকম গল্প খুব চলতে লাগলো। সেদিন কেন, তার পরদিনও বেরুনো হয়নি, জাহাজ ড্রাই ডক ছেড়ে জেটিতে এসে লাগলো। মোম্বাসা বোম্বাইয়ের তুলনায় বড়ো বন্দর নয়, তবে বোম্বাইয়ের মতো এটিকেও অনেকটা দ্বীপ বলে ধরা যেতে পারে। পোর্টের কাছেই শহরের ফ্যাশানেবল পাড়া, অর্থাৎ কলকাতার চৌরঙ্গী আর কী ! শুধু তা-ই নয়, একটা জায়গা দেখতে অবিকল আমাদের সেই ছেলেবেলায় দেখা পুরানো এসপ্ল্যানেডের মতো। তেমনি ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, আর তার তলা দিয়ে ঘুরছে ট্রামগুলো।

সঙ্গে ছিল এই জাহাজের আর এক অফিসার সাহানী। একটি হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছি, ও বললে, ওখানে ঢুকতে দেবে না, 'ইউরোপীয়ানদের জন্য' লেখা রয়েছে দেখছো না ?

আমি বলছি ১৯৪৮ সালের গোড়ার কথা, তখনো আফ্রিকার জাগরণ শুরু হয় নি। ইয়োরোপীয়ানদের হাতে তখন সমস্ত ভালো ভালো জমি, সেই জমি ছিনিয়ে নেবার জন্য কোথাও কোথাও গোপন সংস্থা গড়ে উঠলেও ১৯৫০-এর আগে সেই বিদ্রোহ, যাকে 'মাউ মাউ বিদ্রোহ' বলা হতো, তা আত্মপ্রকাশ করেনি।

যাই হোক, সাহানীর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে হোটেলের নামটা পড়ে নিয়ে ওকে বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, চেনো ?

—নিশ্চয়—সাহানী বললে, ওখানেই তো যাচ্ছিলাম। জানো, একজন বন্ধু পেয়েছি ওখানে।

ঠাট্টা করে বললাম,—বন্ধু না, বান্ধবী ?

ও বললে, অবশ্যই বান্ধবী। এসো।

কাছেই একটা ছোট রাস্তার ওপরে, একদিকে বার—অন্যদিকে ছোট ছোট টেবিল পাতা। তারই একটির দিকে এগিয়ে গেল সাহানী। কার উদ্দেশে যেন বলে উঠলো, হ্যালো!

এগিয়ে গিয়ে দেখি, আর কেউ নয়, সেই তিনি—মিস তামা। একটা গাঢ় নীল সিল্কের গাউন পরে বসে আছেন একটি খালি টেবিলের প্রান্তে। পূর্ব-ব্যবস্থা মতো এটা নাকি আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখে গিয়েছিল সাহানী।

তামা হাসি মুখে ওকে স্বাগত জানালেন। সাহানী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে যখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তখন তামা চোখের ইশারায় আমাকে জানালেন, খবরদার, চেনা দিয়ো না।

আমিও তাই নব পরিচিতের মতো ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে একটা চেয়ারে বসলাম। যখন গিয়েছিলাম, তখন সন্ধ্যা হয়েছে সবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা বসে বসে খাবার খেলাম আর গল্প করতে লাগলাম। বলা বাহুল্য, ওরা দুজন কাছাকাছি চেয়ার টেনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েই আলাপ-আলোচনা করছিল। ঘণ্টাখানেক সময় পার হয়ে যেতেই ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন তামা, বললেন,—এক্সকিউজ মি, মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। মিঃ ব্যানার্জী, দয়া করে একবার আসুন না আমার সঙ্গে?

সাহানী অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে, তুমি ওকে চেনো?

তামা বললেন,—না। এই চিনলাম। উনি কলকাতার লোক, সেই হিসাবেই ওকে আমার একটু দরকার আছে। তুমি বসে থাকো, আমি এখুনি আসছি। চুক্তি অনুযায়ী, রাত দশটা পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গ দান করতে আমি বাধ্য। আসুন মিঃ ব্যানার্জী।

বলে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে হন হন করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন, তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন,—উঠে আসুন। এক জায়গায় যেতে হবে। কাছেই।

যন্ত্রচালিতের মতো আমি গাড়িতে উঠে বসামাত্রই উনি চট্ করে এসে আমার পাশে বসলেন। ড্রাইভারকে স্থানীয় ভাষায় কিছু নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—সাহানীর সঙ্গে দিন তিনেক হলো আমার আলাপ হয়েছে। ও-ও ভারতীয়, তবে আপনি কলকাতার লোক, আপনার সঙ্গেই আমার দরকারটা বেশি।

বললাম,—দেখুন মিস তামা, আজ কিন্তু আমি এসেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। সাহানীর সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় না থাকলেও আমি আপনার হোটেলে গিয়ে আপনাকে খুঁজে বার করতাম। আমি কিছু টাকা সঙ্গে করে এনেছি। আপনার বিল্‌টা আমি শোধ করতে চাই।

তামা অল্প একটু হেসে বললেন,—বেশ তো, শোধ করবেন।

কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমার ডেরায়।

বলে, সামনে তাকিয়ে ড্রাইভারকে আবার কী যেন বললেন। ট্যাকসি চলতে চলতে বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমাদের কলকাতার তালতলা অঞ্চলের মতো দেখতে জায়গাটা। উনি বললেন, আমার একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে, জানেন? অবশ্য, বয়সে একটু প্রবীণ। আমি তারই সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো বলে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেও আপনার মতো এশিয়ান।

এশিয়ান!

তামা বললেন, হ্যাঁ। মিঃ বানার্জী, সমস্ত জিনিসটা আপনি কিন্তু খুব গোপনে রাখবেন। এখানে অনেক ইণ্ডিয়ান আছেন, কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করতে পারি নি। সাহানী ইণ্ডিয়ান, হয়ত আমাদের সাহায্যে আসতে পারতো, কিন্তু আপনি কলকাতার লোক, আপনি উপকার করতে পারবেন সব থেকে বেশি।

ততক্ষণে ট্যাকসিটা একটি উপ গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মিস তামা সোজা হয়ে বসে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশ মতো একটা জায়গায় ট্যাকসিটা থেমে গেল। তামা বললেন, এসে গেছি মিঃ ব্যানার্জী, নামুন।

আমাদের দেশের বস্তির মতোই মাটির দেওয়ালওয়ালা বস্তি। তবে দেওয়ালগুলো খুব মোটা আর আমাদের থেকে উঁচু। মাথার টালির ধরণও অন্য রকম সুসজ্জিত মোম্বাসা শহরের মধ্যে যে এ রকম গলি আর এ রকম বাড়ি থাকতে পারে, তা ভাবা যায় না। যদিও আমি কলকাতার লোক বলে আমার চোখ এতে অভ্যস্ত।

গাড়ি থেকে নামামাত্র আমি বললাম, কতো দিতে হবে ট্যাকসিকে? আমি দেবো।

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন তামা, না, আমি এখুনি ফিরে যাবো, ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে থাকবে।

অবাক হয়ে বললাম, তারপর? আমি ফিরবো কী করে?

মিস তামা হেসে আমার হাত ধরলেন। নিয়ে গেলেন একেবারে ভিতরকার একটি ঘরে। ছোট একটি কেরোসিন তেলের টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছিল একটি মানুষ একটি খাটিয়ার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে। তার পাশে একটা বেতের ইজিচেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিলেন তামা। ততক্ষণে আমার পরিচয় পর্ব সমাধা করে দিয়েছেন তিনি। আমি মানুষটির দিকে তাকালাম অতি শীর্ণকায় একটি মানুষ, মাথার চুলগুলি খুব ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং ফরসাই, কিন্তু দেখাচ্ছে খুব পাণ্ডুর। চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু কোটরগত আমাকে দেখেই স্মিত হাসিতে মুখ তাঁর ভরে উঠেছিল। বললেন, আমার নাম হিদে, আমি জাপানীজ।

মিস তামা স্থানীয় ভাষায় ওঁকে কী যেন বললেন, উনিও উত্তর দিলেন সেই দুর্বোধ্য ভাষায়। তামা তারপরে ঝুঁকে আমার হাতের ওপর একখানা হাত রেখে বলে উঠলেন, আমি চললাম। সাহানী ওদিকে বসে আছে। আপনার যাবার ব্যবস্থা হিদে করে দেবেখ'ন।

আপনার টাকা?

আমার হাতের ওপর মৃদু একটু চাপড় দিয়ে মিস তামা বললেন, পরে দেবেন। বলে আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত চলে গেলেন বাইরে।

একটু পরেই আমি ট্যাকসিতে স্টার্ট দেবার শব্দ শুনলাম। মিঃ হিদে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি মুখ ফিরিয়ে ও'র দিকে তাকাতেই বললেন, শুয়ে আছি বলে মাপ করবেন। আমার বাঁ পা-টা সম্পূর্ণ অকেজো। বাঁ হাতটা অবশ্য এখনো পড়ে যায়নি, অল্প অল্প নাড়তে পারি।

বললাম, দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে বড়ো অদ্ভূত লাগছে।

মিঃ হিদে বললেন, ব্যাপারটা অদ্ভুতই মিঃ ব্যানার্জী। আফ্রিকায় এসেছিলাম সাত বছর আগে। তখন শরীরে ছিল যুবকের মতো অদম্য শক্তি, কিন্তু সেই শরীরই গেছে ভেঙে। জঙ্গলে সিংহের মুখ থেকে বেঁচেছি, শত্রুর বর্শার খোঁচা খেয়ে মরি নি, শেষ পর্যন্ত কাবু করলো জিটসি মাছিতে। ভুগে ভুগে শরীরের এই অবস্থা!

বললাম, কিন্তু আমি আপনার কী করতে পারি, মিঃ হিদে?

মিঃ হিদে শরীরটাকে টেনে টেনে দেওয়ালের ওপর পিঠ রেখে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলেন। বাঁ পা-টার ওপর থেকে আবরণ একটু সরে গেল। ফরসা মানুষ, কিন্তু পা খানি একেবারে নিকষ কালো। একটা ডোরা কাটা পায়জামা পরণে, পায়ের যতদূর দেখা যায়, ততটুকু দেখে আমি বিস্ময়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলাম। সরু একটা কাঠির মতো পা।

বললেন, আপনি আমার অশেষ উপকার করতে পারেন মিঃ ব্যানার্জী।

আমি কথাটা বুঝতে পারছিলাম না। হিদে আমার দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন, আফ্রিকায় এসেছিলাম উনিশশো এক চল্লিশ সালের এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে। তারিখটা আমি কখনো ভুলবো না। তখন যুদ্ধের সময়। না মিঃ ব্যানার্জী, তখনকার জাপানী সরকারের গুপ্তচর হয়ে আমি আসি নি, আমি এসেছিলাম অন্য একটা কাজ হাতে নিয়ে। আমার পাসপোর্ট ছিল না, কিছু ছিল না, ভাবতে পারেন বৃটিশ-আমেরিকা, এক কথায় মিত্র শক্তির সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কীভাবে আমি জীবন কাটিয়েছি! একবার পুলিশ আমাকে ধরে জেলেও পুরেছিল। কিন্তু রাখতে পারে নি, আমি পালিয়েছিলাম। প্যাট্রিস লুমুম্বার নাম শুনেছেন? শোনার অবশ্য কথা নয় আপনার পক্ষে। কঙ্গোর ষ্টানলিভাইলে, যাকে স্থানীয়রা বলে, কিষাণ গাণি, আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি রাজনৈতিক কর্মী, একনিষ্ঠ কর্মী, রীতিমতো শিক্ষিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষটি কালে কালে একজন যথার্থ নেতা হয়ে দাঁড়াবেন। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম।

বছর দুই হলো, আমি তামার আশ্রয়ে আছি। তামা না থাকলে আমি বেঘোরে প্রাণ দিতাম। মেয়েটা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে মোম্বাসা শহরে পড়ে আছে আমাকে নিয়ে। শহরের কাছেই একটা গ্রামের স্কুলে ও মাষ্টারির চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করতে পারলেন না।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, তাহলে তো উনি নিশ্চয় শিক্ষিতা!

হেসে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, আণ্ডার গ্রাজুয়েট। একজন সাধারণ আফ্রিকান মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত বলতে হবে। আমি ওর ইতিহাস জানি। লেখাপড়া শেখবার জন্য কী কষ্টই না করেছে। গেছে নাইরোবিতে পড়ার সুবিধা হবে বলে। সেখান থেকে উগাণ্ডার মধ্য দিয়ে কঙ্গো পর্যন্ত চলে গিয়েছিল স্কুলের পড়া শেষ করবার পর। কঙ্গোর ষ্টানলিভাইল, যাকে দেশীয়রা বলে, কিষাণ গাণি, সেখানেও কিছুদিন থেকে পড়া-শোনা করে। সেখানে বসেই পেয়েছিল কঙ্গোর বন্দর মাটাডির ডক-শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খবর। আর সেখানেই আসে লুমুম্বার সংশ্রবে। আলাপের কাল সংক্ষিপ্ত, কারণ ওকে ফিরে আসতে হয়েছিল কেনিয়ায়। অবশ্য লুমুম্বাও চলে আসেন। পরে কিনশাশা অর্থাৎ লিও-পোল্ডভাইলে। তিনিও পড়ছিলেন ওখানে খবর পেয়েছি। কিন্তু যা বলছিলাম, মিস তামা নিজের রাজ্য কেনিয়া, উগাণ্ডা, কঙ্গো, এমন কি ঘানার খবরা-খবর পর্যন্ত রাখতো। ভিতরে ছিল দেশ-প্রেম আর উদ্দীপনা। অথচ দেখুন শুধু আমার জন্য ওর সবকিছু—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করতে পারলেন না, চোখ দুটো জলে ভরে এলো নিজেকে কোনক্রমে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু যাক সে সব কথা। আমি টোকিও ফিরে যেতে চাই। কতো বছর আমি দেশছাড়া ভাবুন তো? আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—কি ভাবে?

বললেন, যদিও আমি শুনেছি আপনি পুরোপুরি সুস্থ নন, তবু বলছি, আপনার জাহাজ ছাড়ছে দিন কয়েকের মধ্যেই। যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন! আমার পাসপোর্ট নেই, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রস্তাবটা শুনে শিউরে উঠলাম। জাহাজের আমি সামান্য কেরানী, তাও অস্থায়ী। এ কঠিন কাজের জন্য উনি আমাকেই বা কেন বেছে নিলেন?

বললাম,—আমাদের জাহাজ যাচ্ছে বোম্বে।

উনি সাগ্রহে বললেন,—বোম্বেতে পেঁছে দিলেই হবে। সেখান থেকে কলকাতা যাবো ট্রেনে। কলকাতায় পেঁছতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন ওখানে, তাঁরা আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। কলকাতা থেকে প্লেনে আমি ঠিক টোকিও পেঁছে যাবো।

বললাম,—কিন্তু জাহাজে বোম্বেই বা কী করে নিয়ে যাই আপনাকে! আপনি এখানকার রাজদূতের অফিসে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—সে চেষ্টা তামা যে না করেছে এমন নয়, কিন্তু সম্ভব হয়নি। সে-সব রাজনৈতিক জটিলতার কথা না আলোচনা করাই ভালো। আপনাকে তো আগেই বলেছি, জাপানের ইমপীরিয়াল সরকারের গুপ্তচর হয়ে আমি আসি নি। রাজনৈতিক কারণেই এসেছিলাম, কিন্তু সরকারী কাজ নিয়ে নয়।

বললাম,—মিঃ হিদে, আপনার কথা আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

উনি বললেন,—মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বাঙালী, সেইজন্যই আপনাকে ডেকে আনিয়েছি। আমার সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই সমবেদনা অনুভব করবেন। সেই ১৯৪১ সালে আমি আফ্রিকায় এসেছি কোনো এক বিশেষ 'মিশন' নিয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, এশিয়ার সংহতি না গ'ড়ে উঠলে, এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তি না ঘটলে, সমগ্র প্রাচ্যদেশ স্বস্তি পাবে না, স্থায়ী শান্তিও অর্জন করতে পারবে না। মিঃ ব্যানার্জী, আপনি আপনাদের বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন! আমাকে পাঠাবার মূলে ঐ রাসবিহারী বোস। উনি আজ বেঁচে নেই, নইলে আমার মুক্তির জন্য তিনিই সর্বশক্তি প্রয়োগ করতেন।

মিঃ হিদে একটু থেমে আবার বললেন,—তাঁর কাজ আমি এখানে যথাসাধ্য করেছি। এখন আমার শরীর অপটু। আমার বুড়িমা আজও বেঁচে আছেন, আমি দেশে গিয়ে তারই কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই!

সত্যি কথা বলতে কী, ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোনক্রমে বলেছিলাম,—আমি ক্ষুদ্র মানুষ, কিন্তু আমি যথাসাধ্য করবো আপনাকে আমার দেশে নিয়ে যেতে।

আর কোনো কথা হয় নি। মিঃ হিদে ও দেশীয় একটি ছেলেকে ডেকে ট্যাক্সি আনালেন, সেই ছেলেটিই ট্যাক্সি চালককে বলে দিলো আমার গন্তব্য স্থান—সেই হোটেলের নাম।

রাত দশটা বাজতে তখনো খানিকটা দেরি আছে, হোটেলে পেঁছে আমি সাহানী কিম্বা মিস তামা, কাউকেই দেখতে পেলাম না। সেই টেবিলটি ঘটনাচক্রে শূন্য ছিল, তারই একটি চেয়ারে বসলাম। একটি ওয়েটার দেখতে পেয়ে বললে,—এখানে বসবেন না। সংরক্ষিত আসন। মিঃ সাহানী অ্যান্ড পার্টি। দেখছেন না কার্ড রয়েছে?

বললাম, সেই পার্টি'রই আমি একজন। সাহানী কোথায়?

ওয়েটার গলা নামিয়ে বললে, একটু বসুন, এখুনি আসছেন। কিছু খাবেন ততক্ষণ?

এক কাপ কফি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। একটু পরেই অবশ্য ওঁরা এলেন, হাসতে হাসতে, হাত ধরাধরি করে। একটু দূর থেকেই আমাকে দেখতে

পেয়েছিলেন তামা, হাসি থামিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

সাহানী এসে চোখ ছোট করে হাসতে হাসতে বললে,—কেমন এনজয় করলে? মিস তামা তোমাকে তার এক বান্ধবীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। কেমন মেয়েটা?

সংক্ষেপে বললাম, ভালো। সাহানী, তুমি জাহাজে ফিরবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—এখখুনি?

—হ্যাঁ।

উঠে দাঁড়ালাম,—সাহানী, তুমি তাহলে যাও, আমি মিস তামার সঙ্গে একটু কথা বলবো। আপত্তি আছে?

—আরে না-না!—সাহানী আনুষ্ঠানিকভাবে মিস তামাকে 'কাল দেখা হবে' বলে অভিবাদন জানিয়ে মুখে একটা শিস তুলে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের ছোট বয়সের সেই সেকেলে কার্জন পার্ক-এর মত একটা পার্ক ছিল কাছেই। সেইখানে নির্জনতা খুঁজে নিয়ে আমরা একটু বসলাম, বললাম,—মিঃ হিদের সব কথা আমি শুনেছি। আমি ক্যাপ্টেনকে গিয়ে আজই বলবো। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করলে সবই পারেন। ওকে একটা হ্যাচের টুইন ডেকে লুকিয়ে রাখলে পুলিশ কিম্বা কাস্টমস কেউ টের পাবে না। মনে হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

মিস তামা সব ভুলে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন, বললেন,—ওকে নিয়ে যাও—ও আর বাঁচবে না।

বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মিস তামা।

বললাম, ওকে তুমি খুব ভালবাসো, না?

মুখ তুললেন তামা, বললেন—ও সব কথা থাক। তুমি পারবে তো?

বললাম,—চেষ্টা করবো। তোমার কথাও সব শুনেছি মিঃ হিদের কাছ থেকে। তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে!

—না-না—ওসব কিছু নয়,—তামা বললেন, দেখলে না, সাহানী বেশি টাকা দেবে বলা মাত্রই ওকে নিয়ে হোটেলের ওপরকার একটা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম?

বললাম, মানুষকে সঙ্গ দেওয়াই তো তোমার উপজীবিকা।

তামা উত্তর দিলেন,—কিন্তু মাত্র সঙ্গই। আর কিছু নয়। আজ আমার প্রফেশনের বাইরে গেলাম আমি। কী করবো বলো, টাকার দরকার। ও চলে যাবে, ওর হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দেওয়া দরকার!

আমি মুখ নিচু করলাম। পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বললাম,—আমার কাছেও তোমার কিছু টাকা পাওনা আছে।

তামা ব্যাগশুদ্ধ আমার হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন,—না, আমার সব পাওনা শোধ হয়ে গেছে। তুমি ওকে শুধু সঙ্গে নিয়ে যাও, আর কিছু চাই না।

বলতে বলতে মুখখানা এক পাশে ফিরিয়ে উদগত অশ্রু রোধ করতে লাগলেন।

তার পর মুহূর্তেই আমরা উঠে পড়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, ক্যাপ্টেন আমার প্রস্তাবে প্রথমটায় ক্ষেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব শুনেটুনে কী ভেবে যেন রাজী হয়ে গেলেন। যেভাবে আমি ও স্টুয়ার্ড সবার চোখে ধুলো দিয়ে মিঃ হিদেকে জাহাজে তুলে এনেছিলাম, লুকিয়ে রেখেছিলাম দু-নম্বর ফল্‌কার টুইন ডেকে (দোতলায়)—বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সের আড়ালে,—সে অন্য ইতিহাস, অন্য কাহিনী। শুধু এটুকু এখানে বলা প্রয়োজন, যে-সন্ধ্যায় মিঃ হিদেকে নিয়ে আমরা জাহাজে উঠেছিলাম, সেটিই ছিল মোম্বাসায় আমাদের জাহাজের শেষ সন্ধ্যা। আর, সেই শেষ সন্ধ্যাতেই সাহানী গেল সেই হোটেলে, রাত দশটা পর্যন্ত তার সেই বান্ধবীর সঙ্গে 'সুখে' কাটিয়ে আসতে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসেছিল সাহানী, মনের মধ্যে অসীম বিরক্তি আর বিতৃষ্ণাকে বহন করে। বললে, জানো মিঃ ব্যানার্জী, সেই 'জঘন্য মেয়েমানুষ'টার দেখা আর পেলাম না। আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেও কোথায় কার সঙ্গে ভেগে প'ড়েছে কে জানে? ও-সব 'বাজারে' মেয়েছেলেদের 'কারবারই' আলাদা! ছ্যা-ছ্যা! আজকের সন্ধ্যাটাই মাটি!

কিন্তু আমার মন সেই 'জঘন্য মেয়েমানুষ'টির উদ্দেশেই বার বার প্রণাম জানাতে লাগলো।

## ॥ ১২ ॥

জাহাজটিকে বম্বেতে রেখে আমি ট্রেনে বিশাখাপত্তনে ফিরে এসে দেখি, ঘরে একেবারে নাটকীয় পরিস্থিতি। অফিসের দিক থেকে কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ আমাদের কোনো জাহাজ সেই সময় আসেনি। কিন্তু ছুটির নামে প্রায় দেড় মাস কাটিয়ে আসা,—এ কথা তো ভালো নয়। ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে তো? তারই ফলস্বরূপ ঘরে ঢুকতেই একেবারে মুখোমুখি মায়ের সঙ্গে দেখা। শুনলাম গত দশ দিন ধরে মা এসে এখানে রয়েছে, সঙ্গে ছোট ভাই, ইত্যাদি। হেড অফিসই তোড়জোড় করে মাকে পাঠিয়েছে। আমার উধাও হয়ে-যাওয়া নিয়ে আমার শত্রুপক্ষ গোপন চিঠিপত্র হেড-অফিসে কী প্রেরণ করেছে, তা জানি না, কিন্তু কিছু একটা যে তাঁরা ভেবে নিয়েছিল, এ বিষয়ে ভুল নেই। তারই প্রতিফলন ঘটলো মায়ের আচার-আচরণে। ছেলেকি কোনো মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়লো? এই দুশ্চিন্তারই অবশ্যম্ভাবী ফল

ফলতে দেরি হলো না। ১৯৪৮র জানুয়ারির শেষাশেষি ফিরে এসেছিলাম, আর ঐ সালের মে মাস পড়তে না পড়তেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার বিশাখাপত্তনের নীড় আর 'অবিবাহিতের গুহা' রইলো না। আমার কাজ-কারবার ঘোরাফেরা সবই বিশাখাপত্তন বন্দরকে ঘিরেই আবর্তিত হতে লাগলো।

বন্দর হিসাবে বিশাখাপত্তনেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সমুদ্রের জল 'ডলফিন নোজ' পাহাড়টির পাশ দিযে খানিকটা ঢুকে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁক নেবার পর জলধারা দুটি মূল শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। বাঁ-দিকের শাখাটি আবার খানিকটা এগিয়ে থেমে গেছে। আমি প'য়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি, জানি না সেই ধারাটি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে কি না। আর, ডানদিকের শাখা, যেখানে জেটির ওপর দেশবিদেশের বাণিজ্যতরী এসে ভেড়ে, সেই শাখাটি কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি। জেটির পরপারের কয়লা-জেটি, তার পরে জলধারার ওপর একটি সেতু; সেতু পেরিয়ে জলধারা কিন্তু সংকীর্ণতর হয়ে আরও এগিয়ে গেছে। আমি যে মানুষটির কথা এবার বলবো, সে বলেছিল, এ কিন্তু সমুদ্রের 'ব্যাক-ওয়াটার' ঠিক নয়। অনেক আগে এখানে একটি নদী এসে এইভাবেই সাগরে মিশে যেতো। পরে বন্দর তৈরি হবার পর ড্রেজার দিয়ে মাটি কেটে নদীটাকে আরও চওড়া করে ফেলা হয়, গভীর করে ফেলা হয়। তারই ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত নীল জল ভিতরে ঢুকে নদীর সেই সুপেয় সুমিষ্ট জলকে তাড়িয়ে ঐ সেতুরও পরপার পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছে। সাধারণতঃ নদী সমুদ্রের পথরোধ করে রাখে মোহানার কাছে। নীল লবণাক্ত জলের সঙ্গে নদীর সুমিষ্ট সাদা জল একটু ঠেলাঠেলিতে পড়ে মোহানার কাছে অনেকটা স্থির হয়ে থাকে। অবশ্য জোয়ারের সময় আলাদা ব্যাপার।

সে বলেছিল, জায়গাটা চওড়া হয়ে যাওয়ায়, আর গভীর হয়ে পড়ায়, নদী আর সমুদ্রকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, সমুদ্রকে ঐ সেতুর পরপার পর্যন্ত আসতে দিয়ে নিজে সরে গেছে আরও দূরে—ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—নদী যখন, তখন তার নাম একটা নিশ্চয়ই ছিল। কী বলো ?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল,—ছিল, নাম ছিল,—মেঘাদ্রী।

একটু চমকে উঠেছিলাম। কারণ, নবাগত জাহাজকে দুই হাতে ধরে নিয়ে আসার মতো করে বন্দরের ভিতরে আহ্বান করে আনলো যে দুটি ছোট ছোট 'টাগ' ( স্টীম লঞ্চ ), তার একটির নাম ছিল,—মেঘাদ্রী। এর থেকে বোঝা যায়, মেঘাদ্রী নদীর স্মৃতি ওদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি।

আলোচ্য মানুষটির চেহারা ছিল অতি সাধারণ, রং ঘোর কালো, পুরানো খাকি কিংবা ছিটের ময়লা প্যাণ্ট, তার ওপরে ময়লা ছিটের হাফ শার্ট। পায়ে বহু পুরনো মোটা স্যাণ্ডেল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কচিৎ কখনো কামাতো, মানুষটি দাক্ষিণী, কিন্তু লোকে ডাকতো চ্যাটার্জী বলে। এ নামেরও একটি ইতিহাস আছে। আমার বেশ মনে আছে, সকালের দিকেই হবে, এক নম্বর

জেটিতে বাঁধা একটা জাহাজে আমার কাজ হচ্ছে। জাহাজের গা থেকে বড় হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিয়ে ঘা দিয়ে জং ছাড়িয়ে ফেলছে আমার লোকেরা, জাহাজের গা থেকে দড়ি-বাঁধা তক্তা ঝুলিয়ে তাতে বসে তারা কাজ করছে ঠকাং ঠকাং করে বিকট আওয়াজ তুলে। আমি একটি ক্যাপস্টানের ওপর বসে ওদের কাজ দেখছি, এমন সময় মনে হলো, কে একটি লোক আমার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ালো। মুখ ফিরিয়ে স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন করলাম, কে তুমি ? কী চাও ?

লোকটি বললো, জাহাজে আপনার কাম হচ্ছে, আর সাত-আটদিন হবে, আমাকে কামে নিবেন বাবু, আমি চিঁপিং-পেণ্টিং-এর কাম জানে।

বললাম, কিন্তু কে তুমি ? কোথায় থাকো ? নাম কী ?

আমার প্রশ্নাবলীতে বোধহয় একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপরে বললে, কলকাতা থেকে এলম। আমি বাঙালী। আমার নাম—রায় চ্যাটার্জী।

ভ্রু-কুঞ্চিত করে বললাম, তুমি বাঙালী !

হ্যাঁ।

কলকাতা থেকে এসেছো ?

হ্যাঁ।

ধমকে উঠলাম, চালাকি করার আর জায়গা পাও নি ? রায় চ্যাটার্জি কারুর নাম হয় ?

—জী !

বললাম, এই তো আসল বুলি বেরিয়েছে বাবা ! 'জী' কখনো হিন্দু বাঙালীরা বলে না। আসল নাম কী ? কোথায় থাকো ? কী করে জেটির ভিতরে এলে ? ভিতরে আসতে গেলে 'পাস' লাগে, তা জানো ? নইলে পুলিশে ধরবে।

পুলিশের কথায় ওর চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বলল, গেটে ধরেছিল, আমি দূর থেকে আপনাকে দেখিয়ে বললম, আমি ওনার লোক, ওরা ছেড়ে দিলো।

ধমক দিয়ে বললাম, আস্পর্ধা তো কম নয় ! আমার লোক বলে পরিচয় দিলে কেন ? তোমাকে এখখুনি ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে দিতে পারি তা জানো ?

হাত কচলে মিনতি করে বললে, বড়ো কষ্টে আছি, কামে নেন না বাবু ! আপনি কামে নিলে আর পুলিশে ধরবে না।

বললাম, তাহলে সত্যি কথা বলো। তোমার নাম কী ?

মাথা চুলকে, ইতস্তত করে, আরও বার দুয়েক আমার ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত বললো, ধর্মরাজু।

তুমি তাহলে এখানকারই লোক ?

জী হাঁ।

এবারে তেলেগু ভাষায় কথা বলে দেখলাম, ও বুঝতে পারলো এবং স্বচ্ছন্দে ঐ

ভাষাতেই কথা বলতে লাগলো। বুঝলাম, এবার ও সত্যি কথাই বলেছে। একটু ধমকের স্বরে বললাম, নাম ভাঁড়িয়েছিলে কেন?

ও কথাটার সোজাসুজি জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বাবু, রায় চ্যাটার্জী বাঙালীদের নাম নয়?

না। রায় হতে পারে, চ্যাটার্জী হতে পারে, রায়-চ্যাটার্জী এক সঙ্গে কারুর নাম হয় না।

ও বললে, তো, রাস্তার একটা সাইনবোর্ডে যে দেখলম, লেখা আছে, রায় চ্যাটার্জী।

এবার হেসে ফেললাম। তখন ভাইজাগে আরও দু তিনটি বাঙালী ঠিকাদার কোম্পানী ছিল, তাদের মধ্যে একটি ফার্মের দুই মালিকের নামে নাম মিলিয়ে আখ্যা ছিল, রায়-চ্যাটার্জী। ওকে বললাম, আচ্ছা বোকা লোক তো! সেই সাইনবোর্ড দেখে নিজের নাম বানাতে গেছো?

ও লজ্জা পেয়ে মৃদু ভঙ্গিতে বললো, শুনলম আপনি বাঙালী, তো ভাবলম—বাংলা তো জানে—আমি বাঙালী এই কথা বললে আপনি সাথ সাথ কাম দিয়ে দিবেন।

বললাম, খুব বুদ্ধি! তাকিয়ে দেখো, ঐ যারা কাজ করছে, ওরা একজনও কি বাঙালী? সব এখানকার লোক। ওদের কাছে এসে খোঁজ খবর নিলেই জানতে পারতে। নাম ভাঁড়াবার কোনো দরকার ছিল না।

ওর মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। বললো, আপনের সর্দার নালিয়ার সাথ দেখা করলম—ওদের দল আছে বাবু, বাইরের লোককে দলে নিতে চায় না।

বললাম—কিন্তু তুমি তো ওদের দেশেরই লোক?

—না বাবু,—বললে, ওদের কাছে দেশ নয়, দলই বড়ো।

কথাটা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। একজন সামান্য মানুষ, তথা-কথিত শিক্ষার ছাপ তার নেই, কিন্তু সেদিন যে কথাটা সে বলেছিল, সেটা তার জীবনমথিত সত্য ভাষণ।

বললাম, সে যাক। কী কী কাজ জানো তুমি?

ও বললো, বাবু ছয় মাস ধরে আমি কলকাতায় চিপিং-পেণ্টিং-এর কাজ করেছিলম। লেকিন, আমি দলছুট লোক, আমাকে ওরা দলে রাখতে চায় না! তো, আমি চলে এলম দেশে। কাম দিবেন বাবু?

হ্যাঁ, কাজ ওকে আমি দিয়েছিলাম। নালিয়া সর্দার খুব খুশি হয়নি, তাই আমার নিচে যে সুপারভাইজার বাঙালী বাবুটি ছিল, তার সঙ্গে যোগ-সাজসে কলকাতায় হেড অফিসে নানান মন-গড়া অভিযোগ চিঠির আকারে পাঠাতে লাগলো। আমি সে সব তখন জানতে পারি নি। এই সব চক্রান্তই ধূমায়িত হতে হতে আমার বিশাখাপত্তন-বাসের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে। কিন্তু সে সব কথা থাক। আমি ওকে সাধারণ মজুরের কাজ দিয়েই বুঝতে পারলাম, এ-কাজে ও অসাধারণ দক্ষ। ভেবে রেখেছিলাম,

পরের জাহাজেই ওকে টিণ্ডাল করে দেবো। একদিন তাই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইঞ্জিন রুমের কাজ জানো ?

অল্প একটু হেসে বলেছিল, জানে সাব। বয়লারের কামও জানে।

কথাটা ও যে বাড়িয়ে বলেনি, তা ওকে পরের জাহাজে বয়লার ক্লিনিং-এর কাজ দিয়েই বুঝলাম। ও যেন একাই একশো। ফলে ও আমার খানিকটা প্রিয়পাত্রও হয়ে পড়লো বলা চলে। কথায় কথায় বন্ধুদের কাছে তাই ওর গল্প করেছিলাম, বিশেষ করে রায় চ্যাটার্জির অফিসের বাদলবাবুদের কাছে। খুব হাসাহাসি হলো ওর নাম নিয়ে। এ খবর ক্রমশই সাধারণ শ্রমিকরাও জেনে গিয়েছিল। তারা মজা পেয়ে ওকে 'চ্যাটার্জী' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। সেই থেকে সারা বন্দরে ওর ঐ নাম ছড়িয়ে পড়লো, ধর্মরাজু বলে ওকে আর কেউ ডাকতো না। ছোট বড়ো সবার কাছে ও, চ্যাটার্জী।

একদিন নালিয়াকে ডেকে বললাম, কাজ-কর্মতো চ্যাটার্জী ভালই করছে, ও কোথায় থাকে বলতে পারো ?

নালিয়া একটু অবাক হয়েই বললো, আপনি জানেন না ! ও বলেনি ?

—না।

নালিয়া বললো, আমাদের ঝুপড়িতে আসবার জন্য কতবার বলেছি, আসেনি। রাত্রে ও আগেভাগে শুতো বন্দরের বড়ো গেটটার কাছে ফুট-পাথে। এখন দেখছি পুলিশ, কাস্টমসদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে, বন্দরের ভিতরেই এখানে ওখানে শুয়ে থাকে। কোনো জেটি খালি থাকলে, জেটির ওপর জলের ধার ঘেঁষে শুয়ে থাকে।

—ওর কেউ নেই ?

—না বাবু। কেউ আছে বলে তো শুনিনি।

বললাম, বুঝেছি। একটা বাউণ্ডুলে লোক।

নালিয়া বললে, ঠিক বলেছেন বাবু। জাহাজে কাজ থাকলে যে রোজ পায়, তার কিছু হাতে রাখে না। নিজে ভালো করে খায়-দায় এমন নয়, নিজের সামান্য খরচটুকু চালিয়ে নিয়ে বাকিটা না জমিয়ে ভিখিরিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

আর একজন বললো, লোকটার মাথায় ছিট আছে বাবু।

ও যা-ই বলে বলুক, আমার কিন্তু এই ছিটগ্রস্ত বাউণ্ডুলে মানুষটার প্রতি কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল এই, ওসব কথা জিজ্ঞাসা করলে ও উত্তর দিতে চায় না, মুখ ফিরিয়ে অল্প অল্প হাসে শুধু।

দিনকতক আরও কাটবার পর একদিন বললাম, ওহে চ্যাটার্জী, তোমার যখন থাকবার জায়গা নেই, রাত্রে এসে আমার এই অফিস ঘরের ঢাকা বারান্দায়ও তো শুয়ে থাকতে পারো ? ক্যাম্প-খাট আছে, কোনো অসুবিধে হবে না তোমার। আর হাওয়া ? সমুদ্রের হাওয়া তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ও চুপ করে রইলো। সমুদ্রের হাওয়াতেও ওর উৎসাহ নেই দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বিছানাপত্তর কোথায় থাকে ?

উত্তর এলো, বিছানাপত্তর নাই বাবু।

তবে শোও কিসে ?

বললে,—'গানি ব্যাগ' ( চটের থলে ) খুলে জুড়ে জুড়ে সেলাই করলম, একটোতে শুই, আর একটো গায়ে দিই। ঘুম থেকে উঠে জান-পয়চানওয়ালা চায়ের দোকানটার একটা কোণে পাট করে রেখে দেই।

—বাঃ! খাসা! বালিশ ?

বললে,—ইঁট কুড়ায়ে নেই।

—আরও চমৎকার! খাঁটি বোহেমিয়ান!

মুখখানা ওর গম্ভীর হয়ে গেল, বললে,—না সার, বোহেমিয়ান আর রিয়্যালি হতে পারলাম কই ?

এবার চমকে ওঠার পালা আমার। বললাম,—ইংরেজী কথাটা তো বুঝলে দেখছি। বললেও তো বেশ! কী ব্যাপার বলো তো? সবটাই কেমন যেন হেঁয়ালি লাগছে।

ও বললে,—না সার, 'রিডল্' কিছু নাই! বাচ্ছা বেলায় ফাদারদের কাছে ছিলম, তাই একটু-আধটু ইংলিশ বলতে শিখেছিলম।

—কোন্ ফাদারদের কাছে ?

বললে,—ওই ভাইজাগে তখন একটা 'অরফ্যানেজ' ছিল, ইয়োরোপীয়ান 'মংক'রা দেখাশোনা করতো। ইণ্ডিয়া ফ্রীডম পাবার পর তারা ওয়ান-বাই-ওয়ান আপন দেশে চলে গেল।

একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বললাম,—চ্যাটাজী' তোমার আসল পরিচয়টা আমাকে বলো দেখি সত্যি করে ?

ও বললে,—আপনার কাছে যে হেলপ পেলম সার, সেটা জীবনে ভোলার নয়। তাই মিছা বলবো না আপনের কাছে। আমার কোনো বদ মতলব নাই। আমি চাই শুধু এই ভাইজাগ-পোর্টে'র সাথে মিশে থাকতে। এই পোর্ট' ছেড়ে গিয়ে আমি ভুল করলম।

—এই পোর্ট ছেড়েই বা কেন গিয়েছিলে ? কোথায়ই বা গিয়েছিলে ?

বোধহয় ওর হৃদয়ের কোনো গোপন কোমল তারে আমার কথাটা গিয়ে রিন রিন করে বাজলো। চোখ দুটি উঠলো ছলছল করে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চ্যাটাজী' বললো, দেশ ফ্রীডম পেলো, ফাদাররা চলে গেল, আমি তখন কোনখানে যাই ? এখানকার লোক আমাকে আপন ভাবলে না। মনে দুখ ছিল, বহুৎ দুখ। তো, একজনের সাথ চলে গেলাম সেই পাকিস্তান।

বললাম, পূর্ব' পাকিস্তান নিশ্চয়ই ? ( তখনো বাংলাদেশ হয় নি।)

জী হাঁ।

—সেইজন্য তোমার বাংলা বুলি এইরকম জগাখিচুড়ি ঢং নিয়েছে। কোথায় ছিলে পাকিস্তানে ?

বললে, প্রথমে ঢাকা, তারপর একা চিটাগাং-এ। সেখানে জাহাজের চিপিং পেণ্টিং-এর কাম করতম।

কী ছিলে? টিণ্ডাল?

না সার, সুপারভাইজার। লেকিন নিজের হাতে কাম করতে ভালো লাগতো। বেশ ভালো টাকাই রোজ পেতম।

চলে এলে কেন? হিন্দু বলে—

তাড়াতাড়ি ও বলে উঠলো,—না স্যার, হিন্দু বলে কোই চিনতোনা, গলায় ফাদারদের দেওয়া ক্রশ ঝুলতো, নামটাও চেঞ্জ করে নিয়েছিলম, লোকে ডাকতো জন বলে। খাতায় পত্তরে নাম ছিল,—জন পেরেরা। সে সব কুছ নয় সার, ফার্স্ট ইয়ারে কোন দুখ হয় নাই, লেকিন হালফিল মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল, ভাল লাগলো না। তাই একরোজ চান্স খুঁজে ওখান থেকে পালিয়ে এলম। পাসপোর্ট নেই কুছু নেই, কভি গাড়িতে, কভি হেঁটে অনেক কষ্ট করে চলে এলম কলকাত্তায়। জাহাজঘাটায় ঘোরাঘুরি করে বেশ কিছুদিন ভুখা থাকবার পর কুলির কাম নিলম। চিপিং-এর কাম, পেণ্টিং-এর কাম, মাল-বওয়ার কাম, যখন যা পাই। কুলির কাম করতে করতে কুলির মতন হয়ে গেলম। হাতে কুছ পয়সা জমলে পর এক রোজ একেবারে ট্রেন ধরে ভাইজাগ। আপন দেশ। এখানে আসবার পর সার, মনটা এমন দুখায় যে, মনে হয়, এই আমার দেশটা ছেড়ে এতদিন অত দূরে দূরে দেশে ছিলম কী করে?

বললাম, চ্যাটার্জী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

—কী কথা সার?

বললাম—পাকিস্তানে যে এত দিন কাটালে, ওখানে বিয়ে-সাদী·········

চ্যাটার্জী হেসে ফেলে বললে—না সার। সাদী করবো কী করে? আমি একটা বেগার, ভিখিরী।

—ইচ্ছে করে না সাদী-টাদি করে ঘর-সংসার করতে?

—না সার। পায়ে শিকল বাঁধতে চাই নাই। বেশ আছি। ভালো আছি।

বললাম, তোমার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে, সব-কিছুর পিছনে লুকিয়ে আছে গভীর কোন ব্যথা। কোন মহব্বৎ-টহব্বৎ—?

—না সার, সে সব কুছ নাই।

আমি ওর সঙ্গে যথাসম্ভব বাংলাতেই কথা বললাম, ও-ও সাড়া দিতো ওর বিচিত্র বাংলা ভাষা-কথনের মাধ্যমে। কিন্তু এবার কথা বললাম তেলেগুতে, তাহলে এই-ই তোমার কাহিনী?

—হ্যাঁ সার।

ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল মিটেছিল। ভালো লাগতো ওকে। ভালো লাগতো ওর ওই বাঁধন-ছেঁড়া বোহেমিয়ান ভাবের জন্য। আমি ওকে পরের জাহাজে সুপারভাইজারের কাজ দিলাম। বললাম, যা পাবে তাই দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করো। একটু ভালোভাবে থাকো, আস্তে আস্তে পোষাকটাও বদলাও।

ও ওর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটু হেসে চুপ করে রইলো। কিন্তু জাহাজে নালিয়া

সর্দারদের ঈর্ষাকাতর সংঘর্ষ ও অসহযোগিতার কাঁটা পার হয়েও চ্যাটার্জী যেভাবে কাজ চালালো, তাতে আমি চমকে গেলাম, কোম্পানীরও লাভ হলো।

এইভাবে দিন যায়, একদিন নালিয়া সর্দার এসে বললে, কাকে ঘর দেখতে বলেছেন বাবু? ও ঠিক পোর্টের ভিতরে জেটিতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে।

—টাকাগুলো কী করলো বলো তো? উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তো?

—তা আর বলতে!

বললাম, আচ্ছা নালিয়া, ও কি মদ-টদ খায়?

—রাম-রাম!—নালিয়া বললে, তাহলে তো কথাই ছিল না। জাহাজের কেউ দিলে-টিলে একটু-আধটু সিগারেট খায়, এ ছাড়া কোনো নেশা করে না।

এরপরে বেশ কিছুদিন আমার 'জাহাজ' ছিল না। জাহাজ নেই, তো, কাজও নেই। একদিন রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হলো, দেখে আসি তো, ও পোর্টের জেটিতে কোথায় কেমন করে শুয়ে থাকে!

আমার বাসা থেকে পোর্টের দিকে যেতে পথের মধ্যে আমাদের একজন টিণ্ডাল কৃষ্ণাদের ঝুপড়ি পড়ে। সেখান থেকে কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে পোর্টে গেলাম। কৃষ্ণা বোধহয় খোঁজখবর রাখতো। তিন নম্বর জেটি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা টিনের শেডের বারান্দায় একটা চ্যাটাই বিছিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। উপুড় হয়ে শুয়ে সামনের দিকে মুখ করে কী দেখছিল। ওর দৃষ্টির সামনে কোনো মানুষ নেই, শুধু পূর্ববর্ণিত সেতুটিকে দেখা যাচ্ছে, যার তলা দিয়ে বন্দরের জল অনেক দূর পর্যন্ত ভিতরে চলে গেছে।

—চ্যাটার্জী?

ও ধড়মড় করে উঠে বসলো, অবাক হয়ে বললে, সার! আপনে!

আমি কৃষ্ণাকে ফিরে যেতে বলে ওর চ্যাটাইয়ের ওপর বসলাম। বললাম, এখানে শুয়ে আছো। কেউ আপত্তি করে না?

ও বললে, না সার, সবাই ভালবাসে।

বললাম, তোমাকে ঘর নিতে বলেছিলাম না?

ওর কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়লো, বললে, বলবেন না সার, আমার এই-ই ভালো লাগছে।

—অতো মনোযোগ দিয়ে ওদিকে কী দেখছিলে?

ও বললে, সার, ঐ যে ব্রীজটা দেখছেন, ওটা ছাড়িয়ে জল চলে গেছে, বহুৎ দূরে, মেঘাদ্রী নদী।

—একদিন নদী দেখতে গেলে কেমন হয়?

উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো, যাবেন সার? আমি কালই আপনাকে নিয়ে যাবো!

হাতে যখন কাজ নেই, তখন কী করবো, ওকে নিয়ে পরদিন বেরিয়ে পড়লাম মেঘাদ্রীর জলধারা দেখতে। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নদী যেন মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলেছে! এই মেঘাদ্রী দেখার উৎসাহ চ্যাটার্জীর ছিল অপরিসীম।

কথা বলতে বলতে বুঝতে পারলাম, ভাইজাগ পোর্টের প্রতি ওর আকর্ষণ কতো বেশি ! আকর্ষণটাকে প্রায় অস্বাভাবিক পর্যায়ে ফেলা যায়। এবং কেন যে এই তীব্র আকর্ষণ, সেটা এখনো বুঝতে পারছি না।

তোমার চলছে কী করে ? জাহাজ তো নেই এখন !

ও চুপ করে রইলো। বললাম, টাকা দেবো ? কিছু অ্যাডভান্স ?

না স্যার।

—তবে ? চলবে কী করে ?—বললাম, না হয় তো অন্য জাহাজেই ঠিকা কাজ করো তুমি !

ও বললে, অন্য বাঙালীবাবুরা কাম দিতে চাইছে। আপনে রাগ করবেন, তাই কাম নেই নাই !

—দূর পাগল !—বললাম,—কোনো মানে হয় ! আমার জাহাজ না থাকলে অন্য জাহাজে নিশ্চয়ই কাজ করবে।

এবং এইভাবে ও অন্য অন্য জাহাজ করতে লাগলো। শুধু চিপিং বা পেন্টিং নয়, একদিন শুনলাম, ও একটা জাহাজে টালি ক্লার্কের কাজ করছে, রাখছে মাল ওঠানো-নামানোর হিসাব, আর তা খুবই দক্ষতার সঙ্গে।

কিন্তু এতো আয় করেও চ্যাটার্জীর হাল সেই আগের মতো, সেই ফাঁকা জেটিতে রাত্রিবেলা গিয়ে শুয়ে থাকা। টাকা-পয়সা সব বিলিয়ে দেয় ভিখারীদের মধ্যে। পোর্টের ফটকের কাছে এক পাল ভিখারী চিরকালই ভিড় করে থাকে, তারা ওকে দেখেই যে ভাবে ছুটে আসে, তা থেকেই বোঝা যায়, ওদের সঙ্গে চ্যাটার্জীর সম্পর্ক কতো নিবিড়।

আমাদের ক্লাবে ওকে নিয়ে কথাবার্তা হয়। একদিন বিমানবাবু বলে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন,—চ্যাটার্জী হচ্ছে জাত-বাউন্ডুলে। জোর করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সবাই হৈ-হৈ করে উঠে এ-প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলো। আমি বললাম,—তার আগে ওর একটা স্থায়ী চাকরি হওয়া দরকার।

বিমানবাবু নিজেই ঠিকাদারদের অন্যতম। তাঁর কোম্পানীর তিনিই মালিক। বললেন,—বেশ, আমি ওকে নিয়ে নিচ্ছি সুপারভাইজার করে। মাস মাইনে দুশো টাকা।

কথাটায় চমকে উঠলাম। ও বিমানবাবুর কোম্পানীতে চলে গেলে ওর মতো চৌখশ লোককে আমি হারাবো। আমার ক্ষতি হবে না ? বললাম,—না বিমানবাবু, ওকে আমিই নিয়ে নিচ্ছি এই মাস থেকে। ঐ মাইনেই আমি দেবো।

বিমানবাবু বললেন,—বেশ। কিন্তু বিয়ে ওকে দিতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, একটা রেষারেষি আরম্ভ হয়ে গেল চ্যাটার্জীকে নিয়ে। কে আগে ওর বিয়ে দিতে পারে ! বিয়ের খরচ চাঁদা করে তোলা হবে ঠিক হলো। একটা কাগজ নিয়ে তখ্খুনি সই-সাবুদ হয়ে গেল, কে কতো দেবে। তাতে

করে দেখা গেল, সহজেই আটশো টাকা উঠে যাচ্ছে। তখনকার দিনের আটশো টাকা! কম নয়! আর ওদের বিয়ের খরচ এমন কিছু বেশি হয় না।

আমি জানতাম ও আপত্তি তুলবে। কিন্তু সবার জোর-জবরদস্তিতে ও আপত্তি টিকলো না। কৃষ্ণাদের বস্তির কাছাকাছি একটা পাকাঘর কুড়ি টাকা ভাড়ায় ঠিক করা হলো। তক্তপোষ, বাক্স, বিছানা, সব কেনা হলো। কেনা হলো পোষাক-আশাক। এক কথায় ওকে আমরা জোর করে ঘরে পুরলাম। তারপরে শুরু হলো কনে খোঁজা। দেখা গেল, জাতে ও উঁচু নয়, চট্ করে মেয়ে দিতে কেউ রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণাদের চেষ্টায় জেলেপল্লী থেকেই একটি গোলগাল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দেখে আমরা ওর বিয়ে দিলাম। মেয়ের বয়স ছাব্বিশ, ওরও কম নয়, ছত্রিশ। বিয়ের হৈ-হল্লার পর চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন, কনে পছন্দ হয়েছে তো?

ওর মুখখানা গম্ভীর। বললে, আপনে এর মইধ্যে ছিলেন বলে আমি কুছ বলতে পারি নাই। লেকিন, বিয়া দিলেন কেন? আমার ইসব সয় না!

বললাম,—সয় না বলছো কী করে? অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি?

ও বললে,—না সার। আমার মন জানে—সয় না।

দূর! বাজে বকোনা! মন দিয়ে ঘর-সংসার করো!

দিন যায়। জাহাজ আসে, জাহাজ যায়, চ্যাটার্জী কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গেই করে। কিন্তু কেমন যেন মনমরা, কম কথা বলে, একটা স্থায়ী বিষণ্ণতা ওকে যেন ঘিরে রেখেছে সর্বক্ষণ! এরপর বোধহয় মাস খানেকও কাটে নি, কৃষ্ণা একদিন সকালে এলো চ্যাটার্জীর বউকে নিয়ে।

কী ব্যাপার?

বউ দক্ষিণী মেয়ে—শ্রমিক শ্রেণীর মেয়ে, ঘোমটা টানা জড়ভরত নয়। বললে, সাব ও রাতে থাকে না। একটা ব্যবস্থা করুন।

ডেকে পাঠালাম চ্যাটার্জীকে। ধমকও দিলাম। কিন্তু কে শোনে? রাত একটু বেশি হলেই ঘুমন্ত বউয়ের পাশ থেকে ও উঠে যায়। শুয়ে থাকে গিয়ে সেই তিন নম্বর জেটির দক্ষিণদিককার বারান্দায়। কতক্ষণ যে অপলক দৃষ্টিতে মেঘাদ্রীর নদীর ক্ষীণ স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে থাকে, কে জানে!

পরে শুনলাম, নিত্য অভাব লেগে থাকে ওদের। খোঁজ-খবর নিতে নিতে আরও জানলাম, ওর সেই ভিখারী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত আদৌ কমেনি। তার ফলে অভাবও ওদের প্রচুর এবং এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে। চ্যাটার্জীকে ধমক দিয়ে, চাকরির ভয় দেখিয়েও শোধরাতে পারলাম না।

এভাবে ছয় মাস আরও কেটে গেল। ওদের সংসার সুখের হয় নি, ওর বউ অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করে আমার কাছেই ছুটে আসে, চোখের জল ফেলে, নালিশ জানায়। কিন্তু আমিই বা ওদের ব্যাপারে কতদূর কী করতে পারি?

আমাদের ক্লাবে ওদের বিষয়টা ওঠে। আমার মতো সবাই-ই ওর ব্যাপারে মাথা ঘামায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে কেউই পারে না।

একদিন সন্ধ্যার পর চ্যাটাজী' নিজেই আমার কাছে এলো। মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যেন সে ভারমুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গম।

বললে, সার, আপনে সবই জানেন। বলেছিলাম, বিয়া আমার সয় না। বউ পালায়ে গেছে।

সে কী!

আমি বেঁচেছি সার।

ধমকে উঠলাম, চুপ করো তুমি। লজ্জা করে না কথা বলতে? খোঁজখবর করেছিলে?

তা একটু করেছিলাম।

খোঁজ পেলে?

চ্যাটাজী' বলতে লাগলো, একেবারে পাই নাই বললে ভুল হবে। কৃষ্ণার সঙ্গে পালায়ে চলে গেছে কলকাতায়। কী বোকা! ওখানে থাকতে পারবে? কষ্ট হোবে।

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বলা যায়। বললাম, কষ্ট হবে, তা তোমার কী! বউকে ভালবাসলে কি আর বউ পালায়? বেশ হয়েছে, তোমার মতো লোকের ওটাই হওয়া উচিত।

ও চলে গেল তখনকার মতো। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা তদারকি করলাম। জানা গেল কথাটা ঠিক। সেদিন রাত্রে আবার জেটিতে গিয়ে ধরলাম চ্যাটাজী'কে, বললাম, চলো আমার সঙ্গে। থানায় ডায়রী করবে।

ও একটু হাসলো, বললে, না সার—ও সুখী হোক। আমি তো ওকে ভালবাসতে পারলাম না!

ধমকের সুরে বললাম, কেন পারলে না? ও কি অপছন্দের মেয়ে? কী, রঙ কালো বলে—?

ও বললে, ডানাকাটা ধবধবে রঙের পরী হলেও ভালবাসতে পারতাম না।

এ-কথাটা ও অবশ্য নিজের ভাষায় বলেছিল। আমি উত্তরে তেলেগুতেই কথা বলতে লাগলাম। যা কথাবার্তা হলো, তা—এই ঃ

চ্যাটাজী' একটু থমকে থেমে তারপরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, সার, অনেক অনেক বছর আগে এই পোর্টের গেটের কাছে এই রকমই একদল ভিখারী ঘুরঘুর করতো। তাদের দলে ছোট একটি মেয়ে ছিল—ওরা তার নাম রেখেছিল, মেঘাদ্রী। তার বাপ কে, মা-ই বা কে—কেউ জানতো না। ক্রমে মেয়েটি বড়ো হলো। বড়ো হবার পর সে ভিক্ষে না করে এই পোর্টে জাহাজে মাল বইবার কাজ করতে লাগলো। এই পোর্টে যে মেয়েরাও মাল বইবার কাজ করে, এ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। মাল বয়ে বয়ে তার দিন কাটে, কিন্তু কখন যে সে এরই মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লো, তার খবর কেউ জানে না। সেই কুমারী মেয়ের গর্ভে যে সন্তান এসেছিল, সে আর কেউই নয়, আমি। আমার এই

কাহিনী, সেই যে ফাদারদের কথা বলেছিলাম, তাদের একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমার মা একবার তিন নম্বর জেটিতে এসে লাগা একটি জাহাজে রাত্রে কাজ করছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও সে কাজ করতে বাধ্য হতো, তার গ্যাংয়ের সর্দার তাকে তখনো রেহাই দিতো না। হয়ত হাল্কা কাজ দিতো, জাহাজের খোলের ভিতরে গম-বোঝাই বস্তার মুখ সেলাই করা। কিন্তু তবুও তো সেটা কাজ। লোহার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলের ভিতরে তাকে তো ওঠা-নামা করতে হতো! এই রকম অবস্থায় আমার মা এক রাত্রিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে বা উঠতে গিয়ে হাত বা পা ফসকে পড়ে যায়। পড়ে গিয়েছিল স্তুপীকৃত গমের রাশির ওপর এই যা রক্ষে। কিন্তু তখনই মায়ের ব্যথা ওঠে। আমি মায়ের কোলে অসময়ে চলে আসি এইভাবে। এইভাবে জাহাজের খোলের মধ্যেই আমার জন্ম হয়। কিন্তু আমাকে পৃথিবীতে আনবার পর মা অসুস্থ হয়ে পড়ে—প্রবল জ্বর হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চার দিনের দিন মা আমার মারা যায়। ভিখারীদের কারুর কোলে মাসখানেক থাকবার পর আমার স্থান হয় ফাদারদের আশ্রমে। তার পরের কথা তো আপনি সবই জানেন স্যার। আমি বড়ো হয়ে যখন সব শুনলাম, তখন প্রথম যে ভাবটা আমার মনে এসেছিল, সে হচ্ছে প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান। এক দল মুসলমান খালাসী পূর্ব পাকিস্তান যাচ্ছিল, তাদের একজনের সঙ্গে ভাব করে আমিও চলে গিয়েছিলাম পাকিস্তান। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগলো, দিনের পর দিন যত পার হতে লাগলো, ততই আমার মনের ভাব বদলাতে লাগলো। আমার মন কাঁদতে লাগলো ভাইজাগ বন্দরের জন্য। এলাম পালিয়ে কলকাতায়। তখন ভিতরের কান্নাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছি। কী হবে ভাইজাগে গিয়ে? কে আছে আমার ভাইজাগে? কিন্তু ক্রমাগত মনকে এ কথা শোনাতে থাকলেও মন শেষ পর্যন্ত বারণ শুনলো না। ছুটে এলাম ভাইজাগে। আপনার দয়ায় জাহাজে কাজ পেলাম। আর,—জাহাজে কাজ করতে করতে আমার সেই হারানো না-দেখা মায়ের জন্য মনটা কেমন করতে থাকলো। সব দেখে-শুনে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার মায়ের কোনো দোষ ছিল না। সে গরিব, সে ভিখারী, সে আত্মরক্ষা করবে কেমন করে? মায়ের নাম মেঘাদ্রী, আর ঐ মরা নদীর নামও মেঘাদ্রী, তাই আমি রাত্রে, ঐ তিন নম্বর জেটির পিছনে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণ মেঘাদ্রীর লুপ্তপ্রায় ধারার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি। মা ভিখারীদের দলে থেকে ভিক্ষে করতো বলে, ভিখারী মেয়ে দেখলেই আমার বুকটা মায়ের জন্য মুচড়ে উঠতে থাকে! ওদের ছোট-বড়ো সবার মুখের দিকে তাকাই, আর সবাইকে আমার মা মনে হয়! মায়ের জন্য সন্তান সর্বস্ব পণ করে থাকে, কিন্তু আমি আর ওদের জন্য করতে পারি কতটুকু?

বলতে বলতে—অত বড়ো মানুষটা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

আমি ওর কাঁধে হাতখানা রাখলাম। বললাম,—আমার আর কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু বলবো, এ-জেটি ছেড়ে যেয়ো না।

ও বুঝি অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হলো, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?

চ্যাটার্জী সত্যিই আর কোথাও যায় নি ভাইজাগ ছেড়ে। আজকাল ওর কথা যখনই মনে পড়ে, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিন নম্বর জেটির পিছন দিকটার অংশটুকু। মনে হয় এখনো নির্জন রাত্রিতে ও ওখানেই শুয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে যার 'মরুপথে হারালো ধারা' সেই—মেঘাদ্রীর দিকে। ঘর নেই—সংসার নেই—স্ত্রী নেই—পুত্র নেই, ওর অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনাই বুঝি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই অবজ্ঞাত, অবহেলিত নদীটির ওপর, যার নাম—মেঘাদ্রী।

## ॥ ১৩ ॥

আমার বিবাহিত জীবনের মাস ছ'য়েক কেটে যাবার পর নবপরিণীতাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ঘাটশিলায় যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সেইমতো ছুটিও নিলাম কিছুদিনের জন্য। ততদিনে আমার মা ফিরে গেছে কলকাতায় ভাইয়ের সঙ্গে। অফিসে মালিকপক্ষের ছোটভাই নিজে এখানে কর্মরত, সুতরাং অফিস নিয়ে চিন্তা নেই। সেজন্য আমাদের জাহাজ যখন আসবে না, এমন একটা সময় বেছে নিয়েই এই ছুটির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ঘাটশিলা আমার পুরানো জায়গা, সেজন্য স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবো বলে একটু বেশিদিনের ছুটিই চেয়েছিলাম। ওঁরা জাহাজের আবির্ভাব-তালিকা দেখে ঐ সময় জাহাজ আসবার যে কোনো সম্ভাবনা নেই, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। রসিকতা করে বলেছিলেন, হনিমুনে যাও!

যাইহোক, অফিস-সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করবার পর প্রস্তুত হয়ে বসে আছি নির্দিষ্ট দিনে রওনা হবো বলে, নবপরিণীতাও তার মামাবাড়ি (তার পিতামাতা শৈশবেই বিগত, সেজন্য মামাদের কাছে মানুষ) ঘাটশিলায় যাবার আনন্দে মশগুল হয়ে আছে, এমন সময় হঠাৎ আবার একটি আহ্বান এলো জাহাজে গিয়ে ওঠবার। জাহাজ অবশ্য বিলেত-টিলেত যাচ্ছে না, নেহাতই দিশী জাহাজ এবং যাবে দেশের আশেপাশেই। তবে নতুন নতুন জায়গা দেখার এ-ও তো একটা সুযোগ? যিনি এই ব্যবস্থা করবার মূলে, সেই আমার পরম সুহৃদ মিঃ রাও বললেন,—অবশ্য তুমি নতুন বিয়ে করেছো, এখন তোমাকে বলাও মুশকিল, তবু সুযোগটা আসায় প্রথমে তোমার কথাই মনে হলো। যাবে? না, অন্য কাউকে—

বাধা দিয়ে বললাম,—জাহাজ কোথা থেকে ছাড়বে?

—কলকাতা।

চমকে উঠলাম। মনে হলো, সত্যিই এটা আমার কাছে একটি পরম সুযোগ। কলকাতার ছেলে আমি, ভাগীরথী দিয়ে ভয়াবহ 'জেমস-মেরী চড়া' পেরিয়ে

গঙ্গাসাগরকে বাঁয়ে রেখে কখনো সমুদ্রে গিয়ে পড়ি নি। অথচ কলকাতায় গিয়ে জাহাজে ওঠার বিপদও আছে। আমার হেড-অফিসের লোকেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সেটা কোনরকমে এড়িয়েই কাজটা করতে হবে আর কী! আমি একটু চিন্তা ক'রে শেষ পর্যন্ত সবরকম দ্বিধা কাটিয়ে রাওকে বললাম,—রাজী।

ভেরি গুড!—রাও বললেন,—আজই ট্রাঙ্ক-কলে কলকাতায় আমাদের হেড-অফিসে সব জানিয়ে দিচ্ছি। পেপার্স সব রেডি করে রাখবো, তুমি কাল সকালেই কালেক্ট করে নিয়ো। ও-কে?

—ও-কে!

এসব কথা নবপরিণীতাকে জানানো যায় না। কিন্তু ট্রেনে উঠে প্রথম শ্রেণীর কুপোতে পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে মনে হচ্ছিল, আমিই বা ওকে ছেড়ে থাকবো কী ক'রে,—এই একটা মাস?

তার ওপরে সে যখন আমাকে একান্তে পেয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে আমাকে ঘাটশিলার ডাহিগড়া-হাতিজোবড়া মৌ ভাণ্ডার প্রভৃতি তার অতি পরিচিত জায়গার কোথায় কোথায় বেড়াবে, সেই সব তালিকা উপস্থাপিত করছিল, তখন মনটা স্বভাবতই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের পর এই ছয় মাস কাজের চাপ ছিল প্রচুর, যার ফলে ওকে আমি সময় দিতে পেরেছিলাম কতটুকু? সেজন্য ঘাটশিলাতে একান্ত করে সে আমাকে পেতে চেয়েছিলো, মনের মতো জায়গায় বেড়াবে আশা করে বসেছিল। মনে হলো, দূর ছাই, কী হবে ওকে বঞ্চিত করে? রইলো জাহাজ, ঘাটশিলা পেঁাছেই রাওকে টেলিগ্রাম করে দেবো,—দুঃখিত। যেতে পারছি না।

কিন্তু ঘাটশিলায় পদার্পণ করবার পর মনটা দোটানায় পড়লো। 'কী-করি—কী করি' ভাবতে ভাবতে টেলিগ্রাম আর করা হলো না। ওদিকে নব-পরিণীতাকে নিয়ে ফুলডুংরি, রাতমোহানা, হাতিজোবড়ার শালবন প্রভৃতিতে বেড়িয়ে খুব ছবি তুললাম আমার ক্যামেরায়। কিন্তু তারপরই মনটা পালাই-পালাই করতে লাগলো। রাত্রে একান্তে তাকে কাছে পেয়ে বললাম,—কাল কলকাতা যাবো।

—সে কী!

প্রিয়াকে বাহুপাশে বেঁধে নিয়ে বললাম,—বুঝছো না? এতদূরে এসেছি ভাইজাগ থেকে, আর দুই পা ফেলে কলকাতায় গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবো না? আমি দিন কয়েক থেকেই ফিরে আসবো।

কিছু বললো না বটে, কিন্তু সে যে বিশেষ মনক্ষুণ্ণ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—গিয়েই চিঠি লিখবো, কেমন?

সে তখনো কোনো উত্তর দিলো না।

কলকাতায় পেঁাছে মা-বাবার থেকে বেশি দরকার ছিল মিঃ রাওদের হেড-অফিসে গিয়ে দেখা করবার। কাগজপত্র পেশ করে ভাবছিলাম, সুযোগটা হাত-

ছাড়া হয়ে গেল না তো ? ওরা তৎক্ষণাৎ বেয়ারা দিয়ে কাগজপত্র জাহাজে পাঠিয়ে দিলো।

অর্থাৎ বোঝা গেল, ভাগ্য বিরূপ নয়। কিন্তু সময়ও বেশি হাতে নেই। এসপ্লানেড মুরিং-এ জাহাজ এসে ছাড়বার অপেক্ষায় নোঙর করে আছে, দু-এক দিনের মধ্যেই ছাড়বে। ওদের অফিসে বসে কিছুক্ষণ গল্প সল্প ক'রে বড়ো সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পালা শেষ ক'রে জাহাজে গেলাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। নৌকো করে যেতে হবে জাহাজে। এ যে লাইনের জাহাজ, সে লাইনের ঠিকাদার আমাদের কোম্পানী নয়, সেজন্য হেড-অফিসের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। তবু সাবধানের মার নেই। মা অবশ্য বলেছিল,—খিদিরপুরে যাবি না—ওদের সঙ্গে দেখা করতে ?

উত্তরে দিয়েছিলাম,—না। গেলেই 'এই অফিসে যাও', 'সেই অফিসে গিয়ে অমুকের সঙ্গে দেখা করে এই কাজটা করে এসো',—এসব বলবে। এখন যে মেজাজে আছি, তাতে ওসব ভালো লাগবে না।

মা বোধহয় কথাটা শুনে মুখ লুকিয়ে একটু হেসেছিল। তারপর বলেছিল,—বৌমাকে পেঁছি সংবাদ দিয়েছিস ?

বলেছিলাম,—দূর ! দু-দিন পরেই তো ফিরে যাচ্ছি, আবার চিঠি লিখবো কী ?

—লিখতে হয়। বেচারী ভাববে না ?

যাই হোক, হেড-অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা জানালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হতো, আমার সমুদ্র-ভ্রমণ ওঁরা ভালো চোখে দেখবেন না। শত্রুপক্ষের গোপন চিঠির মাধ্যমেই হোক, আর যেভাবেই হোক, ওদের মনোভঙ্গি ছিল, এই বুঝি ওদের কাজ ছেড়ে আমি অন্য কোনো অফিসে যোগ দিলাম, কিম্বা নিজেই স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করবো বলে অফিস খুলে বসবার চেষ্টায় আছি ! ওঁদের আগেকার ম্যানেজার দু-একজন এভাবে ওঁদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজস্ব অফিস খুলে বসেছিলেন বলেই ও'দের মনে অনুরূপ সন্দেহ দানা বেঁধে ছিল।

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, যা বলছিলাম সে-কথাই বলি। কলকাতার গঙ্গায় ছোট-ছোট পানসী ধরণের নৌকোর সংখ্যা কম নয়। তারই একটিকে নিয়ে জাহাজের দিকে রওনা হবো বলে উঠেছি, কিন্তু কথায় বলে না, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয় ?'—আমারও হলো সেই অবস্থা। ভাইজাগে যাবার আগে ছ-মাস কলকাতাতেই হেড-অফিসের হয়ে শিক্ষানবিশী করার সময় বহুবার বহু জাহাজে উঠতে হয়েছে এইরকম পানসী নিয়ে। তার ফলে অনেক পানসীর মাঝিমাল্লা আমার পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। কথাটা আমার তেমন মনে ছিল না, নইলে একটু দেখেশুনেই নৌকো নিতাম। নৌকো তীর থেকে জলে গিয়ে পড়া মাত্রই মাঝির আপ্যায়ন-মণ্ডিত কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো,—বাবু কি তয় ভাইজাগ থিকা দ্যাশে ফিরলেন নি ?

চমকে তাকালাম। লুঙ্গি, ফতুয়া, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি,—আমার সেই পূর্ব পরিচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' আমার দিকে তার অভ্যস্ত হাসিটুকু ঠোঁটে ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে।

—মকবুল না?

তার মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো, বললে,—হ। দূর দ্যাশে গিয়া বাবুজী শাসে জলে হইছেন, আমি ত পেরথমে ঠাওরই পাই নাই!

বললাম,—তুমি কেমন আছো, বলো? দেশে-টেশে গিয়েছিলে নাকি—

মকবুল দাঁড় চালাতে চালাতে বললো,—কই আর গেলাম! বাবুজী, কইতে সরম লাগে, বুড়া বয়সে খোদার ফজলে এই এতকাল পরে ছাওয়ালের বাপ হইছি।

—তাই নাকি! দারুণ সুখবর!

মকবুল বললে,—জরুকে তাবিজ-উবিজ কতো করছি, কতো পীরের দরগায় বাতি জ্বালাইছি, আমাগো হেস্টিংসে পীরের থানে যে 'উরস' (মেলা) হয়, সেইখানে এক ফকির আইছিল, জব্বর ফকির, আইছিল হেই কোন্ দূর দ্যাশ 'আজমীর' থিকা। হেই বইসা বইসা ঝাড়ফুঁক করলো, ব্যস, আমার তো একখান বিবি আপনে জানেন, সেই বিবির পেটে পোলা আইলো। দিব্যি ফুট্‌ফুইট্টা হইছে, এই ছ'মাস হইল বয়স।

—বাঃ! খুব খুশি হলাম শুনে।

মকবুল ততক্ষণে জাহাজের সিঁড়ির কাছে নৌকো নিয়ে ভিড়েছে, বললে,—সাধ হয় বাবুজীরে নিয়া গিয়া দেখাই, বেশি দূর না—দরিয়া দিয়া বাইয়া যামু—ঘাট্‌লার নজদিগই হইবো।

আমি উঠে সিঁড়িতে পা দিয়ে বললাম,—দেখা যাক। আগে তো কাজটা সেরে আসি?

—তা আসেন।

ওপরে, ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকে আর এক বিস্ময়ের সম্মুখীন হলাম। ক্যাপ্টেন আমার পূর্ব পরিচিত। গুজরাতি। মিঃ দুধওয়ালা। এই নামটির জন্য মানুষটিকে আরও মনে ছিল। ভাইজাগে আলাপ হয়েছিল, আমাদেরই কোনো লাইনের জাহাজে চীফ অফিসার ছিলেন। এখন দেখছি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়ে অন্য লাইনের জাহাজে চলে এসেছেন। আমাকে দেখেই বললেন,—কীহে, ওয়ার্লড্ ইজ রাউন্ড, ইজন্‌ট্ ইট্?

—চিনেছেন আমাকে?

দুধওয়ালা উত্তর দিলেন,—অফ কোর্স! ইওর বায়োডাটা—

ইত্যাদি বহু কথা। কলকাতা থেকেও এজেন্ট একটি লোক দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাইজাগের মিঃ রাওয়ের সুপারিশ ও আমার জীবনপঞ্জী সম্বলিত কাগজপত্র দেখে দুধওয়ালার আমাকে চিনতে অসুবিধা হয় নি। বললো,—আর একদিন দেরি করলে আমাকে কলকাতার লোকটিকে বাধ্য হয়ে নিতে হতো। নাউ কাম অন, নিজের কেবিনে যাও।

'রাইটার' বা 'কেরাণী'র কেবিন এই সব 'যুদ্ধকালে প্রস্তুত লিবার্টি-ধরণের' জাহাজে কোন্ দিকে থাকে, তা আমার জানা ছিল। সুতরাং খুঁজে নিতে অসুবিধা হলো না। ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা, আমি এখন থেকেই জাহাজে স্থিতি হয়ে থাকি, কিন্তু অনেক বলে কয়ে সেটা রোধ করলাম। আগামী কাল জাহাজে আসবো, এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমাদের মকবুল বা 'পদ্মানদীর মাঝি'র নৌকোতেই এসে উঠলাম।

মকবুলকে কেন 'পদ্মানদীর মাঝি' বলা হয়, তার কারণ হচ্ছে, কলকাতার গঙ্গার পান্‌সী চালক ছিল সবাই মূলত অবাঙালী মুসলমান, তার মধ্যে মকবুলই সম্ভবতঃ একমাত্র বাঙালী এবং পূর্ববঙ্গের মানুষ। পদ্মাতেই গহনার নৌকো'তে সওয়ারি বসিয়ে পদ্মা পাড়ি দিতো। সেই মকবুল তার বয়সকালে কলকাতা দেখতে এসে তাদের এক আত্মীয়ের ওয়াটগঞ্জ অঞ্চলের বাসায় ওঠে। এখানে থাকতে থাকতে স্থানীয় অবাঙালী মাঝিদের একটি 'খাপসুরত' মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং এই প্রেমের টান এতো গভীর ছিল যে, সেবারে অভিভাবকদের নির্দেশে তাদের সঙ্গে দেশে ফিরে গেলেও পদ্মা আর তাকে বেঁধে রাখতে পারলো না, গঙ্গার টানে সে আবার একদিন চলে এলো কলকাতায়। এবার এলো পালিয়ে। তারপরে তার সাদী এবং ক্রমে ক্রমে শ্বশুরের পান্‌সীতে অধিষ্ঠান। এইজন্যই অন্যান্য মাঝির দল ওকে 'পদ্মানদীর মাঝি' বলে ডাকতো।

কিন্তু গঙ্গানদীতে যাতায়াতকারী জাহাজের যারা ঠিকাদার বা ঠিকাদারের প্রতিনিধি, তারা এই সব মাঝিমাল্লার সঙ্গে তেমন মিশতো না বা তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর রাখতো না। আমার স্বভাবটা এর বিপরীত বলে সময় ও সুযোগ পেলেই এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতাম। শিক্ষানবিশী কালে ঐ এস্‌প্লানেডের জেটিতে ক্যাপস্টানের ওপর বসে আছি জাহাজ আসবার আশায়, ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেছে, জাহাজের দেখা নেই। তখন করবো কী? অন্যান্যদের মতো কাছের কোনো পরিচিত অফিস বা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে আড্ডা জমানো যায়, কিন্তু আমার সে-ইচ্ছা হতো না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে, নিরালা, শূন্য জেটির ওপর একা বসে আছি, তখন এইসব পানসীর মাঝিদের ডেকে ডেকে আলাপ জমাতাম, কখনো বা ওদের আহ্বানে ওদেরই নৌকোতে গিয়ে বসতাম। আমাদের মতো ওদেরও জীবন জাহাজের সঙ্গে বিজড়িত। জাহাজের লোকদের নিয়ে পারাপার করাই তো ওদের মুখ্য জীবিকা! মকবুলের সঙ্গে এইভাবেই একদিন আমার আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ওরাও খবরাখবর রাখতো কম নয়। আমি কে, কোন্ অফিসের লোক,—সে-সব তথ্য আলাপ হবার আগেই ওরা নিয়ে রেখেছিল।

যাই হোক, মকবুল সেদিন আমাকে তীরের দিকে না নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি জাহাজের পাশ কাটিয়ে খিদিরপুরের দিকে চালিয়ে দিয়েছিল তার পান্‌সী।

তখন বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যার আগমনী ঘোষিত হচ্ছিল আকাশের প্রান্তে।

একটু পরেই ওপারের কোনো মন্দির থেকে আরতির ঘণ্টা হয়ত আগেকার মতো বেজে উঠবে! গঙ্গায় তখন ভাঁটার সময়। ওর পানসী তরতর করে এগিয়ে চলছিল। আমি বুঝেছিলাম ও কী চায়, তাই আর বাধা দিলাম না। শুধু বললাম,—তাহলে তোমার বাসাতেই আমাকে নিয়ে চললে?

মকবুল বলে,—বাবুজী, এক মিনিট। আমার ছাওয়ালটারে একটু দেইখ্যা যান। কতোকাল পরে আপনের সাথে মোলাকাৎ হইল কন্ দেহি! বড়ো আনন্দ হইছে!

নৌকো এগিয়ে যাচ্ছিল। একসময় বললাম,—আচ্ছা মকবুল, গঙ্গায় নাও বাইতে বাইতে তোমার পদ্মার কথা মনে পড়ে না?

মকবুল উত্তর দিলো,—পড়ে বাবু—হরবখতই পড়ে! মনে দুখ হইলে একটা চিন্তায় ডুব দেই। কী চিন্তা জানেন? আপনেরে কই। বস্তিতে এক মাস্টারবাবু এক ছাওয়ালরে পড়াইতে আসে। তার কাছে কথাটা শুনছিলাম। বড়ো হক্‌দার কথা। মনে এক্কেবারে লাইগা আছে। শুনছিলাম, এই গঙ্গা নাকি আগে পদ্মার মতোই আছিল। ঐ রকম বিশাল, এপার-ওপার দেখা যায় না। আর আমাগো হেই পদ্মা আছিল এই গঙ্গার মতো, এইরকম চওড়া। একদিন হইলো কী, গঙ্গার স্রোত এই ভাগীরথীর দিকে না আসিয়া হেই পদ্মার খাত দিয়া চলতে লাগলো, তখন কতো যে ঘরবাড়ি—কতো যে গ্রাম ডুবাইলো তার হদিস নাই! সেইজন্য পদ্মারে নাকি কয় কীর্তিনাশা। ওদিকে পদ্মা হইয়া গেল বিশাল, আর গঙ্গা হইয়া গেল ছোট! তাই বলছিলাম বাবু, মন দুখাইলে হেই চিন্তায় ডুব দেই। চিন্তা করি যে, আমি যেন হেই গঙ্গায় নাও বাইতে আছি, যেই গঙ্গা ছিল বিশাল—আমাগো ঐ পদ্মার লাখান! সত্য কথাটা কই বাবু, হেই কথা মনে আইনা বড়ো আরাম পাই! আপনে কইবেন, ক্যান, আরাম কিসের? আরাম আছে বাবু, মনে দুখ হইলে, একটা বিশাল কিছু—বড়ো কিছু ভাবতে পারলে সেই দুঃখের আর লেশ থাকে না! কী বাবু, কথাটা কি মিছা কইলাম?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—না মকবুল, না। তোমার মতো ক'রে এই সত্য কথাই বা অনুভব করতে পারে কজন?

কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চলছিলাম। একসময় সেইখানে এলাম, যেখান থেকে আমার শৈশবের লীলাক্ষেত্র যে কালীঘাট, সেই কালীঘাটের গঙ্গা বা আদিগঙ্গার মুখ পেরিয়ে যাবার পর আমরা কথা শুরু করলাম। বললাম,—তোমার ছেলেকে বড়ো হলে কী করাবে, মকবুল?

মকবুল বললে,—উয়ার মায়ের ইচ্ছা মক্তবে-মাদ্রাসায় পড়াইয়া 'লায়েক' করবো। লেকিন আমার ইচ্ছা অন্যরকম। আপনেরে চুপি চুপি কই বাবু, পোলায় য্যান বড়ো হইয়া পদ্মা নদীর মাঝিই হয় আমার লাখান। এই গঙ্গারে পদ্মার লাখান বিশাল ভাইব্যা নাও চালাইবো! পয়সা জমাইয়া আমীর হইবো না, কিন্তু 'সুখ' পাইবো। এক ধরনের অন্তরের সুখ, যা মুখের

কথায় কইয়া বোঝান যায় না। আমীরগো তো দেখতে আছি, হরবখৎ হিংসা-হিংসি-রেষারেষি! পয়সা দিয়া যদি মনই না বড়ো হইল, তা অইলে আমীর হইয়া লাভ কী? নামেন বাবু ঘাটে আইয়া পড়ছি!

সাধারণ ঘাটের মাঝির কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। মকবুলের ছেলেটি সত্যিই ফুটফুটে হয়েছে, হাত বাড়ানো মাত্রই কোলে এলো। ওর হাতে একটি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে একটু আদর করলাম। মকবুল বললে,—ও কী রুপিয়ার মর্ম বোঝে বাবু? ঐ দেখেন মুখের মধ্যে পুইরা দিতেছে? বসেন বাবু—একটু চা-পানি খান।

মকবুলের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে পড়লাম, তখন রাত হয়ে গেছে। খিদিরপুরে একটা ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে কালীঘাটে এলাম আমাদের বাসায়। খিদিরপুরে একটু সতর্ক ছিলাম হেড-অফিসের কারুর সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়।

তা অবশ্য হয় নি। রাতে বসে নবপরিণীতাকে* সংক্ষিপ্ত পত্র দিলাম। লিখলাম, কলকাতায় কয়েকটা দিন দেরি হবে, কোনো ভাবনা-চিন্তা করো না। কাল বড়ো চিঠি দিচ্ছি।

কিন্তু পরের দিন জাহাজে উঠে আর সে-সব কথা মনে রইলো না। সেদিনও মকবুলের পানসী নিয়েছিলাম, কিন্তু বলেছিলাম, মকবুল ফিরে যাও। আজ জাহাজে আমার নেমন্তন্ন, রাতে জাহাজে থাকবো।

—আইচ্ছা, আদাব।

এর পরের দিন ভোরবেলা জাহাজ ছেড়ে গেল। এত ভোরে মকবুল কি এসেছে? আমি ডেকে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, মকবুলকে দেখতে পেলাম না। অনেক মাঝি রাতে নৌকোতেই থাকে, কিন্তু মকবুল তার 'ফুটফুটে ছাওয়াল'-এর আকর্ষণে বাসায় না গিয়ে নৌকোয় রাত কাটাবে কেন?

যাইহোক, খুব ধীরে ধীরে জাহাজ চলতে লাগলো। একসময় জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকে বাঁক নিলো। গঙ্গার এই বাঁক থেকে কলকাতা শহরের এক অদ্ভুত রূপ চোখে পড়ে। বাড়ি-ঘর-দোর ছাড়িয়ে এক বিস্তৃত শ্যামলিমা। কী আশ্চর্য! কলকাতার বুকে গাছপালার অমন শ্যাম-সমারোহ!—বোধহয় চিড়িয়াখানা অঞ্চলের মহীরুহ-শীর্ষ গুলোই অমন শ্যামল রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

আমি ডেক থেকে নড়তে চাইছিলাম না। গত দুই জাহাজে রেডিও-অফিসারের সঙ্গে খাতির বেশি জমেছিল বলে এখানে ঢুকেই রেডিও-অফিসারের খোঁজ করেছিলাম। দেশী জাহাজ, সর্বত্র দেশী মুখ, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে যে একটি স্বজাতীয় বাঙালী মুখ আবিষ্কৃত হবে, তা ভাবতে পারিনি। মকবুলের ভাষায় দিব্যি 'শাঁসে-জলে' চেহারা, একটু খাটো ধরণের। কার্তিক মজুমদার। এই কার্তিকবাবু মহাশয় ডেক থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর অফিস-ঘরে প্রবিষ্ট করাবার বহু প্রয়াস করলেন, কিন্তু আমি

'জেমস-মেরী'-চড়া বা 'চোরাবালি' দর্শনের আশায় একটি চেয়ারে বসে রইলাম, আমাকে ওঠাবে সাধ্য কার? প্রাতরাশ পর্যন্ত এইখানে নিয়ে এসে শেষ করলাম, তবু ভিতরে যাই নি।

'জেমস-মেরী'-চোরাবালিতে ঠেকে বহু জাহাজের তৎক্ষণাৎ সলিল সমাধি হয়েছে বলে শুনেছি। সেজন্য বজবজের কাছ থেকে শুরু করে রূপনারায়ণের মুখ পর্যন্ত বিশেষ জরিপ করে বয়া বসিয়ে জাহাজের চলাচল ঠিক করা হয়, প্রায়ই 'ড্রেজিং' করতে হয়। দামোদর যেখানে গঙ্গায় বা ভাগীরথীতে এসে পড়েছে, সেখান থেকে রূপনারায়ণ পর্যন্ত এই ভয়াবহ চোরাবালির বিস্তৃতি। একে পাশ কাটিয়ে অতি সন্তর্পণে জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যান পাইলট-মহাশয়।

'জেমস-মেরী' যতই ভয়ঙ্করী হোক, তার ওপরের তীরভূমি কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর! দামোদরের খাতের দুপাশে গাছপালার সঙ্গে মাটির ওপরে পাতা সবুজ নরম ঘাসের আস্তরণের যে মোলায়েম রূপটি দেখা যায়, তা ভোলবার নয়। জননী জন্মভূমিকে সুন্দরী বলে প্রণাম করতে মন আপনিই নত হয়ে পড়ে। রূপনারায়ণের মুখ থেকে জাহাজ আবার বাঁক নিলো। এখান থেকে ধীর গতিতে চলে হুগলি পয়েণ্টে এসে পেঁছিতে কম সময় কাটলো না। এইখানে নোঙর ফেললো জাহাজ। বৈকালী ভোজন সমাপ্ত হবার পর জাহাজ চলবে, পাইলটও তারপর জাহাজকে সমুদ্রে পেঁছে দিয়ে তাঁর বোটে নেমে কলকাতায় ফিরে যাবেন।

রাত্রে, নিজের ঘরে বসে একরাশ কাগজপত্র টাইপ করে যখন অবসর পেলাম, তখন ঘাটশিলার কথাই বারবার মনে পড়তে লাগলো। নবপরিণীতা আমার অপেক্ষায় প্রহর গুণবে আর আমি কাউকে না জানিয়ে সমুদ্র-পথে পাড়ি জমালাম! বিছানায় শুয়ে মনটা খারাপ হতে লাগলো। কী দরকার ছিল এভাবে বেরিয়ে পড়ার? কী লাভ হলো এতে? ভালো লাগছিল না, উপায় থাকলে বোধহয় আমি তখন জাহাজ থেকে পালিয়ে যেতাম।

কিন্তু সকালে উঠে সমুদ্রের রূপ দেখে আর সে কষ্টের কথা মনে রইলো না। মনে হলো নীল অকাশটাকে কে যেন উপুড় করে দিয়েছে!

কার্তিক মজুমদার এলো। এবার আর তার ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না। তার কাছেই শুনলাম, জাহাজ সিংহল যাচ্ছে বটে, কিন্তু কলম্বো যাচ্ছে না, যাচ্ছে যে বন্দরে, তার নাম 'ত্রিন্-কো-মাল্যে,' বা ইংরেজীতে 'ট্রিন্‌কোমাল্লী'। আমি যখনকার কথা লিখছি, সেই ১৯৪৮ সালেই সিংহল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল। বন্দরের নামটা শুনে আমার প্রথমেই সেই কোকনদ-বন্দরে দেখা পোতরাজুর পালতোলা কাঠের ছোট্ট জাহাজের কথা মনে পড়েছিল। সেই জাহাজটিও তো সেবার 'ত্রিন্-কো-মাল্যে'র অভিমুখে রওনা হয়েছিল! কে জানে ওখানে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে!

কলকাতা থেকে জাহাজ কলম্বোর পথে মোটামুটি 'কোস্ট্-লাইন' বা তটরেখার কাছ দিয়ে চলে। অবশ্য কাছ দিয়ে মানে একেবারে কূল ঘেঁষে নয়,

কখনো জাহাজ থেকে দূরের তটরেখা দেখা যায়, কখনো বা দূরবীণ দিয়ে দেখতে হয়। জলের বর্ণনায় নূতনত্ব কিছু নেই, শুধু একটা লেখনীয় বিষয় আছে, সেটা নজরে পড়লো যথাক্রমে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মোহানা পেরিয়ে আসার পর। হঠাৎ মনে হলো, সমুদ্রের বিপুল একটা স্রোত যেন ভিতরে ঢুকে গেছে, তটরেখা চলে গেছে অনেক দূরে। শুধু তাই নয়, এখানকার জলও কালো, এবং গভীরতাও কম নয়। এই কালো স্রোতটাকে ডানদিকে অনেক দূরে রেখে জাহাজ জায়গাটা পার হতে লাগলো। জাহাজের আশেপাশে জল নীল, আকাশও নীল, শুধু দিগন্তে সাদা মেঘের বুকে একটু কালো আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু দূরবীনের সাহায্যে দেখা গেল, ডানদিকের দিগন্তের কাছে জল বেশ কালো। কার্তিকই এ-সব আমাকে দেখাচ্ছিল, বললে,—এই নিয়ে চারবার।

—চারবার মানে?

কার্তিক বললে,—এইখান দিয়ে গেলুম – এই নিয়ে চার বার।

—সব সময়ই জল এইরকম কালো দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ,—কার্তিক বললে,—আমার ধারণা কী জানেন? এইটিই কালীদহ, যেখানে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীমন্ত' কমলেকামিনী দর্শন করেছিল।

ওর কথায় আমি দূরবীন চেয়ে নিয়ে আরেকবার ঐ কালীদহ ভালো করে দেখতে লাগলাম। কালো জলের রাশি, দিগন্তে কোনো স্থলচিহ্ন নেই। কিন্তু পরের দিন হঠাৎ দিগন্তে স্থলরেখা ফুটে উঠলো। কার্তিক খবরাখবর নিয়ে এসে জানালো,—'মাদ্রাজ' শহর ও বন্দর দেখা যাচ্ছে।

মাদ্রাজের পর পণ্ডিচেরী, তারপরে কুড্ডালোর নেগাপত্তম,—এই সব দূরে থেকে আভাষে বা দূরবীণে দেখা যায়। তারপরে জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগলো। এই সময় আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামলো, হাওয়ার জোরও কম নয়, জাহাজ দুলতে লাগলো। রাত কাটলো ঐভাবে, কিন্তু ভোরে আবার সব শান্ত। দূরে নারিকেলকুঞ্জবেষ্টিত তটরেখা দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল, তটরেখার কাছাকাছি অংশ জুড়ে পালতোলা ছোট ছোট জেলেডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলে 'কাটামারণ'।

—আমরা কি ত্রিনকোমাল্যেতে এসে পড়লাম?

কার্তিক জানালো,—না। আমরা 'জাফ্‌না'র কাছাকাছি এসেছি। সিংহলের উত্তরতম অংশের নাম জাফ্‌না। একটি আলাদা দ্বীপের মতো, মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মাত্র দুই জায়গায় সরু স্থলরেখাদ্বারা যুক্ত, একটি সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে, অন্যটি একটু ভিতরের দিকে। এই শেষের অংশ দিয়েই রাজপথ এসে যুক্ত হয়েছে। তাকিয়ে দেখলাম, তটভূমি থেকে আরও 'কাটামারণ' বেরিয়ে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

বললাম,—দেখে মনে হচ্ছে 'জাফ্‌না' রীতিমত একটা মাছধরার বড়ো আড্ডা।

—না,—কার্তিক বললে,—তার থেকে বড়ো আড্ডা দেখতে পাবেন আর একটু পরে। সে-ও ছোটখাটো একটি বন্দর, নাম মুল্লাইট্টিভূ।

কিন্তু 'মুল্লাইটিভু'র খুব কাছ ঘেঁষে জাহাজ গেল না, দূর থেকে দেখে সাধ মেটাতে হলো। ওখানে জেলে-নৌকো ছাড়া পালতোলা কাঠের সাবেকী ছোট জাহাজের ভিড়ই বেশি দেখলাম।

ত্রিন্‌কোমাল্যেতেও ঐসব জাহাজের ভিড় ছিল। বন্দরটিকে 'প্রকৃতি-গঠিত বন্দর' বলা হয়ে থাকে। যেন সমুদ্র খানিকটা ভিতরে এসে অনেকটা চতুষ্কোণ সৃষ্টি করেছে। আমাদের জাহাজ যেখানে ভিড়লো, তার বিপরীত দিকে, চতুষ্কোণের একটি কোণায় একটি নদীর মোহানা দেখা যায়, ঐ নদীই সিংহলের প্রধানতম নদী—'মহাবলী গঙ্গা'—জাফ্‌নায় যেমন তামিলদের সংখ্যা বেশি, 'ত্রিন্‌কোমাল্যে'তে তা' নয়, এখানকার তামিল ও সিংহলীদের জনসংখ্যা প্রায় সমান-সমান। কার্তিক অনেকবার এসেছে, তাই খবরও রাখে। ও বললে, —এখানকার তামিলদের মধ্যেও আবার দুটো ভাগ আছে, একটা ভাগকে বলা হয় 'ভারতীয় তামিল', অন্য ভাগটিকে বলা হয় 'সিংহলী তামিল।'

—আপনি তো খোঁজ রাখেন খুব?

কার্তিক বললে,—কোথায় রাখি? এখানে এই সিংহলে এসেছি চার বার, জায়গাটা ভালো লেগেছিল, তাই সব খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম। অন্য জায়গার নাম বলুন, বিশেষ কিছুই বলতে পারবো না।

ত্রিন্‌কোমাল্যেতে মাল ওঠানো-নামানোর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের যান্ত্রিক কিছু কাজ ছিল, যার সবটাই কলকাতায় করা যায় নি। সেই কাজের জন্য যে ঠিকাদার নিযুক্ত হয়েছিল, সেই ভদ্রলোক তরুণ-বয়সী, বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়, পিতৃ-ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছে, আর কী! পিতা অফিস নিয়ে থাকেন, বাইরের যাবতীয় কাজ ছেলেই করে থাকে ঠিকা মিস্ত্রী বা ঠিকা শ্রমিকদের সাহায্য নিয়ে। এর নাম শঙ্করন, ইনি তামিল, কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ব্রাহ্মণ, মাছ-মাংস খান না। কাজের প্রথম দিনেই আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মিস্ত্রীদের কাজে লাগিয়ে আমাদের ঘরে এসেই বসতো। এর কাছেই শুনলাম 'মহাবংশ' গ্রন্থের কথা, যে-গ্রন্থে সিরিলোন বা সিলোনের আদি ইতিহাস কিছু পাওয়া যায়। আজ 'সিরিলোন'-এর সঙ্গে 'কা' (দ্বীপ) জুড়ে (যার অর্থ হলো 'সিরিলোং' দ্বীপ) শ্রীলঙ্কা নাম হয়েছে, কিন্তু তখনো 'সিলোন' নামটা চালু ছিল। এর কাছেই শুনলাম, মহাবংশের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, কিন্তু তাতে যা লেখা আছে তার ঘটনাকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৮৩ অব্দ থেকে শুরু হয়েছে। ঐ সালেই ভারত থেকে বিজয়সিংহ তাঁর সাতশো অনুচর নিয়ে এসে আদিবাসীদের হটিয়ে 'সিংহলে'-এ (ভারতীয়দের দেওয়া নাম) রাজত্ব স্থাপন করেন। (এই সেই বিজয়সিংহ, যাঁকে বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বাঙালী' আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়।') বিজয়সিংহ রাজা হয়ে বসবার পর দাক্ষিণাত্যের মাদুরায় লোক পাঠালেন উপযুক্ত বধূ সংগ্রহ ক'রে আনবার জন্য। (বাঙালী হলে বাংলায় লোক না পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতেন কী?) এবং মাদুরা থেকে বিজয়সিংহের

বধূ বা রাণীই শুধু আসে নি, এসেছিল বহু সম্ভ্রান্ত মাদুরাবাসী, সঙ্গে সূত্রধর, স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পীর দল। বলা বাহুল্য, এরা সবাই তামিল। এর পরের ঘটনা ঘটে খৃষ্ঠ-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। রাজর্ষি সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র-কন্যাকে পাঠালেন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে। এরই ফলে, জানা যায়, পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে উঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

শঙ্করনের কাছ থেকে আরও শুনেছিলাম, সিংহলী রাজাদের আদি রাজধানী ছিল অনুরাধাপুরে। এই অনুরাধাপুর ত্রিনকোমালো থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে মাত্র, দ্বীপের ভিতরের দিকে, এবং সিংহলের উত্তরাংশেই বটে, অর্থাৎ কলম্বো অথবা কাণ্ডির দিকে নয়। সে যুগের অনুরাধাপুরের রাজারা বৌদ্ধ-বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ প্রভৃতি তৈরি করতেই ব্যস্ত ছিলেন, দেশরক্ষার কথাটা তত চিন্তা করেন নি। তার ফল হলো এই যে, দাক্ষিণাত্যের তামিল রাজারা সিংহল আক্রমণ করলেন। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা এটা। আক্রমণের পর আক্রমণ করে তাঁরা চল্লিশ বছরের ওপর সিংহলকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। সিংহল থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছিলেন যে সিংহলী রাজা, তার নাম 'দুতুগেমুনু'। তারপরে অনুরাধাপুরের আর এক উল্লেখযোগ্য নরপতির নাম 'গজবাহু।' খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি একটি নৃত্যধারার প্রচলন করেন, তার নাম 'উদারানাটুম', এখন যা বাইরের জগতে 'কাণ্ডিনাচ' বলে আখ্যাত হয়েছে। এই গজবাহু দক্ষিণ ভারতের চোলরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর দেশের পাট্টিনীদেবী বা দুর্গার পায়ের স্বর্ণ নূপুর বিজয়ীর স্বীকৃতি স্বরূপ নিয়ে আসেন। পাট্টিনীদেবীর মন্দির তৈরি করে তাঁর পূজার প্রচলন করেন। ঐ চোল রাজ্য থেকে তিনি কিছু সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী সঙ্গে করে এনেছিলেন। এদের চেষ্টায় ঐ নাচ সিংহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সিংহলে 'পোলোন্নারুয়া' বলে একটি জায়গা আছে, সেটিও ত্রিনকোমালো থেকে খুব দূরে নয়, ঐ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই হবে, তবে তা আরও দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই 'পোলোন্নারুয়া'র রাজা বিজয়বাহু দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ নাচকে বৌদ্ধধর্মের উৎসবগুলির অঙ্গীভূত করেন। তবে ঐ শতাব্দীতেই মহারাজা পরাক্রমবাহু এই নাচকে আরও ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন। ১২৯৪ সালে মার্কো পোলো চীন থেকে ফেরার পথে এই সিংহলে এসেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পনেরো শতাব্দী পর্যন্ত সিংহল বারবার বাইরের শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কখনো ভারত থেকে, কখনো মালয় থেকে, কখনো বা সুদূর চীনদেশ থেকে। সিংহলের বিভিন্ন রাজাদের নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদই ছিল তাদের দুর্বলতার মূলে। এই দুর্বলতারই সুযোগ নিতো বাইরের শত্রু। সিংহলের রাজধানীরও তাই বদল হয়েছে বারবার, শেষপর্যন্ত ১৫০০ সালে রাজধানী সরে যায় 'কোট্টে'তে, কলম্বোর কাছে। ১৫০৫ সালে পর্তুগীজদের আবির্ভাব। তাদের আধিপত্যে সিংহলীদের দুর্দশার

সীমা ছিল না! একদিকে 'কোট্টে'র দুর্বল রাজারা, অন্যদিকে পর্তুগীজ দস্যু —এই দুই উৎপাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে সিংহলীদের একটি দল দক্ষিণ সিংহলের পার্বত্য অঞ্চলে 'কান্ডি' রাজ্যের পত্তন করেছিল। পর্তুগীজরা উত্তর সিংহলের তামিল রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল বলা চলে। ১৬৩৮ থেকে ১৬৫৮ সালের মধ্যে ডাচেরা এসে পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে উপকূলবর্তী জায়গাগুলি দখল করে নেয়। একমাত্র কান্ডিই স্বাধীন থেকে যায়।

সিংহল ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল ১৭৯৮ সালে। কিন্তু কান্ডিরাজ্য দখল করতে তাদের সময় লেগেছিল। কান্ডি তাদের হাতে যায় ১৮১৫ সালে। এই কান্ডিদের কথা বলতে গিয়ে শঙ্করন বললে,—সিংহলে এসে এই কান্ডিনাচ যদি না-ই দেখলেন, তবে দেখলেন কী?

—কী করে দেখবো?

শঙ্করন বললে,—আমি দেখাবো। কালই চলুন আমার সঙ্গে। দিনের বেলায়—বিকেলের দিকে। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ে যেতে হবে। গাঁয়ে আমাদের একটা 'ফার্ম-হাউস' আছে, সেখানে আমি ব্যবস্থা করবো।

—জাহাজের সবাইকে বলবো?

শঙ্করন বললে,—না—না—তাহলে জমবে না। আপনারা দুজনই চলুন।

কার্তিক বললে,—আমরা কিন্তু মশাই নাচের বিশেষজ্ঞ নই। নাচের কলাকৌশল কিছুই বুঝবো না।

শঙ্করন একটু হেসে উত্তর দিলে,—তবু চলুন। আপনারা আমার বন্ধু হয়ে গেছেন, আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আপনাদের নিয়ে যেতে পারলে খুব খুশি হবো।

—ক্যাপ্টেনকে নেবেন না?

শঙ্করন বললে,—ব্যবসার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেনকে, চীফ অফিসার আর চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করা উচিত। সেটা করবোই। তবে সেটা হবে আমাদের শহরের বাড়িতে। আমার বাবাও থাকবেন। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে অন্য ব্যাপার। সেখানে ব্যবসা নয়, নিছক বন্ধুত্ব।

পরদিন জাহাজে সকালের দিকে খুব খেটে আমার সব কাজ সেরে লাঞ্চের পরে বেরিয়ে পড়লাম শঙ্করনের সঙ্গে—আমি আর কার্তিক। ত্রিনকোমালো শহরের অংশ খুব যে বিস্তৃত, তা মনে হলো না, স্বাধীনতা প্রাপ্তি উৎসবের জন্য যে সব তোরণ তৈরি হয়েছিল পথের মোড়ে-মোড়ে, তার কিছু কিছু নিদর্শন তখনো নির্মূল হয়ে যায় নি। কোনো কোনো সংকীর্ণ পথের পাশে তালপাতার ঝুপড়ি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট দোকান, তাতে মিঠাইয়ের স্তূপ সাজানো, আর বড়ো বড়ো ডাবের কাঁদি, ডাবের রঙ সবুজ নয়, হলদে ধরণের। সিংহলী তরুণী লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে দোকানে বসে রয়েছে পসরা বিক্রি করার জন্য। গ্রামাঞ্চলে সবুজের সতেজ সমারোহ। আমাদের গাড়ি ঘুরে যখন এক বিস্তৃত জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখলাম জলে হাতিদের স্নান করানো

হচ্ছে। হাতিগুলো কিনার ঘেঁষে জলের ওপর শুয়ে আছে। তাদের অর্ধনিমজ্জিত শরীরের ওপর ডোলাই-মলাই করছে মাহুতেরা, তীরে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি ও সাদা ব্লাউজ-পরা তরুণী মেয়েদের কেউ কেউ তা দেখছে, আবার কেউ কেউ জলে নেমে হাতিদেরই পাশে স্নান করছে।

এইখানে বলে রাখি, 'ত্রিনকোমালো' বন্দরের সঙ্গে আমার দেখা গ্রামের এই কাণ্ডি নাচের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু ত্রিনকোমালোর স্মৃতির সঙ্গে এই নাচ বিজড়িত। বিশেষ করে 'সারিতা' নামক মেয়েটির নাচ কখনো ভুলবার নয়।

কাণ্ডি নাচ প্রধানতঃ পুরুষদের নাচ, এবং তাতে বীর রসেরই প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথও সিংহলে এসে এই কাণ্ডি নাচ দেখেছিলেন। সিংহলে তিনি এসেছিলেন তিনবার, কিন্তু কাণ্ডিনাচ দেখেছিলেন তৃতীয়বার, ১৯৩৮-এর মে মাসে। এই নাচ দেখেই তিনি লিখেছিলেন, 'নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন !'

মুক্ত আকাশের তলায় শঙ্করনদের পল্লী-আবাস-সংলগ্ন সবুজ ঘাসের ওপর ছয়জন মানুষ যেভাবে নৃত্যে মেতে উঠেছিল, তা দেখে কবিগুরুর কথাই মনে পড়েছিল,—'সিংহলে সেই দেখেছিলেম কাণ্ডিদলের নাচ/শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ/পেরিয়ে এলো মুক্তি মাতাল খ্যাপা !'

নাচিয়েদের কোমরে সাদা কাপড় লুঙ্গির আকারে পরা। কাপড়ের ওপরে জরির কাজ-করা চওড়া কোমরবন্ধ শক্ত করে আঁটা। বাজিয়েদের মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি, খালি গা, কোমরের কাছে লম্বা ধরণের ঢোলক বাঁধা, যাকে ওরা বলে 'বেড়ে'—এই বেড়ের তালে তালেই ওরা নাচে। নাচিয়েদের খালি গায়ের ওপর নানান নক্সার মালা গাঁথা। ওরা প্রথমে যে নাচ দেখালো, তার নাম 'নায়য়াণ্ডি'—হাত ও পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নানান দেহভঙ্গি,—কিন্তু ভঙ্গিমার মধ্যে প্রচণ্ড পৌরুষ ফুটে ওঠে, গতিচাঞ্চল্যও দেখবার মতো। এর পর গানের সঙ্গেও নাচ হলো। গানের ভাষা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শুনলাম, এর নাম হলো 'কিরলা' বা সাগর-পক্ষী। সাগর-পক্ষীর দুটি পাখা মেলে চঞ্চল হয়ে উড়ে বেড়ানো, কখনো নিচের দিকে তার নামবার ভঙ্গি, কখনো বা মুখ উঁচু করে ওপরের দিকে উড়ে যাবার মুদ্রা।

পুরুষদের নাচ শেষ হবার পর ঘরের ভিতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। তরুণী মেয়ে, তন্বী চেহারা, রঙ কালো হলেও চেহারায় লাবণ্য যেন উপচে পড়ছে ! তারও পরণে সাদা লুঙ্গি, ঊর্ধাঙ্গে হাফহাতা চোলির ব্লাউজ, দু-হাতে সোনার কাঁকন, গলায় মুক্তোর মালা, কানে আর নাকে সাদা পাথরের দ্যুতিময় ফুল। হাতে মন্দিরা। জনৈক বাজিয়ের 'বেড়ে'-বাদ্যের তালে তালে সে মন্দিরা বাজিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো। এই নাচের নাম 'নাগ বনমা',—অর্থাৎ সাপিনী-নৃত্য। ধান-কাটার উৎসবে এই নাচ পরিবেশন করা হয়, কিম্বা গাঁয়ে কোনো রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব হলে এই নাচ নেচে সেই মহামারীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

মেয়েটি তার ছিপছিপে কালো শরীর নিয়ে অবিকল ফণা-তোলা সাপের মতো হেলে-দুলে নাচছিল। প্রথমে তার চোখে অপ্রসন্নতা, তারপরে ক্রোধ, দুঃসহ ক্রোধে সে যেন কাউকে ছোবল মারবার জন্য উদ্যত। তারপরে হঠাৎ তার ভাব বদলে গেল, সাপিনী যেন কোনো সাপের দেখা পেয়েছে! এইবার দেহ হিল্লোলে জাগলো তার দুর্নিবার উল্লাস, চোখে বিদ্যুৎ, মুখে হাসি। মাথার ওপরে দু-হাত একটুকু উঠিয়ে মন্দিরার দিকে হাসিমুখখানি তুলে মন্দিরা বাজিয়ে সে দুলে দুলে নাচতে লাগলো! আমরা নাচের কিছু বুঝি না, কিন্তু অপলক চোখে মুগ্ধ হয়ে তার নাচ দেখছিলাম। শঙ্করন জানালো, ওর নাম,—সারিতা।

নাচের শেষে বক্‌শিস-টকশিস নিয়ে নাচের দল চলে গেল, কিন্তু সারিতা গেল না। সে নাচ শেষ করেই চলে গেল ঘরের ভিতরে, বকশিস নিতেও সে এলো না। কার্তিক ততক্ষণে শঙ্করনের সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে, কিন্তু এ-ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না। কৌতুহলও জাগলো। মেয়েটি তবে কে? মেয়েটি কি কাণ্ডি-দলের কেউ নয়? শঙ্করনকে সেই সময় জিজ্ঞাসা করা হলো না। কী জানি কী মনে করবে, তার থেকে নীরব হয়ে যাওয়াই ভালো। আমরা জলযোগে আপ্যায়িত হবার পর ফিরে এলাম। ছিপছিপে মেয়েটির অপূর্ব সাপিনী-নৃত্য তখনো চোখের সামনে ভাসছিল, আর মনে জাগছিল সেই প্রশ্ন,—মেয়েটি কে?

উত্তর পেলাম পরদিন সকালে। ব্রেকফাস্টের পর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখছি, বন্দরের ভিতরকার বিস্তৃত বারিরাশি আর 'মহাবলী গঙ্গা'র মোহানা অঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা,—এমন সময় তার মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখে ইঞ্জিনরুম থেকে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো শঙ্করন। পারস্পরিক অভিবাদনের পালা শেষ হওয়ায় সে বললে,—একা দেখছি? আপনার বন্ধু কই?

—সে এখন তার কাজে ব্যস্ত। কাল আমাদের জাহাজ ছাড়বে কি না!

শঙ্করন বললে,—তা তো জানি। আজ আমার কাজ শেষ করতেই হবে। অবশ্য কোনো ভাবনা নেই, কাজ ভালোই এগোচ্ছে দেখে এলাম।

বলতে বলতে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললে,—ফ্রি আছেন? যাবেন নাকি আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

বললে,—যেদিকে তাকিয়েছিলেন, ঐ দিকেই যাবো—ঐ মহাবলী গঙ্গার দিকে।

—কী করে?

—আমার ছোট লঞ্চ আছে, যাকে বলে 'এম-এল'। যুদ্ধ শেষ হবার পর আমার বাবা 'ডিসপোজাল' থেকে কিনেছিলেন।

—তাহলে চলুন।

শঙ্করনদের খুদে লঞ্চটাকে আমাদের জাহাজ থেকে দেখা যায় নি, জেটির

াস্তে ওটা বাঁধা প'ড়ে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। লঞ্চে পা দিয়ে কিন্তু মকে গেলাম। কালো ব্লাউজের ওপর পাতলা সাদা শাড়ি পরে বেঞ্চে বসেছিল ারিতা, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো, করজোড়ে আমাকে নমস্কার জানালো।

একটি বেঁটে মতন খাকি পোষাক-পরা লোক খুদে 'এম-এল' বা মোটর লঞ্চটা ালাচ্ছিল, সে ছাড়া মেয়েটি বাদে আর কেউ লঞ্চে ছিল না, আমরা দুজনে লঞ্চে ায়ে উঠতেই লঞ্চটা ছেড়ে দিলো। মুখ ঘুরিয়ে লঞ্চটা বিস্তৃত দরিয়া পার হতে াগলো, তার লক্ষ্য বোধহয় মহাবলী গঙ্গার মোহানা।

বললাম,—মিঃ শঙ্করন আমি কিন্তু কিছুই বুঝছি না! এঁকে নিয়ে—

শঙ্করন একটু হেসে উত্তর দিলো,—এর বড়ো সাধ, বন্দর দেখবে। কয়েকটা াহাজ আর জল ছাড়া কী দেখবে বলুন তো? নদীর মোহানার কাছে একটা ফ্লাটিং ডক' আছে, তার ট্যাঙ্ক-ক্লিনিং, ড্রাই-ডকিং,—প্রভৃতি কাজ পেয়েছি ামরা। আপনাদের জাহাজ কাল চলে গেলেই এই কাজটা শুরু করবো। াবলাম, মন্দ নয়, এ একটা নতুন জিনিস, ও দেখে আনন্দ পাবে।

—কী বললেন? ফ্লোটিং ডক?

—হ্যাঁ। গত যুদ্ধে ওটাকে ক্যাপচার করা হয়েছিল,—শঙ্করন বললে,— ার্মানদের তৈরি। এবার ওটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে শুনছি আপনাদের ভাইজাগ- াের্টে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে।

'ভাইজাগ-পোর্ট" শুনে চকিত হয়ে উঠলাম। শঙ্করন বলতে লাগলো,— ারিতাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল, ও হিন্দীও জানে না, ইংরেজীও জানে না। ামাদের কথা শুনে ও কিছুই বুঝছে না, কিন্তু জানবার আগ্রহ ওর খুব। ই দেখুন না, 'ফ্লোটিং-ডক'-এর কাণ্ডকারখানা যখন বললাম, তখন ও-তো 'হাঁ' য় গেল! বললে,—সমুদ্রে ভাঙা বা জখমী জাহাজ বুকে নিয়ে 'ডক'টা জেগে ঠলো, সে কী কথা!

বললাম,—উনি কেন, আমিও কিছু জানি না, 'ফ্লোটিং-ডক দেখিনি খনো।

শঙ্করন বললে,—কজনেই বা দেখেছে! প্রকাণ্ড ডক। দুপাশে দুটো সরু ওয়ালের মতো উঠেছে, মাঝখানে বিরাট মেঝে বা পাটাতন। ওটা ডুবতে ারে। ডুবে জাহাজটাকে পাটাতনের ওপর বসিয়ে আবার ভেসে উঠবে। তখন জখমী জাহাজটার নিচে-ওপরে যেখানে খুশি মেরামত করে নেওয়া যায়। ার মনে রাখবেন, সবটাই ঘটে যাবে সমুদ্রের বুকে।

বোধহয় ঘণ্টা খানেকেরও বেশি সময় লাগলো মোহানার কাছে যেতে। এরই ক পাশে—মোহানা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে সমুদ্রের বারিরাশিরই কিনারে -একটি কাঠের জেটি, সেই জেটির সঙ্গে সংলগ্ন বিরাট ফ্লোটিং ডক্‌টা দাঁড়িয়ে াছে। 'ডক'টি' এখনো ইংরেজদের অধিকারে, তাই ফ্লাগস্টাফে ব্রিটিশ পতাকা উনিয়ন জ্যাক উড়ছে। শঙ্করন ঠিকই বলেছিল, মাঝখানে বিশাল লৌহনির্মিত াটাতন, পাটাতনের নিচে ফাঁপা ট্যাঙ্ক আছে, যাতে পানীয় জল ধরা থাকে।

যতখানি পাটাতন, ততখানিই ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের ভিতরে খোপ করা। সেই খোপের ভিতরগুলো পরিষ্কার করার কাজ নিয়েছে শঙ্করন। সারিতার কাছে সবই নতুন, সে অবাক হয়ে সব-কিছু দেখছিল। পাটাতনের দুপাশে দোতলা সমান উঁচু দুটো দেওয়াল উঠে গেছে। দেওয়ালগুলো আট-ফুটের মত চওড়া ভিতরে ফাঁপা। এই ফাঁপা জায়গাগুলিতেই কোথাও ইঞ্জিনরুম, কোথাও বয়লার, কোথাও লোকজনদের থাকবার মতো কেবিন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে 'ভ্লাইডক'-এর কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রিটিশ নেভীর লেফ্‌ট্যানাণ্ট কম্যাণ্ডার মিঃ লক্‌হার্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। চল্লিশের মতো বয়স, সুগঠিত লম্বা-চেহারা, রীতিমত সুপুরুষ। সরু মতন দুটি কেবিন, পাশাপাশি একটি শয়ন কক্ষ, অন্যটি তাঁর অফিস। ব্লু শর্টস আর সাদা জামা প'রে ব'সে কাজ করছিলেন। শঙ্করন যে এই সময় আসবে, এ খবরটা তাঁর জানা ছিল তাই শঙ্করন বা তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখে অবাক হলেন না, ঠিকাদার মানুষ, সঙ্গে লোক থাকতেই পারে। কিন্তু বিস্মিত হলেন সারিতাকে দেখে। আমাদের সঙ্গে সম্ভাষণ শেষ করে নিচু গলায় শঙ্করনকে বললেন, হু ইজ শী? এ-রিয়্যাল ব্ল্যাক কুইন।

শঙ্করন বললে,—দিস ইজ দি গার্ল অফ হুম আই টক্‌টু টু ইউ আদার ডে।

—আই সি! —বলে মিঃ লকহার্ট মেয়েটির দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন। তারপরে ওদের ভাষায় কী যেন বললেন, তাই শুনে মেয়েটির মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো, সে অল্প একটু হেসে মুখ নিচু করলো।

লকহার্ট বললেন,—কুইন লাইক স্মাইল্ ইনডিড!

বলে আবার ওদের ভাষায় কী বললেন। মেয়েটি মুখ নিচু করা অবস্থাতে হেসে ফেললো, কিছু বললো না। শঙ্করনও মজা পেয়ে হাসছিল। লকহার্ট আমাকে এবার বললেন,—ডু ইউ নো হোয়াট আই সেইড? পার্ললাইক টিথ্ অ্যাণ্ড সি? শী ইজ ব্লাশিং!

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটিকেই বা শঙ্করন কেবিনে আনলো কেন, আর সাহেবই বা তাকে নিয়ে এমন রসিকতা আরম্ভ করলেন কেন?

যাই হোক, একটু পরে সাহেবের উর্দি-পরা বেয়ারা আমাদের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে এলো। সারিতা চায়ে চুমুক দিতে লজ্জা পাচ্ছে দেখে সাহেব ওদের ভাষায় আবার কী যেন রসিকতা করলেন। শঙ্করন হেসে উঠলো, মেয়েটি লজ্জায় আরও নুয়ে পড়লো।

মেয়েটির অমন ভঙ্গি দেখে আমারও কেন যেন আমার সেই ফেলে-আসা নব-পরিণীতার মুখখানা মনে পড়লো! জাহাজে ওঠবার পর চিঠি দেওয়া হয় নি। চিঠি দেবোই বা কী করে? এই ত্রিনকোমাল্যেতে চিঠি ডাকে দেওয়া যায়, কিন্তু কবে পেঁছিবে কে জানে?

এইসব সাতপাঁচ ভাবছি আর চায়ে চুমুক দিচ্ছি, ওদের রসিকতায় একটু কান
িচ্ছি, আবার দিচ্ছি না। সিংহল থেকে চিঠি গেলে নবপরিণীতা কী ভাববে ?
ত কলকাতায় মাকে চিঠি দিয়ে বসবে! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠি পড়বে,—
ড অফিস থেকে ভাইজাগ পর্যন্ত হৈ-চৈ পড়ে যাবে!

এই সময় লকহার্ট সাহেব উঠলেন, তাঁকে ইঞ্জিনরুমের দিকে যেতে হবে,
াধহয় আগে থাকতেই এ-ব্যবস্থা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও তাঁর
হগামী হতে হলো। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা জেটি পার হয়ে
ীরে এলাম। কিন্তু আমাদের সেই লঞ্চটা কোথায় ? শঙ্করন বললে,—লঞ্চ
ামাদের ছেড়ে দিয়েই চলে গেছে।

—তাহলে ?

শঙ্করন মাটির দিকে নির্দেশ করলো। একটু ওপরে, জলের ওপর বড়ো
ড়া গাছপালা ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিচে শঙ্করনদের সেই ছোট গাড়িটা
পেক্ষা করছে, আমাদের চেনা ড্রাইভার! শঙ্করন আমার মুখের ভাব লক্ষ্য
রছিল, বললে, চলুন স্যার আমাদের ফার্মে—সারিতাকে পেঁ'ছে দিতে হবে না ?

—দেরি হয়ে যাবে না ?

শঙ্করন বললে,—না—না—আপনাকে ঠিক সময়ে পেঁ'ছে দেবো।

সারিতার মুখের দিকে এই সময় চোখ পড়লো। সে আমাদের ভাষা বোঝে
কিন্তু তার চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আর অধরের মৃদু হাসি আমাকে বুঝিয়ে
লো, সঙ্গে আমি গেলে সে খুশিই হবে।

এই দিন কাণ্ডিনাচ ছিল না। ওদের ফার্মে দু-একটি লোক ছাড়া কেউ ছিল
। সারিতা গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছুটেই ঘরে চলে গেল। যেন খাঁচার
াখী তার চেনা খাঁচাটিতে গিয়েই নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

বসবার ঘরে এসে দুজনে বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে ধূমোদগীরণ করতে
রতে শঙ্করন বললে,—আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না,—না ?

ওর দিকে তাকালাম। শঙ্করন বললে,—সাহেবকে সব বলেছিলাম। তাই
স অমন রসিকতা করছিল। যাকে বলে, নির্দোষ রসিকতা! এইবার তাহলে
বটা শুনুন। সারিতা ততক্ষণ চা করুক, আমরা আমাদের কথাবার্তা সেরে
নই। কাণ্ডিনাচ তো দেখলেন ? পর্তুগীজদের অত্যাচারে এই নাচ প্রায় বন্ধ
য়ে গিয়েছিল। ঐ যে বলেছিলাম কাণ্ডির কথা ? নাচিয়েদের একটি দল গিয়ে
ঐ কাণ্ডিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই নাচকে তারা প্রাণের টানে বাঁচিয়ে রেখেছিল।
ারা বাঁচালেও এই নাচ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই
সম্প্রদায়কেই বলা হয় বেরোয়া। অনেক কাল পরে দ্বিতীয় বিমলধর্মসূর্য যখন
ভগবান তথাগতের দন্ত-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন উৎসবে অংশ নেবার জন্য
ঐ নাচিয়েরা এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাচের পুনরুত্থান
ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কীর্তিশ্রীর আমলে। কিন্তু কীর্তিশ্রীর পরে
আবার এই মহিমা অস্তগামী হলো। জনসাধারণের মধ্যে এর প্রসার রুদ্ধ হয়ে

যাওয়ায় সবার ধারণা হতে লাগলো, এই সব নাচ বেরোয়াদেরই নাচ। বেরোয়াদের তখন লোকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতে আরম্ভ করেছিল। এইবার আসল কথায় আসি। এই বেরোয়া-জাতের মেয়ে হচ্ছে সারিতা। আমি তামিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু সারিতা শুধু সিংহলীই নয়, সিংহলীদের মধ্যেও নিচু জাত। আমাদের চোখে অচ্ছুতই বলতে পারেন। আমি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে গিয়ে এই সারিতার ঐ নাগিনী নৃত্য দেখি। দেখে অভিভূত হই। টাকার জোর আছে, তাই জনবলও আছে। আমি ওকে কাছে পেতে চাই, ও রাজী হয় না। বারবার কাণ্ডী গিয়ে কিছুতেই ওর মন টলাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত এক দুঃসাহসিক কাজ করলাম। রামায়ণের 'রাবণ' যেমন 'সীতা'কে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল, আমি তেমনি করে ওকে নিয়ে এসেছি। বাবার শাসনে নিজেদের বাড়িতে রাখবার জো নেই, তাই এই গাঁয়ের বাড়িতে এনে রেখেছি। জানেন তো এখানে সিংহলীদের সঙ্গে তামিলদের বিরোধ লেগেই আছে? সেই বিরোধ এখন তুঙ্গে। কারণ, এযাবৎ সিংহলের রাষ্ট্রভাষা ছিল ইংরেজী, কিন্তু এখন হয়েছে 'সিংহলী',—ফলে তামিলরা চটে গেছে। তারা 'তামিল' ভাষারও সমান স্বীকৃতি চায়। এই রকম অবস্থায় আমি নিজে তামিল সন্তান হয়ে সিংহলী বালিকাকে নিয়ে এসেছি, সুতরাং হৈ-চৈ—থানা-পুলিশ—যা হবার সবই হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে ঐ সারিতা। এদিকে অনিচ্ছায় ধরে আনার জন্য সমানে কাঁদছিল, খাচ্ছিল না, দাচ্ছিল না, সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি,—কিন্তু সেই মেয়েটি প্রয়োজনের সময় চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েতের সামনে সাক্ষ্য দিলো, সে সাবালিকা, এবং নিজের ইচ্ছেতেই আমার কাছে চলে এসেছে, আমাকে সে ভালোবাসে। আমি কিন্তু স্যার, অবাক হয়েছিলাম। আমি ওকে রক্ষিতা হিসাবে পেতে চেয়েছিলাম মাত্র, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এ-কথা শোনবার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। আমি ওর কোনো ক্ষতি করি নি। এবং করবোও না। বাবা আমাকে ত্যজপুত্র করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু আমি ওকে ফেলবো কী করে? আমি ওকে বিয়ে করবো। বিয়ে করবো আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে। যত বাধাই আসুক, এ সংকল্প থেকে আমাকে কেউ টলাতে পারবে না।

ঠিক এই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সারিতা। কাপড় বদলে পরে এলো একটি গোলাপী শাড়ি, ঊর্ধাঙ্গের ব্লাউজ গাঢ় মেরুন রঙের। দুই ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ। আমি ওর দিকে তাকালাম। তারপরে শঙ্করনকে বললাম,—তুমি ওকে তোমাদের ভাষায় বলো, তোমাদের সব কথা শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। অভিনন্দন!

শঙ্করন ওকে কথাগুলো ওদের ভাষায় বলতে ভীষণ লজ্জা পেয়ে এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সারিতা। বিদায় নেবার সময় আমার হয়ে শঙ্করন কতো ডাকাডাকি করলো কিন্তু কিছুতেই আমার সামনে আর বার হলো না!

'ত্রিনকোমালো'র স্মৃতি আমার এইটুকুই। একদিকে মহাবলীগঙ্গার মোহানার দৃশ্য, আর একদিকে সারিতার সর্পিণী নৃত্য—এই দুই মিলিয়ে ত্রিনকোমালো আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে! আজও দেখছি কোনো কথা ভুলি নি। জাহাজে এসে রাত্রে বসে বসে নবপরিণীতাকে সারিতার কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে চিঠি আর পাইলটের হাতে ডাকে ফেলার জন্য দিতে পারি নি। ভাবলাম, দেখা যাক পরবর্তী বন্দরে গিয়ে একাজ করা যায় কি না! কার্তিকের কাছে শুনলাম, পরবর্তী বন্দর—মরিশাস!

॥ ৪ ॥

'ত্রিনকোমালো'র পর আমরা সিংহল-দ্বীপটাকে যেন প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছিলাম। কখনো তীরের কাছাকাছি আসছি, কখনো দূরে যাচ্ছি, এমনি করে করে 'মাতারা' বলে সিংহলের একটি দক্ষিণ বিন্দুকে প্রায় ছুঁয়ে জাহাজ ক্যাপ্টেন দুধওয়ালার নির্দেশে মুখ ঘুরিয়ে গভীর সমুদ্রে ভেসে পড়লো। আমরা আশা করেছিলাম 'কলম্বো' দেখতে পাবো, কিন্তু তা আর হলো না। জাহাজ এরপরে ডানদিকে মালদ্বীপকে রেখে ক্রমাগত এগিয়ে চলতে লাগলো। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা আমার আগেই বলা উচিত ছিল, সিংহল যখন ছুঁয়েছিলাম, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ভারত মহাসাগর।

যাই হোক, দেখতে দেখতে আমরা বিষুবরেখা পার হয়ে গেলাম। তারপরে এলো চাগোস দ্বীপপুঞ্জ। এখানে আমরা থামি নি, জাহাজ ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে কোণাকুনি পাড়ি দিতে লাগলো। এইরকম করে একদিন আমরা এসে পেঁছিলাম 'মরিশাস' দ্বীপে। সারাটা পথ আসতে লেগেছিল ( স্মৃতি থেকে বলছি ) যতদূর মনে পড়ে, সাতদিন। এবং এই সাতদিন ঝড়-ঝাপটা-বৃষ্টি সবই ভোগ করেছিলাম, তবে তা জাহাজের পক্ষে মারাত্মক হয় নি। ক্যাপ্টেন দুধওয়ালা বলেছিলেন,—এ জাহাজের পুরোনো বৃত্তান্ত যা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, এ খুব পোড়-খাওয়া মাল, বহুৎ ধাক্কাধুক্কি সহ্য করেছে, সহজে কাবু হবে না!

তারপরে একটু হেসে মন্তব্য করেছিলেন,—ঘাবড়ে যেয়ো না, এ সময় এদিকে একটু-আধটু সাইক্লোন-টাইক্লোন হয়েই থাকে!

তা সাইক্লোন বা ঝড়ঝঞ্ঝা সমুদ্রে যা-ই হোক, আমার মনের মধ্যে তুফানের আলোড়ন কম ছিল না! যাকে ঘাটশিলায় রেখে হঠাৎ-ই চলে এসেছি, তার জন্য এই সাতদিন মন খুব খারাপ হয়েছিল। সেইজন্য বোধহয় এবারের এই জলযাত্রা আমার মোটেই ভালো লাগে নি। সঙ্গে একখানা ছবি থাকলে মন্দ হতো না, কিন্তু হুড়োহুড়ি করে চলে আসার দরুণ ওসব সংগ্রহ করা হয় নি, বা সংগ্রহ করার কথা মনেও হয় নি। কিন্তু আমার একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলো এখন থাক।

যেখানে ২০ ডিগ্রি দক্ষিণ দ্রাঘিমা রেখা ৬০ ডিগ্রি পূর্ব-অক্ষরেখার সঙ্গে এসে মিশেছে, তার পশ্চিমে একটু এগিয়ে গিয়েই আমরা 'মরিশাস' দ্বীপের উত্তর অংশে পেঁছিলাম। দূর থেকে মরিশাসের প্রধান শহর 'পোর্ট লুইস' বা 'পোর্তে লুই' (বা 'পরলুই' কে) ডুবো পাহাড়ের চূড়ো বলে মনে হচ্ছিল, একটু কাছাকাছি হতেই দেখা গেল, পাহাড়ের পাদদেশে সমতলভূমি জুড়ে শহরটার মূল অংশ গড়ে উঠেছে। দুধওয়ালা আগেই এসেছিলেন এসব দিকে। তিনি জানালেন, নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি থেকেই 'মরিশাস' বা মরিশাসের প্রতিবেশী 'রি-ইউনিয়ন'-দ্বীপের সৃষ্টি। 'পোর্তেলুই' বিরাজ করছে মরিশাস দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে।

আমরা রাত্রে পেঁছেছিলাম বলে বন্দরের বাইরে নোঙর ফেলে আমাদের থাকতে হয়েছিল। এখান থেকে 'পোর্তেলুই'-এর দৃশ্য যা চোখে পড়ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল, দার্জিলিঙের ওপর দিকের কোনো অংশে বসে সমান্তরালভাবে তাকালে অপর অংশ রাত্রিকালে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। তেমনি ক্রমান্বয়ে উঁচু-হয়ে-যাওয়া পাহাড় আর ঘরবাড়ি। ঘরবাড়ির আলোগুলো দেখে মনে হচ্ছে বনান্তরাল থেকে যেন একরাশ জোনাকি উঁকি দিচ্ছে!

এইখানে একটা কথা বলে রাখি, মরিশাস স্বাধীনতা পেয়েছিল

কিন্তু আমি গিয়েছিলাম তারও অনেক আগে, ১৯৪৮ এর শেষের দিকে। পরদিন ভোরে নোঙর উঠিয়ে বন্দরে গিয়ে জাহাজ জেটিতে বাঁধা পড়বার মুহূর্তে কিন্তু শহরটাকে বেশ ছিমছাম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ছেলেবেলায় শোনা সেই 'মরিচ শহর'—যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের কলকাতা থেকেই 'দাস' চালান আসতো। উনবিংশ শতাব্দীতেও তার জের চলেছিল। পরে 'দাস' হিসাবে না হলেও 'ঠিকা শ্রমিক' হিসাবে বহু লোক চালান হয়ে এসেছে এখানে। বোধহয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এসেছে, নইলে সাধারণ মজদুরেদের মধ্যে 'মরিচ শহর' কথাটার অতো প্রচলন থাকতো না কলকাতা শহরে। তাছাড়া আরও একটা কারণে 'মরিশাস' আমাদের কাছে খানিকটা পরিচিত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। তাঁর বাল্যকালে প্রচলিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি পড়েছিলেন এই মরিশাসের পটভূমিকায় লেখা একটি কাহিনী 'পোল-বর্জিনী'। তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখে গেছেন,—'এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পোলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জন্মিয়াছিল!'

প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়াইন মরিশাসে এসেছিলেন ১৮৯৬

সালে। তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তিনি লিখে গেছেন,—'দেখা যাচ্ছে মরিশাসের ইতিহাসে একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ছিল, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে ঘটেই নি। আমি বলছি এখানকার 'পল' ও 'ভার্জিনিয়া'র মধুর রসাত্মক আবির্ভাবের কথা। এই কাহিনীই মরিশাসকে সারা বিশ্বে পরিচিত করেছে, সবাই জেনেছে শুধু এর নাম, এর ভৌগোলিক অবস্থানের কথা নয়।'

এখানে যাঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, সেই রামজী শর্মা আমাকে বলেছিলেন, এখানকার লোকেরা পড়েছে শুধু বাইবেল আর 'পল ও ভার্জিনিয়া' নামের উপন্যাসটি। আর কিছু নয়। এখন আমাদের লোকেরা তুলসীদাসজীর 'রামচরিত মানস' পড়ে বা তার পাঠ শোনে, 'পল ও ভার্জিনিয়া'র পাশাপাশি এখন 'রাম-সীতা' খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে, তা-ও আমাদের মধ্যে যতটা, ততটা অন্যদের মধ্যে নয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'পোল' বা 'পল' এবং 'বর্জিনী' বা 'ভার্জিনিয়া', এদের দুজনেরই মূল জীবনকাহিনীর পটভূমিকা এই মরিশাস। আর এদের দুজনের সঙ্গে আরও একজনের নাম অক্ষয় হয়ে আছে, তিনি তখনকার ফরাসী গভর্ণর জেনারেল 'লাবোরদনে'। ছোটবেলায় একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিল পল ও ভার্জিনিয়া। পরে, তাদের যৌবনকালে, তাদের এই মেশামেশি পরিণতি লাভ করে গভীর প্রেমে। কিন্তু সব বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনীর যে পরিণতি হয়, এই কাহিনীরও তাই হয়েছিল। এদের মিলন যাদের কাছে অভিপ্রেত ছিল না, তারা ভার্জিনিয়াকে কৌশলে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভার্জিনিয়া পলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে 'সেন্ত্ জের়াঁ' জাহাজে করে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে 'ইল-দ্য-ফ্রাঁস' বা 'মরিশাস'-এ ফিরে আসছিল। দ্বীপের কাছাকাছি এসে ঝড়ের কোপে প'ড়ে জাহাজ ডুবে যায়। ভার্জিনিয়ার দেহটা জলে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পড়ে বটে, কিন্তু সে কোন্ ভার্জিনিয়া? তাকে দেখে পল হাহাকার করে ওঠে! ভার্জিনিয়ার নিষ্পন্দ মরদেহটা শুধু প'ড়ে আছে, তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেছে অনেক—অনেক দূরে!

'সেন্ত্ জের়াঁ' জাহাজটির ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা অসত্য নয়। যাত্রীদের মধ্যে বেঁচেছিল মাত্র নয়জন। জাহাজের নাবিকরা যাত্রীদের বাঁচাতে, বিশেষ করে দুটি তরুণীকে বাঁচাতে যেভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, তার বিবরণ শুনেছিলেন তখনকার একজন ফরাসী লেখক 'বার্নারদ্যাঁ দে সাঁপিস্যার'। তারই ফলশ্রুতি হলো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পল ও ভার্জিনিয়া',—পোলবর্জিনী নামে যে-লেখাটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন 'অবোধবন্ধু'তে।

গভর্ণর জেনারেল লাবোরদনে পল ও ভার্জিনিয়াকে খুবই স্নেহ করতেন বলে তাঁর উপন্যাসে লিখে গেছেন লেখক। এই লাবোরদনে-সাহেব মরিশাসের গভর্ণর-জেনারেল হয়ে এসেছিলেন ১৭৩৫ সালে। তিনিই তখনকার রাজধানী 'পোর্ট নর্থ-ওয়েষ্ট'-এর নাম বদলে 'পোর্ত লুই' বা 'পোর্তো লুই' বা 'পর লুই' রেখেছিলেন।

এই পোর্তো লুইতে হিন্দুদের একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি গোলাকার, চারদিকে কাঁচের জানালা দিয়ে ঘেরা, মাথায় টিন ছিল না টালি ছিল, এখন মনে করতে পারছি না। রামজী শর্মার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এখানে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই, তিনি বাঙালী। তিনি 'রামচরিত মানস' ও যেমন পড়েছেন, 'পল-ভার্জিনিয়া'ও তেমন পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ইতিহাসও।

লাবোরদনের কথাও এঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন (তাঁর নাম ভবেশানন্দ), আসল কথা কী জানেন? (এটি তাঁর কথার মাত্রা, শুনতে সেদিন খুব ভালো লেগেছিল),—এই যে দ্বীপ দেখছেন, এর উন্নতি কার জন্য? ঐ লোকটির জন্য। ঐ লাবোরদনে সাহেব। অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করে গেছেন এই দ্বীপের জন্য। তাঁকেই মরিশাসের স্থাপন-কর্তা বলা যেতে পারে। এখানকার যা-কিছু বাড়বাড়ন্ত পরে হয়েছে, সব তাঁর জন্য। সে কি আজকের কথা? দুটি সন্তান ছিল তাঁর। সে-দুটিকে পর পর তাদের শিশুবয়সেই তিনি হারালেন ১৭৩৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। আর মে-মাসে হারালেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে। এ কী প্রচণ্ড আঘাত, বলুন তো দেখি? কিন্তু এখানেই তাঁর দুঃখকষ্টের শেষ হলো না! ১৭৩৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি ছুটি নিয়ে রওনা হলেন ফ্রান্সের পথে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ফ্রান্সে পৌঁছে কর্তাদের কাছ থেকে তিনি পেলেন যার পর নাই দুর্ব্যবহার—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের ফল ছাড়া এ আর কিছুই নয়। ১৭৪১ সালের আগস্টে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হলো মরিশাসে। এর পরে আসে ১৭৪৬ সালের কথা। এই সালের মার্চে তাঁকে যেতে হয়েছিল ভারতবর্ষে এক জরুরী নির্দেশ পেয়ে। ঐ সময় ভারতে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। যুদ্ধে তাঁর মতো রণকুশল ব্যক্তিকেই দরকার,—সেজন্যই তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এসে উঠেছিলেন পণ্ডিচেরীতে। ভারতে, তখনকার ফরাসীদের কর্তা ছিলেন দুপ্লে। ভারতের ইতিহাসে সেইযুগে ইংরেজদের রবার্ট ক্লাইভ, আর ফরাসীদের দুপ্লে,—এই দুটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ নাম। কিন্তু আসল কথা কী জানেন? ক্ষমতা আর খ্যাতি বড়ো সর্বনেশে জিনিস, সবসময় ভয় থাকে এই বুঝি সব হারালাম, এই বুঝি অন্য কেউ এসে আসন কেড়ে নিলো! দুপ্লেরও হয়েছিল তাই। লাবোরদনেকে তিনি প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারছিলেন না। সাধারণ—অতি তুচ্ছ একটা অছিলা খুঁজে নিয়ে তিনি রাগে অন্ধ হয়ে লাবোরদনেকে হঠাৎ-ই একসময় মরিশাসে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এই কাজটা সে-সময় দুপ্লে যদি না করতেন, তাহলে ঘটনা অন্যরকম হতো। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, দুপ্লের এটা হয়েছিল মারাত্মক ভুল। লাবোরদনে কাছে থাকলে দুই মহারথীর মিলিত শৌর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করতে পারতো। তা সে যা-ই হোক, লাবোরদনে ভারত থেকে মরিশাসে পৌঁছে দেখলেন, তিনি আর গভর্ণর জেনারেল নেই, তাঁর বদলে সরকার চালাচ্ছেন অন্য লোক, বার্থেলমি ডেভিড।

এই ডেভিড মরিশাসে এসেছেন শুধু শাসনকার্য চালাবার জন্যই নয়। তাঁর পকেটে আছে ফরাসী সরকারের হুকুমনামা,—লাবোরদনেকে গ্রেপ্তার করো। গ্রেপ্তার করে অবিলম্বে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু আসল কথা কী জানেন? এই ডেভিড ছিলেন ভদ্রলোক। তিনি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন, লাবোরদনে কোনো অপরাধেই অপরাধী নন। সত্যিকার একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, ভালোমানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কিছু স্বার্থান্বেষী ঈর্ষাতুর লোক। এটা বুঝতে পেরে তিনি ওঁকে গ্রেপ্তার করলেন না, ফ্রান্সগামী একটি নৌবহরের অধিনায়কের পদে বসিয়ে রওনা করে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। কিন্তু কী দুর্দৈব দেখুন! যেতে যেতে পড়লেন প্রবল তুফানের মুখে। ঝড়ের দাপটে তিনি তাঁর বহরের অন্য সব জাহাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তখন ইংরেজদের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল, সে-কথা আগেই বলেছি। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লাবোরদনে গিয়ে পড়লেন ইংরেজদের হাতে। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর নাম শুনেছিল, তারা বীরের মর্য্যাদা দিতে জানতো। তারা তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে রেখেছিল, তারপরে মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল ফ্রান্সে। কিন্তু নিজের দেশে তিনি কোনো মর্য্যাদা পেলেন না, পেলেন না আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ। প্যারীতে পৌঁছানো মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে রাখা হলো কুখ্যাত 'বাস্তিল দুর্গ'-এ। এখানে তিন বছর বন্দী থাকবার পর অবশ্য তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তখন তাঁর শরীর-মন দুই-ই ভেঙে প'ড়েছিল। এর আরও তিন বছর পরে তিনি পেয়েছিলেন সত্যিকার মুক্তি। মৃত্যু এসে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল মানুষের নাগাল থেকে অনেক দূরে!

সত্যি কথা বলতে কী, সেদিন অনেক কথা জেনেছিলাম স্বামী ভবেশানন্দের কাছ থেকে। ভারতবর্ষ থেকে তিনি মরিশাসে গিয়েছিলেন কোনো এক সংঘের প্রতিনিধি হয়ে (সংঘের নাম করতে এখন আর চাই না) কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি সংঘ ত্যাগ করেন। সেই থেকে রয়ে গেছেন মরিশাসে, দেশে আর ফিরে যান নি। সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই, নইলে জানতে চাইতাম তাঁর আসল নাম, তাঁর দেশের ঠিকানা। জানতে চাই-তাম, দেশে তাঁর কে-কে আছেন,—কাদের তিনি ছেড়ে এসেছেন দেশে?

কিন্তু সন্ন্যাসী নির্বিকার। নিজের কথার ধার দিতেও যেতে চান না। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম মরিশাসের ইতিকথা। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম, ৭২০ বর্গ মাইল পরিমিত এই দ্বীপ প্রাচীনকালে আরবদের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু তারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে নি, করে নি পর্তুগীজরাও।

—আসল কথা কী জানেন?—ভবেশানন্দ বলেছিলেন,—ইয়োরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু তারা এখানে থাকে নি। এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে প্রথমে ওলন্দাজ বা 'ডাচ্'-রা ১৫৯৮ সালে। এদেরই অজ্ঞতায় এদেরই হাতে এই দ্বীপের নিজস্ব পক্ষীকুল 'ডো-ডো' (দো-দো)-রা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

এখন এখানকার মিউজিয়ামে রাখা একটি আঁকা ছবি ছাড়া, আর কোথাও ওদের অস্তিত্ব নেই।

যাই হোক, ডাচেরা কিন্তু চলে যায় নানান কষ্ট আর দুর্গতি ভোগ করার পর। এর পরে আসে ফরাসীরা ১৭১৫ সালে। তাদের কাছ থেকে এটি ব্রিটিশদের হাতে আসে ১৮১০ সালে। ১৮৩৩ সালে দাস-ব্যবসার বিলোপ ঘটে। ১৮৩৪ সালে পাঁচ বছরের চুক্তি-প্রথায় (স্থানীয় হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের ভাষায় 'গিরিমাটি'র মাধ্যমে) ভারত থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে আনার কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। (এই মরিশাসের কাছেই আছে আরও কয়েকটি খুদে খুদে দ্বীপ, তাদের মধ্যে একটি হলো 'দিয়েগো গারসিয়া', যা নিয়ে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে আজকাল। মরিশাসের অধীনেই ছিল এই দ্বীপ, সেজন্য স্বাধীন মরিশাস এই দ্বীপ তাদের বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ এটিকে আণবিক বীক্ষণাগার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমেরিকাকে ইজারা দিয়ে বসে আছে বলে শোনা যাচ্ছে)।

এসব তথ্যের কিছু আমি রামজী শর্মার কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছিলাম। ঘোরাঘুরির সময়ে সঙ্গে থাকতো কার্তিক। যে কদিন জাহাজ ওখানে মেরামতি ও মালপত্র ওঠানো-নামানোর জন্য ছিল, ততদিন সময় পেলেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়তাম।

আজকের মরিশাসের সুবিখ্যাত 'প্লাঁয়জ'-বিমানবন্দর তখনো হয় নি, যদিও শুনলাম একটা 'এয়ারস্ট্রিপ' আছে, মাঝে মাঝে প্লেন এসে নামে। ছোট ছোট প্লেন আসে মাদাগাস্কার থেকে। কিন্তু এ-সব আমাদের শোনা কথা, চোখে দেখি নি। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম এখানকার 'রয়্যাল বটানিক্যাল গার্ডেন', দেখতে গিয়েছিলাম 'ওরিয়েন্টাল হোটেল', যেখানে এসে উঠেছিলেন গান্ধীজী ১৯০১ সালে—৩০শে অক্টোবর তারিখে। তখন তিনি ব্যবহারজীবী গান্ধীজী, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরছিলেন, পথে তুফানে পড়ে জাহাজ বিকল হয়ে সেটি মরিশাসে আসায়, গান্ধীজীরও মরিশাস-ভ্রমণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী হয়ত জানতেন না, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ করে তিনি তখন মরিশাসেও 'সংবাদের শিরোনাম।' সেজন্য তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাব এখানকার ভারতীয়দের কাছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা বই কী! আমাদের নবলব্ধ বন্ধু রামজী শর্মা এই তথ্য দিয়ে বললেন,—এখানকার দৈনিক পত্রিকাগুলো বেরুতো সন্ধ্যাবেলায়। পত্রিকাগুলির মধ্যে 'লে র‍্যাদিক্যাল' ছিল সব থেকে জনপ্রিয়। তাতেই সব থেকে বিস্তারিত ভাবে বেরিয়েছিল গান্ধীজীকে যে বিপুল জনসম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তার খবর।'

বলে, একটু হাসলেন রামজী, বললেন,—গান্ধীজী যখন এখানে আসেন, তখন এখানে একটিও মটোর গাড়ি ছিল না। যে তিন-সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন, তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি।

বললাম,—তখন এখানে ঘোড়ার গাড়ি ছিল বুঝি?

—থাকবে না ?—রামজী বললেন,—দ্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত লোকে যাতায়াত করবে কিসে ? এখনো আছে। পথ চলতে চলতে ঠিক আপনাদের চোখে পড়বে একসময়, বিশেষ করে শহর ছাড়িয়ে বাইরে যদি বেড়াতে যান।'

—বলুন তো ? এখানে আর কী-কী দেখবার আছে ?

রামজী বমলেন,—আসল জিনিসই তো দেখেন নি ! চলুন আমার সঙ্গে ? সময় আছে ?

—তা আছে।

তাহলে চলুন।

গেলাম ও'র সঙ্গে। সমুদ্রেরই একটা খাঁড়ি, সরকারীভাবে এর নাম 'গ্র্যান্ড বেসিন,'—কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা বলেন,—'গঙ্গাতালাও !' 'পাড়িতালাও'-ও অবশ্য বলে থাকেন অনেকে।

—মহিমা আছে গঙ্গাতালাওয়ের,—রামজী মন্তব্য করলেন,—রামায়ণের 'কহানী' মনে আছে তো ? মনে আছে সেই ঘটনাটা ? সেই যে 'সীতা মায়ী' সোনার হরিণ দেখে লক্ষ্মণকে ওটা ধরে দিতে বলেছিলেন ? ওটা তো সত্যি-কারের 'সোনার হরিণ' ছিল না, ও ছিল মায়াবী রাক্ষস,—মরীচ। মরীচ মরণকালে রামের কাছে কামনা করলো কী, হে রাম ! আমি পরলোকে গিয়ে সব সময় যেন রামনাম শুনতে পাই ! রাম বললেন, তথাস্তু। রামের হাতের ছোঁয়ায় মরীচ ( আমরা বলি, 'মারীচ', কিন্তু আমাদের রামজী উচ্চারণ করে-ছিলেন 'মরীচ' ) হয়ে গেল নিটোল একটি ঝকঝকে 'মুক্তো'। এই মুক্তো নিয়ে রাম সজোরে ছুঁড়ে দিলেন। সমুদ্রে গিয়ে পড়লো এই মুক্তো। যেখানে পড়লো সেটিই হলো এই মরিশাস। আর, ঠিক যেখানে পড়েছিল, তার নাম 'গ্রেট বেসিন', হিন্দুরা নাম দিলে—গঙ্গাতালাও।

এসব কথা কি রামায়ণে আছে ?

—থাকবার দরকার কী ? মানুষ মুখে মুখে তৈরি করে নিয়েছে,—রামজী বললেন,—আর একবার যখন তৈরি হয়েছে, তখন আর তাকে হটায় কে ? এই দেখুন না আমার ঠাকুমা বুড়ি বলতো, রাম চৌদ্দবছর বনবাসে ছিলেন, তার মধ্যে পাঁচটা বছরও কি তিনি এখানে কাটান নি ? নিশ্চয়ই কাটিয়েছিলেন। সীতামায়ীর প্রিয় জায়গা ছিল এটা, তা জানিস ? আমি যুক্তি দিয়েও তাঁর এ-বিশ্বাস টলাতে পারি নি।

এইখানে এই রামজী শর্মা-মানুষটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের জাহাজে মালপত্রের যোগান দিয়ে থাকেন যে-কোম্পানী, রামজী তাঁদেরই প্রতি-নিধি। তরুণ বয়স্ক, বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হবে না বয়স। জাহাজে এসে-ছিলেন কর্ম উপলক্ষ্যে, সেই সূত্রে আলাপ। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী বলেন, সঙ্গে কিছু হিন্দী মিশ্রিত থাকে, কিন্তু হিন্দীও ইনি পুরোপুরি বলতে পারেন না। অথচ মাঝে মাঝে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' থেকে আবৃত্তি করে থাকেন। যেমন একদিন কী কথায় যেন বলে উঠলেন,—"নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা/

নহি' কোউ অবুধ ন লচ্ছণহীনা।' মানে হলো, গরিব, দঃখী, দীন, নির্বোধ ও অলক্ষুণে কেউ থাকবে না রামরাজ্যে। মণিলাল ডক্টরের নাম শুনেছেন ?

—না !

রামজী বললেন,—ওঁকে মরিশাসে পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজী। পণ্ডিত লোক। বিলেতে লেখাপড়া করেছিলেন। প্যারিসেও ছিলেন বহুদিন। এখানে এসে একখানা কাগজ বার করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'হিন্দুস্থানী'। প্রথমে এর ভাষা ছিল গুজরাতি, পরে হলো 'হিন্দী'। এর মাথায় ছাপা থাকতো, —ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও সবার সঙ্গে সমান-অধিকার। তিনি এখানকার চুক্তিবন্ধ মজদুরদের দুরবস্থার কথা খুব লিখতেন বলে আমার বাবার কাছে শুনেছি।

রামজী একবার আমাদের নিয়ে গেলেন 'শামারেল' দেখাতে। কথাটা বোধ হয় ফরাসী, যার মানে, 'সাতরঙের সমাবেশ'। গিয়ে দেখলাম, এখানকার মাটির রঙ নানারকমের। অর্থাৎ রঙের সমাবেশ সাত কেন, সাতের থেকেও বেশি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এ-থেকেই প্রমাণ হয় এই দ্বীপের সৃষ্টি আগ্নেয়-গিরি থেকে। আগ্নেয়গিরি না থাকলে এমন সব রঙিন মাটি এলো কোথা থেকে ? কেমন, সুন্দর না ?

বলতে বলতে 'রামচরিত'-পড়া রামজী শর্মা হঠাৎ অন্য জগতে চলে গেলেন,—কে বলতে পারে, হয়ত ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছিল পল আর ভার্জিনিয়া। এই রঙের সমাবেশ আর ঐ ওখানকার পাহাড়ী ঝর্ণা দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে গিয়েছিল। এমনও হতে পারে, ওরা ফেরার পথে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। আর পলের মা মারগারিতের যে নিগ্রো-দাসটি ছিল, সেই দোমাঁগ ওদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এখন এই যে এতো আখের ক্ষেত দেখছেন, এখানে আগে ছিল বিরাট জঙ্গল। অবশ্য যতই বসতি বেড়েছে, জঙ্গল ততই কাটা পড়েছে। কিন্তু আমাদের দেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যত জঙ্গল কাটা পড়েছে, তত আর কখনো হয়নি। কারণ কী জানেন ? চিনির দাম বাড়তে বাড়তে একেবারে তুঙ্গে চলে যায়। সেজন্য জঙ্গল কেটে তাড়াতাড়ি আখের ক্ষেত করার হিড়িক পড়ে গেল। আর এই আখ, এবং আখ থেকে চিনি,—এই-ই তো আজকের মরিশাসের প্রধান সম্বল।

'শামারেল' দেখে ফিরতে ফিরতে এইসব কথা হচ্ছিল।

এরপরে আমরা দেখতে গেলাম পোর্তলুই বা 'পরলুই'-এর সংলগ্ন 'কুলিঘাটা'। এদিন ভবেশানন্দজী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বন্ধ-করা একটি লোহার ফটক, তার পিছনে এক সার সিঁড়ি। এরই নাম 'কুলি-ঘাটা'। এখানেই প্রথম এসে নেমেছিল ভারতীয় শ্রমিক ১৮৩৪ সালে। ভবেশানন্দ বললেন,—তার মধ্যে বাঙালী, বিহারী, যুক্তপ্রদেশী, তামিল, তেলেগু, সবই ছিল।

—আসল কথা কী জানেন ?—ভবেশানন্দ তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন,—খুব বড়ো আকারে ভারত থেকে লোক আসে ১৮৫৭-র

"সিপাহী-জাগরণ"-এর পর ( উনি 'বিদ্রোহ' শব্দটা ব্যবহার করলেন না )। অন্ততঃ তিরিশ হাজার লোক সেদিন এসেছিল বিহার থেকে—ব্রিটিশের রোষ থেকে বাঁচবার জন্য। মরিশাস তখন ছিল ফ্রান্সের অধীন, তাই এখানে তাদের কোনো বিপদের মুখে পড়তে হয় নি।